দ্বিতীয় খণ্ড

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

রচনাকাল : ১৯৬১-৭১

তখন ভালবাসার যৌবন হরণ কইরা নেয় আকালুদ্দিন। আন্নু ঘরের ভিতর। ফেলু বাছুর নিয়ে মাঠে গেছে।

ফেলু মাঠে নেমেই দেখল দুটো ঘোড়া পুকুর পাড়ে গোলাপজাম গাছটায় কারা বেঁধে রেখেছে। অনেক লোকজন ছুটে যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বুড়োকর্তার শরীর খারাপ হতে পারে। ঘোড়া তারিণী কবিরাজের হবে। ঘোড়ায় চড়ে শ্বাসকষ্ট নিরাময় করতে এসেছেন তারিণী কবিরাজ। অন্য ঘোড়া মতি রায়ের হবে। ওরা বুড়োকর্তার বড় যজমান। কিন্তু তখনই ফেলু দেখল ক'জন পুলিশ পুকুর পাড়ে কি খুঁজছে। নীল পাগড়ি মাথায় দু'জন মানুষ ঘোড়া দুটোকে কি খেতে দিচ্ছে। বুঝি থলের ভিতর চানা দিয়ে মুখে বেঁধে দিয়েছে। সে দূর থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। হাতে চানা খাওয়াচ্ছে, না থলের ভিতর চানা। দফাদারের হাত চেটে দিচ্ছে না পিঠ চেটে চেটে দিচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দুই ঘোড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে বোঝা যাচ্ছে।

আকালুদ্দিন বাঁশঝাড়ের নিচে টেনে এনেছে বিবিকে। লোকজন ছুটছে হিন্দু পাড়াতে, ছোট ঠাকুরকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা সোরগোল শুনেই আন্নু শাড়ি পরে বের হতে যাবে তখন আকালুদ্দিন সামনে। দাড়িতে আতর মেখে হাজির। সারারাত আজকাল আর আন্নু ঘর থেকে বের হতে পারে না। ফেলু মটকা মেরে পড়ে থাকে। ঘুমায় না। হাতের কষ্টে সে সারারাত ছটফট করে। কিন্তু আন্নুর মনে হয় ওটা হাতের কষ্ট নয়—য্যান ভিতরে সেই সন্দেহের কোড়া পাখিটা কুরে কুরে খায়। ঘুম আসে না মিঞার চোখে। আকালুদ্দিন মিঞা তার ঘুম হরণ কইরা নিছে। আকালুদ্দিন সামুর পরই এ-অঞ্চলে লীগের বড় নেতা। সামু গাঁয়ে বড় আসে না। এলেও দু'-একদিন থাকে তারপরই চলে যায়। আকালুদ্দিনের ওপর সব ভার এখন। সে মুসলমান গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মানুষজনকে তার দলে টানছে। কারণ আবার নির্বাচন আসছে, যা শোনা যাচ্ছে এবারে পৃথক নির্বাচন হবে, কোন সালে হবে কে জানে। হক সাহেবের তেমন আর রবরবা নেই। আকালুদ্দিন মাঠে নেমে যাবার সময় খালি বাড়ি পেয়ে এক লাফে ঘরের ভিতর। বিবিকে টানতে টানতে একেবারে বাঁশবনের ভিতর।—আরে মিঞা, কর কি, কর কি! সময় অসময় নাই!

—তুই চুপ কর দিহি! ঐ ছাখ, মরদ তর মাঠে। খোঁড়া মুরগের মত হাইটা যায়।"

আন্নু কাপড় তুলে উঁকি দিয়ে দেখল, সত্যি ফেলু মিঞা মোরগ বনে গেছে।

আকালু তখন আন্নুকে একটা জবরদস্ত মুরগী বানিয়ে ফেলল। মুরগী বানিয়ে আকালু আন্নুকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। সে সেই আবছা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে হেসে উঠল, আমার মরদ লাথি মারে মিঞা! নালিশ দিতে দিতে সে আরামে বার বার পুষ্ট মুরগী বনে যাচ্ছে। আকালু দাড়ি ঘষে দিচ্ছিল ঘাড়ে। বড় আরাম বোধ হচ্ছে দু'জনার।

সামান্য এক বাছুরও নাস্তানাবুদ বানিয়ে দিচ্ছে ফেলুকে। বাছুর লেজ তুলে ছুটছে ফেলুকে নিয়ে।

আকালু দাড়ির আতর তখন বিবির মুখে ঘষে দিচ্ছে। পিঠে হাত রেখে ঘাড় চেটে দিচ্ছিল। তারপর যা হয়, পরের বিবিকে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে বনে-জঙ্গলে ভোগ করে একেবারে তাজা মানুষ আকালু। অথবা যেন সে মোল্লা বনে যায়। পান খায়, গুয়া খায় এবং বারে বারে নদীর পাড় দিয়া হাইটা যায়।

পরের বিবিকে মুরগী বানিয়ে আকালু হাঁটছে নদীর পাড়ে। সেও দেখতে পেল ছুটো ঘোড়া গাছের নিচে বাঁধা। সে মনে মনে কপট হাসল। কারণ তখন ফেলুর বাছুরটা লেজ তুলে মাঠের দিকে না নেমে বাড়িমুখো উঠে যাচ্ছে।

কে যেন বলে, ফেলু, তর মরণ! তর বিবির শরীরে আতরের গন্ধ। তুই আতরের গন্ধ টের পাবি বলে, তোকে বাড়িমুখো উঠে যেতে দেখলে বিবি তর ঝাঁপ দিবে পুকুরে। আর আছে ষণ্ড হাজি সাহেবের। সে তরে কেবল ভয় দেখায় চষা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে। তোর যে কি হবে ফেলু! তুই কি তালাক দিবি বিবিকে! ফেলু মনে মনে হাসে। সে আজকাল একা থাকলেই মনে মনে কথা বলে। ওর এটা ক্রমে স্বভাব জন্মে গেছে। তখনই তার মাইজলা বিবির জন্য মনটা টনটন করতে থাকে।—আমার আছেডা কি আল্লা! সে এক হাত ওপরে তুলে নসিবের কথা আল্লাকে জানাতে চাইলে দেখতে পায় আকালুদ্দিন মিঞা নদীর পাড়ে হাইটা যায়। মিঞা যাবে বক্তৃতা দিতে। পরাপরদির হাটে লীগের সভা। সকাল সকাল দলবল নিয়ে চলে যাবে। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে সে চাষী মানুষ যোগাড় করতে যাচ্ছে। তারও ইচ্ছা হাটে সে যাবে

একবার। তার এই লম্বা কথা শুনতে ভাল লাগে। গায়ে কাঁটা দেয় যখন আকালুদ্দিন বলে, ছাখেন মিঞারা, চক্ষু তুইলা ছাখেন! কি আছেডা আপনেগ! খানা নাই, পিনা নাই, জানে নাই খুন, হিন্দুরা সব চুরি কইরা নিছে। তখন মনেই হয় না—অ-হালা হারামজাদা তার বিবির তালাকের জন্য বসে আছে। দশ কুড়ি দশ টাকার লোভ দেখাচ্ছে! তালাকনামা করে দিলেই সে তার মজুরা পেয়ে যাবে। তালাকনামা পেলে বিবি মল বাজিয়ে উঠে আসবে আকালুর উঠোনে।

ফেলু তখন হাসে! সেই এক নিষ্ঠুর হাসি। —আরে মিঞা, এডা কি কও। বিবির দাম মিঞা খাবলা খাবলা জমির মতন। তারে কম মূল্যে বিচা লাভ ডা কি কও ছাহি! যতদিন আছে তাইন, আমি আছি ততদিন। আমার মূল্যডা তোমার কাছে আছে। দশ কুড়ি দশ টাঁহা একডা টাঁহা। টাকা পয়সা সব জলে, বিবি যদি চলে যায় তবে ফেলুর থাকে কি! আমি যে মিঞা ফেলু শেখ, আমার হাত ভাইঙা দিছে পাগল ঠাকুর। ঠাকুর তুমি আছ এক ষণ্ড। তিন ষণ্ডের মোকাবিলা করতে পারি আমি এক ফেলু! এক ষণ্ড হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়, অন্য ষণ্ড মিঞা আকালুদ্দিন আর হাত ভেঙে দিয়ে পাগল ঠাকুর হয়ে গেছে তিন ষণ্ডের এক ষণ্ড। সে ফাঁক পেলেই এখন কোরবানীর চাকুতে ধার দিচ্ছে। কার গলা ফাঁক করবে তার আল্লা জানে!

তা যা আছে কপালে! দেবে পাড়ি একদিন মুড়াপাড়া। হাতের এই বাগি বাছুর কোরবানী দিয়ে আসবে ভাঙা মসজিদের বেদিতে। মুড়াপাড়ার বাবুরা সাতটা মসজিদের খরচ দেয়, কাছারি বাড়ি থেকে খরচ যায়, তবু তোমরা মিঞারা মা আনন্দময়ীর পাশে যে এক ভাঙা মসজিদ আছে, বন-জঙ্গল আছে, সেখানে নামাজ পড়তে পাবে না। মিঞা আকালুদ্দিন এই নিয়ে এ অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। মৌলবীসাব যার মুড়াপাড়ার বাজারে সুতার কারবার আছে সে এসেছিল একবার, সে এসে বলে গেছে, আল্লার দুনিয়ায় কাফের থাকুক, আল্লা তা চান না। বিধর্মী নিধন হউক। ইনসান আল্লা—পরবে পরবে জিগির ছাও, দেশ চাই পাকিস্তান। হিন্দুর দেবী দুই ঠ্যাঙ ফাঁক কইরা কি যে কাণ্ড একখানা—সোনার মুণ্ডমালা গলায় ট্যারচা চখে চাইয়া থাকে। পারেন না মিঞা কোরবানী দিতে আল্লার নামে নিজের জান! নামাজ পড়তে পারেন না মিঞা ভাঙা মসজিদে! আপনেরা যদি আল্লার

দরবারে জেরার মুখে পড়েন, কি জবাবডা দিবেন কন দিহি। আপনেরা আবার কন আল্লার বান্দা!

ফেলু মনে মনে কবুল করল, সত্যি আল্লার বান্দা এই নামে তবে কাম কি। তা তুমি মিঞা আকালুদ্দিন এত কথা কও, মঞ্চে উইঠা নাচন কোঁদন কর, তুমি মিঞা তবে জিগির দ্যাও না ধর্মযুদ্ধের—কে আছরে মিঞা, কোন গাঁয়ে কারা আছ, আল্লার বান্দা দুনিয়ায় আইসা তবে কামডা কি, চল যুদ্ধে, ধর্মযুদ্ধে, হাতে বল্লম, সড়কি, বাঁশের লাঠি এবং তোমার যা আছে যদি না থাকে তবে সুপারির শলা। দ্যাও ইবারে আল্লা-হু-আকবর বলে ধ্বনি একখানা!

কিন্তু তখনই মনে হল ধ্বনি উঠছে ঠাকুরবাড়ি। সবাই মিলে ধ্বনি দিচ্ছে—বন্দেমাতরম্। কি কারণ এ-ধ্বনির! কারণ সন্তোষ দারোগা ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এসেছিল রঞ্জিতকে ধরতে, কিন্তু তাকে পেল না। নিজ বলে দারোগা সাহেব সমন খাড়া করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ঠাকুরকে। শশি-ভূষণ ধ্বনি দিচ্ছে বন্দেমাতরম্! ধ্বনি দিচ্ছে, শচীন্দ্রনাথ কি জয়। ধ্বনি দিচ্ছে, ভারতমাতা কি জয়! দেশের কাজে মানুষ জেলে যায়। ফেলু দু'বার জেল খেটেছে। খুনের দায়ে জেল খেটেছে। আর শচী ঠাকুর খাটবে স্বদেশীর জন্য। সেও একবার এ-ভাবে জেলে যেতে চায়। ওদের দেখাদেখি সেও মাঠের এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, আল্লা-হু-আকবর। হিন্দুরা কিছুতেই ওদের জন্য দেশটা আলাদা করে দিচ্ছে না। পায়ের তলায় রেখে কেবল মজা দেখতে চায়। হালার হালা কাওয়া! হালার হালা কাফের!

কিন্তু ফেলুর হাঁক এত আস্তে হল যে সে যেন নিজেই শুনতে পেল না। তবে কি ওর গলা বসে গেছে! গতকাল সে চিল্লাচিল্লি করেছে বিবির সনে। বিবি তার দুই কাঠা ধান এনেছে। ধান এনেছে গতর খেটে। সে একবার বিল থেকে বড় মাছ ধরে এনেছিল—কারণ বিবি তার সব পারে, সব চুরি করে আনতে পারে, এই চুরি করার নামে বিবি তার মাঠে যায়—আর কতদিন পাহারা দিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বিবির খাইস মিটে না, পাল-খাওয়া গরুর মতো লাফায়, চোখ সাদা করে রাখে। তখন ওর ইচ্ছা হয় মাজায় একটা দুম করে লাথি মারে। লাথি মারলেই পাল থেকে যাবে, থেকে গেলেই গরু তার গাভিন, আর লাফাতে পারবে না। এত আর শরীরে তখন মোহব্বত থাকবে না। চোখ মুখ সাদা ফ্যাকাসে—আন্নু একটা উরাট জমির মতো খালি পড়ে থাকবে। আবাদ করতে কেউ আসবে না।

তখন হালার বাছুর একেবারে উঠানে। বাছুরটার পেছনে ফেলু ঠিক ছুটে আসবে। গালে মুখে আন্নুর আতরের গন্ধ। সে তাড়াতাড়ি বাছুর উঠোনে দেখে মুখ ধুয়ে ফেলল। কিন্তু পিঠে, ঘাড়ে গন্ধটা লেগে আছে। ফেলু কাছে এলেই টের পাবে। বাছুরটা যত নষ্টের গোড়া। সে ভাবল উঠোনে নেমে ফেলু উঠে আসতে না আসতে আবার মাঠে তাড়িয়ে দেবে কিনা। এখন বাছুরটা না এলে মানুষটা আসত দুপুরে। যখন মাথার ওপর সূর্য তখন ফেলু উঠে আসে। ঘাড়ে গলায় সামান্য পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ মেখে রাখল আন্নু। ফেলু যেন টের না পায় আকালু বিবিকে ভোগ করে গেছে।

এখন আন্নু তাড়াতাড়ি কি যে করে! আর তখনই হিন্দুপাড়াতে আবার সেই ধ্বনি। সে যেন অনেকদিন পর এমন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। সে এতক্ষণ আকালুর সঙ্গে ঝোপে-জঙ্গলে পীরিত করছিল বলে খেয়াল করে নি। কিন্তু আকালু চলে যেতেই একে একে হুঁশ ফিরে আসার মতো সে শুনতে পাচ্ছে—হিন্দুপাড়াতে জয়ধ্বনি উঠছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে হিন্দুপাড়ার দিকে। সে, ঈশম এবং মনজুরকে চিনতে পারছে। মনে হল ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারা। পুলিশের লোক! ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। ফেলুটা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। অর য্যান পরানে ভয়ডর নাই। ছোট ঠাকুর মাঝখানে। আগে সামনে পুলিশ। সোনা, লালটু, পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পাগল মানুষ তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেন দাস আভারানী মাঠে এসে নেমেছে। গৌর সরকার, বেনেপাড়ার সব লোক নেমে এসেছে।

একটা ফড়িঙ এ-সময় আন্নুর মাথার ওপর এসে বলল। সে ফড়িঙটা উড়িয়ে দেবার সময় দেখল ফেলু উঠে আসছে। একেবারে কাছে এসে গেছে। এবার সে আতরের গন্ধ পেয়ে যাবে। কি করে! কি করে! সামনে ছিল হাজিদের পুকুর। সে পুকুরে ঝাঁপ দিল এবং জলে ডুবে গেল। ফড়িঙটা আন্নুর মাথার ওপর বসার জন্য জল পর্যন্ত উড়ে উড়ে এসেছিল, জলের ওপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু আন্নু জলের নিচে ডুবে গেলে কোথায় পাবে তারে। ফড়িঙটা আন্নুকে খুঁজে পেল না বলে আবার মাঠে উড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে ফড়িঙের মজা দেখবে না। বিবিকে ডাকবে—কি যে করবে ভেবে পেল না। সে একটা হাবা মানুষের মতো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বিবি কখন জল থেকে ভেসে উঠবে সে আশায় দাঁড়িয়ে থাকল।

হঠাৎ আন্নু মাঝ-পুকুরে একটা চিতল মাছের মতো ভেসে উঠল।

ফেলু হাঁকল, আমার বিবি রে।

বিবি ফের ডুব দিল জলে।

—বিবি রে, পানির নিচে তর কি হারাইছে ?

জলের নিচ থেকে তখন বুড়বুড়ি উঠছে।

পানির নিচে কার কি যে হারায়। আন্নু ডুবসাঁতারে এখন পুকুর পার হয়ে যাচ্ছে। ফেলু বিবির ডুবসাঁতার দেখছে। ওর জলের ওপর ভেসে ওঠা দেখছে। আন্নুর শরীর জলে ভিজে থাকলে ফেলুর বড় কষ্ট হয়। টানা টানা চোখ। বোরখার অন্তরালে সে এমন খুবসুরত বিবিকে রাখতে পারল না। ওর হাত না ভাঙলে বিবির কপালে কত সুখ ছিল। সে বিবির জন্য বাবুরহাটের শাড়ি কিনে আনতে পারত এবং একটা ময়না পাখি কিনে দিতে পারত। পায়ে মল, হাতে বাজু এবং কপালে টিকলি আর গলায় বিছা হার। কোমরে রুপোর পইছি রোদে চকচক করত। এমন পুষ্ট শরীরে এসব থাকলে বিবি তার বেগম বনে যেত। হায়, তার নসিবে এত দুঃখ। সে বলল, হালার কাওয়া! হালার পাগল ঠাকুর।

'হুঁপ! আবার চিতল মাছটা জলে শরীর ভাসিয়ে দিল। এবং পাখনা খেলিয়ে, চিৎ হয়ে অথবা কাত হয়ে সাঁতার কাটলে আন্নু য্যান এক রুপালী মাছ। এই পুকুরের জলে একটা রুপালী-মোহ চোখের সামনে নাচছে। ওরও সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হচ্ছে, জলের নিচে মাছ হয়ে আন্নুকে ছুঁতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে পারছে না। তার হাত ভাঙা। হালার কাওয়া। সে ডাকল, আন্নু তুই উঠ দিনি। বাছুরটা ছুইটা গ্যাছে। ধরতে পারতেছি না।

আর কোন কোন দিন যখন সাঁজ নামে, যখন কুয়াশায় এই অঞ্চল ঢেকে যায়, যখন শীতের ঠাণ্ডায় পুকুরের মাছ, বিলের মাছ, নদীনালার মাছ এবং জলের তাবৎ জীব চুপ হয়ে থাকে তখন আন্নু যায় চুপি চুপি, পিছনে যায় ফেলু। সামনে শুধু মাঠ, মাঠে নাড়া এবং সর্ষে ফুল ফুটে থাকে। সর্ষে ফুল, বোঝা বোঝা নাড়া এবং ধনেপাতা—এইসব মাঠময় পড়ে থাকলে বিবি তার সে রাতে চুপি চুপি সব তুলে আনে। এমনভাবে আনে যেন সে বেছে বেছে আনছে। এক জায়গা থেকে সব তুলে নেয় না। ফাঁকে ফাঁকে তুলে আনে। জমি যার, সে আলে দাঁড়ালে টেরই পাবে না ফাঁকে ফাঁকে কেউ ফসল চুরি করে নিয়ে গেছে।

অথচ এই অসময়ে জলে সাঁতার আন্নুর! ফেলুর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। বাছুরটা ষণ্ড দেখে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। কার জমিতে গিয়ে মুখ দেবে এখন! একমাত্র আন্নু সম্বল। সে বাছুরটা ধরে আনতে পারে। আর বাছুর যখন মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ায়, পিছনে আন্নু কাপড় সামলাতে পারে না—বলিহারি যাই, আন্নু একেবারে তখন বনদেবী। সে হাঁকল, হালার কাওয়া! তর গরম বাইর কইরা দিমু।

আন্নু যেন টের পেল জলের নিচে, ফেলু হাঁকপাঁক করছে পাড়ে। সে উঠে বলল, কোনখানে ?

ফেলু হাত তুলে দিলে আন্নু ছুটল। বাছুরটা অনেক দূরে। আন্নু দ্রুত ছুটছে। ভিজা কাপড়ে ছুটছে। চুল ভিজা, কাপড় ভিজা, সব লেপ্টে আছে গায়ে। শাড়িটা হাঁটুর ওপর উঠে গেছে—সামনে সেই এক ধানের মাঠ, আন্নু ছুটছে সেই মাঠের ওপর দিয়ে। বিবিকে দেখে বাছুরটাও ছুটছে আর দূরে ছুটছে আকালুদ্দিন। নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। নামাজের আগে পরাপরদির মসজিদে পৌছাতে হবে। নামাজ শেষে সে তার সব জাত-ভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে, আল্লা-হু-আকবর।

কিছুদিন আগে এই দেশে ছোট ঠাকুর বড় এক সভা করেছিল। নেতা মানুষটির মাথায় গান্ধী টুপি। কালো বেঁটে মানুষ। আগুনের মতো তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সে এমন সব কথা বলছিল যে ক্ষণে ক্ষণে হাততালি পড়েছে। বক্তৃতার শেষে নেতা মানুষটি বললেন, আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এক দেশ, এক জাতি, হিন্দু-মুসলমানের এক পরিচয়, আমরা ভারতবাসী। আকালুদ্দিন গিয়েছিল সভাতে, কত লোক, কি রকম বক্তৃতা, সে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে মনে হেসেছিল—এক জাতি, এক পরিচয়—আমরা ভারতবাসী!

আর তখন ঈশম গোপাট পর্যন্ত নেমে এল। কারণ সে বেশীদূর যেতে পারছে না। সে গেলে বাড়িঘর কে দেখাশোনা করবে। পাণ্ডনাগণ্ডা কে বুঝে নেবে! সে না থাকলে, এই যে এক পরিবার থাকল, পাগল মানুষ থাকল, এবং বুড়ো মানুষটি—যিনি যে-কোনদিন আপন নিবাস থেকে ঈশ্বরের নিবাসে গমন করতে পারেন, তাদের এখন দেখেশুনে রাখার সব দায় এই মানুষের। সোনা, লালটু, পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বড়বৌ ধনবৌ

পূবের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শশীমাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে ওদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং নানারকম বোঝ-প্রবোধ দিচ্ছে—দূর বোকা, কাঁদে নাকি। কত বড় সম্মান। দেশের কাজ করছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। কত সম্পদ আমাদের। সব ইংরেজরা এখন সাগরপারে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের তাড়িয়ে দিলে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাবে না। আমাদের দেশ কত বড়, আর কি মহান এই দেশ। আমরা এই মহান দেশের মানুষ! আমাদের গর্বের শেষ নাই।

সোনা শশীমাস্টারের এমন সব কথা শুনে কান্না থামিয়ে দিল। সে চোখ মুছে বলল, কবে স্বাধীন হইব?

—তা আর দেরি নেই মনে হয়?

সোনার মনে হল স্বাধীন হলেই সব হয়ে যাবে। যেমন জালালি, যে খেতে পেত না, স্বাধীন হলে খেতে পেত। জলে ডুবে মরতে হত না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল জালালির জন্য। সে আর দুটো দিন দেরি করতে পারল না! স্বাধীন দেশের মানুষ সে তবে হতে পারত। তার মনে হল এখন, ঠাকুরদাও একদিন মরে যাবে। তিনি স্বাধীন হবার আগে মরবেন, না পরে মরবেন, পরে মরলে সে একদিন ঠাকুরদাকে তরমুজ খেত পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। বলবে, ঠাকুরদা আপনি তো সারা জীবন পরাধীন দেশের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন, এবার স্বাধীন দেশের মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আপনার ভাল লাগছে না! বাতাসটা পাতলা মনে হচ্ছে না! বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছেন না! মনে হচ্ছে না এবার আপনি আরও বেশীদিন বাঁচবেন।

ঠাকুরদা নিশ্চয়ই সোনার মাথায় হাত রেখে বলবেন তখন, তোরা কত ভাগ্যবান। তোরা স্বাধীন দেশের মানুষ। কত সংগ্রামের পর এ স্বাধীনতা, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, দেশবন্ধু ওদের কথা সব সময় মনে রাখবি। ওদের জন্য এই স্বাধীনতা। ওদের ভুলে যাবি না। তোরা কতকাল বাঁচবি রে। আহা স্বাধীন, স্বাধীনতা এই শব্দ কি এক আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত কথা। সোনার চোখ বুজে আসছিল।

তখন শশীমাস্টার দেখল, ধানের জমির ওপর দিয়ে এক যুবতী মেয়ে ছুটছে। কে যায়! ওঃ, সেই ফেলুর ডানাকাটা পরী যায়। কার গলা হাত করে ধরে আনা বিবি। বাছুরটাকে ধরে ফেলেছে। ফেলু দাঁড়িয়ে আছে জালালির

কবরের পাশে। কবরের সাদা কাশ ফুল দুলছে বাতাসে। কবরটার ওপর সবুজ ঘাস। বৃষ্টিতে বর্ষায় কবরটা আর কবর নেই। মসৃণ মাঠ হয়ে গেছে। সেখানে আবার নতুন জীবনের উন্মেষ হচ্ছে।

আকালুদ্দিনের পরাপরদি পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেছে। সে ফজরের নামাজে হাজির হতে পারে নি। জোহরের নামাজ সে সকলের সঙ্গে পড়তে পারবে। দূর দেশ থেকে বহুজন এসেছে। মসজিদের পাশে মাদ্রাসা। মাদ্রাসার সামনে বড় মাঠ, মাঠে শামিয়ানা টাঙানো। নিশান উড়ছে। সেই কবে একবার তাঁর গাঁয়ের পাশে সামুভাই জালসা করেছিল, শিন্নির জন্য তামার বড় বড় ডেগ আর তখন মুড়াপাড়ার হাতি এসে সব তছনছ করে দিয়েছিল—জালসা হতে পারে নি, কিন্তু এখানে কার হিম্মৎ আছে জালসা ভেঙে দেয়। সাহাদের ঘাট নদীর অপর পাড়ে—নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র, তার পাশে পুরানো ভাঙা সব বাড়ি, এক-সময় এ-গঞ্জের মতো জায়গায় সাহাদের প্রতিপত্তি ছিল কত! এখন সাহারা নারায়ণগঞ্জে তেজারতির কারবার করে বড় ব্যবসা ফেঁদেছে। গাঁয়ের পুরানো ভাঙা বাড়ি ফেলে চলে গেছে তারা। বড় বড় সব অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে পাঁচিলে। আর শুধু চারপাশে মুসলমান গ্রাম এবং নদী পার হলে এই মাদ্রাসা মৌলানাসাবের প্রাণ। এখানে কলকাতা থেকে জনাব আলি সাহেব এসেছেন। তিনি যখন বক্তৃতা করেন কাঁচের গ্লাসে ফুৎ ফুৎ জল খান। আকালু ভাবল সেও জল খাবে কাঁচের গ্লাসে। তা'হলে গলা শুকাবে না। কারণ এইসব নামী মানুষের সঙ্গে আকালুদ্দিন আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতা করবে। জল খেলে মাথায় বুদ্ধি আসে বুঝি। সামুভাইও জল খান বারে বারে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জল খাওয়া বড় নেতার স্বভাব। সে এইসব নামী মানুষের সামনে কি আর বলবে! ভাবল, কি আর বলা যায়, শুধু প্রথমে বলা ইনসান আল্লা, তারপর কিছু হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে পড়া।

সে চারিদিকে দেখল নিশান উড়ছে। কোথাও ইস্তাহারে লেখা আছে নারায়ে তকদির অথবা লাল নীল সবুজ রঙের ফেস্টুন, ধর্মাধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, হিন্দু বিধবা রমণীর মুসলমান দর্শনে ঘৃণ্য মুখ, অস্পৃশ্যতার কঠিন দৃশ্য এবং কার কত জমি, হিন্দু শতকরা কতজন, হিন্দু কত আয় করে, সেখানে অঞ্চল বিশেষে কত মুসলমান, তার আয় কত—এসব পরিসংখ্যান। সহসা দেখলে মনে হবে—শ্রেণীসংগ্রামের ডাক দিয়েছে তারা।

এবং কবে প্রথম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁরা করেছেন তাঁদের ছবি। বিখ্যাত

সব মসজিদের ফটো থামের লাল-নীল মোড়া কাগজের ওপর সাঁটা। এবং হজে গেলে যেসব ছবি সংগ্রহ করে এনেছে হাজিসাহেবেরা সেইসব ছবি ঝুলিয়ে পবিত্র ইসলামের বাণী বহন করছে এই সভা। শামিয়ানার নিচে এইসব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আকালুদ্দিন গোড়লের মতো হেঁটে যাচ্ছিল। সে মানীজনদের আদাব দিল। শামিয়ানার দক্ষিণ দিকে বড় বড় উনুনে তামার ডেগ। যারা মানী-গুণীজন তাদের খাবার ব্যবস্থা। সে এখানে এসেই প্রথম খোঁজ করল সামসুদ্দিনের। সামুভাই থাকলে সে গলা ছেড়ে বলতে পারবে। সে মনে বল পাবে। সামুভাই থে কোন দিকে! কেউ বলল, তাইন গোসল করতে গ্যাছেন। কেউ বলল, তিনি আলি সাহেবকে নিয়ে মাঠে নেমে গেছেন। এবং এইসব গ্রামদেশের কি অসহায় দারিদ্র্য তাই দেখাতে নিয়ে গেছেন।

ওরা এবার সকলে রান্না হলেই আহার করতে বসবে। তারপর জোহরের নামাজ। নামাজে কে ইমাম হবে আজ! আকালুদ্দিনের কতকালের খোয়াব সে এমন এক বড় মাঠের জমায়েতে ইমাম হবে। সামুভাই থাকলে সে একবার মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে পারত।

সে হন্যে হয়ে সামুভাইকে খুঁজছিল। আর খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে গেল। সামু সেই লম্বা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজটুপি পরে মাঠ থেকে উঠে আসছে। পায়ে বুট জুতো। মোজা নেই। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক। রোদে ওদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে। জল তেস্টা পেতে পারে বলে বদনা হাতে পাঁচ-সাতজন লোক সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে। ওরা এবার সকলে খেতে বসে গেল। পাটির ওপর পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে গেল। বড় থালায় ভাত। ছ'সাতজন করে একটা থালার চারপাশে বসেছে। থালার মাঝে মঠের মতো ভাত সাজানো। কিনার থেকে যে যার মতো ভাত ভেঙে ডাল নিয়ে চেটে চেটে ভাত-ডাল গোস্ত খাচ্ছে। সামু আকালু এক গাঁয়ের লোক। এবং যারা কাছাকাছি তারা পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। যে যার মতো একই থালায় ভাত ভেঙে মেখে খেয়ে উঠে মুখ ধুল। নদীর ঘাটে অজু করে এল। একসঙ্গে সার বেঁধে নামাজ পড়ল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে আকালুদ্দিনের। সে ইমামের কাজ করছে। তারপর মঞ্চে উঠে যে যার মতো বলে গেল। সবাই প্রায় কথায় কথায় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বলল। মাঠের দিকে হাত তুলে দেখাল। বলল, দু'চার বিঘা জমি বাদে, সব জমি কার?

—হিন্দুর।

—ভূমিহীন কারা?

—আমরা।

—উকিল বলুন ডাক্তার বলুন কারা?

—হিন্দুরা।

—শিক্ষা-দীক্ষা কাদের জন্য?

—হিন্দুর জন্য।

—ওদের জমিতে খাটলে আপনি খান, আপনার নাম মুসলমান।

এবারে হাততালি পড়ল।

সামসুদ্দিন কিন্তু খুব যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে—এই যে আমরা, মুসলমানেরা আলাদা একটা দেশ চাই—তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা রাখল। সে একটা সালের উল্লেখ করে বাংলাদেশে হকসাহেবের পরিণতির কথা বলল। হিন্দু-মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারে না, তার কারণ ব্যাখ্যা করল। সে বলল, আপনেরা জানেন মিঞাভাইরা, আমার দিলের চাইতে আপন পীরিতের মানুষেরা, আপনেরা জানেন, ১৯৩৭ সালের কথা। হকসাহেবের কৃষক প্রজা দল যেহেতু মুসলিম প্রধান দল, তাকে নিয়ে কংগ্রেস যৌথ সরকার গঠন করলেন না। আপনারা জানেন উত্তরপ্রদেশের মুসলিম লীগ দাবি করেছিল যৌথ সরকারের—নেহেরুজী তা বানচাল করে দিলেন। আপনারা জানেন হকসাহেবের দল কোন সাম্প্রদায়িক দল নন, সাধারণ মেহনতি মানুষ নিয়ে এই দল, কৃষক প্রজা নিয়ে এই আন্দোলন, অথচ হিন্দুদের এমন মুসলিম বিদ্বেষ যে, তারা কিছুতেই যৌথ সরকার গঠন করলেন না। বরং কংগ্রেস হক-সাহেবের সব প্রগতিশীল কাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। হকসাহেব তখন বুঝতে পারছেন তাঁর তখৎ-ই-তাউস পদ্মা, মেঘনা, বুড়িগঙ্গায় ভেঙ্গে পড়েছে। বলে সামসুদ্দিন একটু থামল। এক গ্লাস জল খেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেমন ভিড় হয়েছে। তারপর ফের বলতে থাকল, আপনাদের কাছে আমি এখন পীরপুরের রিপোর্ট তুলে ধরব। কি প্রকট এই মুসলিম বিদ্বেষ! কি অমানুষিক অত্যাচার! তাজা খুনের হোলি খেলেছে তারা। আপনার আমার খুনে ওরা গোসল করেছে। সে এসব বলে আবার জল খাবার সময় কি যেন এক ছবি, ছবিতে মালতীর মুখ, সেই করুণ মুখ, তুই সামু এডা কি কস, সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন গলা শুকিয়ে গেল। কোনরকমে তারপর বলল, আপনাদের ভিন্ন দেশ

বাদে গতি নাই। সে নিজেকে বলল, এবার, হে আল্লা, এ ছাড়া এ-জাতির উদ্ধার নাই।

কি ভাবল সামান্য সময় ফের সামু। এমন ভিড়ে সে যে কেন বার বার সেই করুণ মুখ দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছে না। যেন কেবল বর্ষায় মালতী তার হারানো হাঁসটা খুঁজছে। এবং সে মালতীকে নিয়ে ধানখেতের আলে আলে লগি বাইছে। মালতীর হাঁসটা খুঁজে পেলেই সে তাকে দিয়ে আসবে বাড়িতে।

এসব সাময়িক দুর্বলতা। এতগুলি মানুষ তার মুখ থেকে আরও কি শুনতে চাইছে। সে এত কম বললে নিজের জাতির প্রতি বেইমানী করবে। সে গলা সাফ করে বলল, উত্তরপ্রদেশের খালিকুজ্জমান সাহেবের কি অনুনয় বিনয়, আমাদের সরকার পরিচালনায় সামান্য স্থান দিন। কে কার কথা শোনে। বল্লভভাই প্যাটেল সব অনুনয় যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলেন। সে এবার ঘড়ি দেখল। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে বলল, আমার পরবর্তী বক্তা আছেন। তাঁরাও তাঁদের বক্তব্য রাখবেন আপনাদের কাছে। কেবল মেহেরবানী করে আপনারা যাবার আগে মোতাহার সাহেবের কাছ থেকে একটা করে বই নিয়ে যাবেন। তারপর সাঁজে যখন আজান শুনতে পাবেন, কুপির আলোতে পড়বেন এই রিপোর্ট। মুসলিম নিপীড়নের খুঁটিনাটি তথ্য পড়লে আপনাদের খুন টগবগ করে ফুটবে। সে বড় সহজ ভঙ্গীতে এবার হাতটা মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিল।

আকালুদ্দিন বড় নিবিষ্ট মনে শুনছে এবং সামুর অবয়বে কি কি রেখা ফুটে উঠছে সে লক্ষ্য রাখছে। সেও এমনভাবে মুখের রেখার দ্বারা তার ক্রোধ, উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা সকলের ভিতর ছড়িয়ে দেবে। শেষে সামু যেভাবে কথা শেষ করে হাত ঘুরিয়ে এনেছে দৃপ্ত ভঙ্গীতে, সেও অন্যমনস্ক-ভাবে নকল করতে গিয়ে কেমন সকলের কাছে ধরা পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ হতেই সহসা হেঁকে উঠল, আল্লা-হু-আকবর।

জনাব আলি সাহেব বললেন, দেশটা ইংরেজরা আমাদের হাত থেকে নিয়েছিল। আশা করব যাবার সময় ইংরেজ শাসনভার আমাদের হাতে দিয়ে যাবেন। গোলামের জাত দেশ শাসনের বোঝে কি!

সবাই হাততালি দিচ্ছে একসঙ্গে।

বড় মজার কথা বলেছেন সাহেব। ওরা খুব খুশি এমন কথায়।

বিকেলবেলা আকালু মসজিদের নিচু জমিটাতে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। এক এক করে এবার বিদায় নিচ্ছে সবাই। গয়না নৌকায় আজই সামুভাই নারায়ণগঞ্জে যাবে। কাল ঢাকা চলে যাবে। সে একটু সুবিধা মতো সামসুদ্দিনকে একা পাবার ইচ্ছাতে আছে। আলি সাহেব দু'দিন থাকবেন মৌলানাসাবের বাড়িতে। এখন সবাই চলে গেলে কেবল থাকে সামুভাই। সামুর অঞ্চল এটা। সে-ই সবাইকে বিদায় দিচ্ছে। বিদায় দিয়ে সামু এদিকে উঠে আসছে। দু'জন লোক পিছনে। ওরা সামসুদ্দিনকে শামিয়ানার নিচে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময়। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল, দ্যাশে যখন আইলেন, বাড়ি একবার ঘুইরা যাইবেন না!

—সময় খুব কম। কাইল আবার বন্দরে সভা আছে।

আকালু এবার সামুকে চুপি চুপি বলল, ছোট ঠাকুরকে ধইরা নিয়া গ্যাছে।

কেমন বিস্ময়ের গলায় বলল, ছোটকর্তারে!

—হ, ছোটকর্তারে।

—কবে?

—আইজ। আইছিল ধরতে রঞ্জিতরে। পাইল না। ধইরা নিয়া গেল ছোটকর্তারে।

—রঞ্জিত কই গ্যাছে?

—রঞ্জিত মালতীরে নিয়া পালাইছে।

সামসুদ্দিনের মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে আর কিছু বলতে পারল না।

আকালু কত কাজের, লীগের জন্য সে কতটা জীবন পাত করছে এমন দেখানোর জন্য বলল, দিলাম খবর থানায়। কইলাম, একজন রাজনৈতিক কর্মী আত্মগোপন কইরা আছে।

—তর কি দরকার ছিল আকালু। তুই এমন করতে গেলি ক্যান!

—কাফের যত বিনষ্ট হয় তত ভাল না?

—না।

এমন চোখমুখ দেখবে সামসুদ্দিনের, সে আশাই করতে পারে নি। সামু আবার চুপ হয়ে গেল। শামিয়ানার নিচে হ্যাজাকের আলো। সে এক দরগার যুবক, অথবা এক ফকির যায়, তার হাতে লণ্ঠন, কত দূর যে সে এভাবে যাবে কেউ যেন বলতে পারে না। সামু শেষে বলল, আর কিছু কইবি?

সে কেমন থতমত খেয়ে গেল। সে আরও যা বলবে ভেবেছিল সামসুদ্দিনের মুখ দেখে সেসব ভুলে গেল।

পীরের মাজারে জোটন তখন সব করবী ফুল পরিষ্কার করছে। সে সাঁজ লাগলেই মোমবাতি জ্বালায়। এবং মাজারের ওপর গত সন্ধ্যা থেকে যেসব ফুল ঝরে পড়েছে সেসব ফেলে দিচ্ছে। তকতকে মাজার। চারপাশে সবুজ ঘাস। নিচে ফকিরসাব শুয়ে আছেন। আর ওপরে এই করবী ফুলের গাছ। নিশিদিন ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার ঘরটার দিকে উঠে যাবে এবার। এখনও ভাল করে অন্ধকার হয় নি। কিসের শব্দে সে শরবনের দিকে তাকাতেই দেখল, বাতাসে শরবন কাঁপছে। এবং শরবন ফাঁক করে কেউ এদিকে উঠে আসছে।

এই অসময়ে মানুষ! এক মিঞা মানুষ। কিন্তু একি! পিছনে বোরখা পরে এক বিবি। এমন একটা অঞ্চলে এই মিঞা বিবি। সে কেমন বিস্মিত চোখে মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে।

রঞ্জিত কাছে গেলেও জোটন কোন কথা বলতে পারল না। অপরিচিত মানুষজন আসে, সকালের দিকে আসে, পীরের মাজারে বাতাসা অথবা ফুল দিয়ে যায় কেউ। কেউ আসে জড়িবুটি নিতে। সন্তান-সন্ততি না হলে কেউ আসে। আর আসে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগলে। কেউ তার গাছের প্রথম লাউ, কুমড়ো মাজারে দিতে আসে। ফকিরসাবের সব জড়িবুটির গুণাগুণ জোটন জেনে নিয়েছে। এই করেই জোটেনের সংসার। সেও ক্রমে এই অঞ্চলের পীরানি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা বিবর্জিত জায়গায় থাকলেই সে আর মানুষ থাকতে পারে না, জীন পরী হয়ে যেতে পারে অথবা পীর পয়গম্বর। ফলে জোটনের কিছু জমি হয়েছে। কেউ ফসল দিয়ে যায়। কেউ মুরগী দিয়ে যায়। সে মুরগী বেচে, ফসল বেচে তেল নুন নিয়ে আসে তিন ক্রোশ দূর থেকে। এক হাট আছে। হাটবারে এই দরগা ভেঙে মাইলখানেক হেঁটে গেলে হাটের পথ, হাটের মানুষেরা সে পথে যায়। যারা যায় তাদের হাতে সে মুরগী দিয়ে দেয়, ফসল দিয়ে দেয়। ওরা এসব বিক্রি করে তেল নুন ডাল এসব দিয়ে যায়। আজ হাটবার নয়। সে কাউকে মুরগী দেয় নি যে, বেচে তাকে তেল নুন দিয়ে যাবে। এই সূর্যাস্তের সময় কেউ এমন নেই অঞ্চলে বিবি নিয়ে এখানে চলে আসে! সুতরাং জোটন কি যে বলবে এই অপরিচিত মিঞাসাবকে বুঝতে পারল না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

রঞ্জিত দাড়ি-গোঁফ তুলে বলল, আমাকে চিনতে পারছিস না জোটন!

চিনতে পারছে না জোটন। যে মানুষ খুদকুঁড়া পেলেই কি খুশি, সে যে এখন পীরানি তা রঞ্জিত জানবে কি করে! কেবল জোটন বুঝতে পারল, এই মানুষ এসেছে তার বাপের দেশ থেকে। নতুবা তার নাম ধরে কে ডাকতে সাহস পাবে। বোরখার নিচে বিবি মুখ লুকিয়ে রেখেছে। বয়সে কত ছোট এই মানুষ, তার হাঁটুর সমান বয়সী। সে বলল, কোন গাঁ তোমার?

—আমি রঞ্জিত। গ্রাম রাইনাদী।

—আপনে রঞ্জিত ঠাকুর! অমা, এডা কি কয় তাইন! বোরখার নিচে কারে আনছেন? আপনে কত বড় হইয়া গ্যাছেন।

—মালতীরে।

—আরে এডা কি কন! মালতীরে! কই ছাখি।

মালতী বোরখা খুলে ফেলল।

জোটন মালতীর মুখচোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল। কি শীর্ণ চেহারা! চোখ কোটরাগত। কঙ্কালসার। কি যুবতী কি হয়ে গেছে! জোটন বলল, ভিতরে আয় মালতী। কর্তা, আসেন।

রঞ্জিত কি বলতে গেলে জোটন বাধা দিল। বলল, কর্তা, ব্যাখ্যা লাগব না। পীরের থানে যখন আইসা পড়ছেন আর ডর নাই।

এই জোটন নিবাসী এই বনে, এবং বনের ভিতর এক রহস্য আছে। সেই রহস্যে সে ডুবে গেছে। এই দরগার ঝোপ-জঙ্গল, কড়ুই গাছ, রসুন গোটার গাছ ফেলে সে আর এখন কোথাও যেতে চায় না। বনবাদাড়ে অন্ধকারে একটা করবী গাছের নিচে কবরের পাশে বসে থাকলে মনেই হয় না মাটি কার? মাটি হিন্দু না মুসলমানের? সে এতদিন পর দু'জন বাপের দেশের মানুষ দেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠল, বলল, অ পীরসাহেব, ছাখেন আপনার দরগায় কেডা আইছে! বলে সে দুই অতিথি নিয়ে হাঁটতে থাকল।

সেদিনই শশীমাস্টার খবর নিয়ে গেল মুড়াপাড়া। শচীন্দ্রনাথকে সন্তোষ দারোগা ধরে নিয়ে গেছে। কিছু খোঁজখবর পেতে চায় রঞ্জিত সম্পর্কে। এবং শচীন্দ্রনাথের এখন কাজের সময়। কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মী এখানে ওখানে ধরা পড়ছে। জেলে নিয়ে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ, উমানাথ সেনের মতো বড় কর্মী নয়। সাধারণ সদস্য সে। সে যতটা না কর্মী তার চেয়ে বেশি সৎ এবং সাহসী মানুষ। এই অসময়ে ওকে ধরে নেবার কোন অর্থ হয় না। একমাত্র অর্থ থাকতে পারে সব কংগ্রেস কর্মীদের যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ফাঁক বুঝে শচীন্দ্রনাথকে একটু ঘুরিয়ে আনা। ওরা শচীন্দ্রনাথকে আগামী কাল নারায়ণগঞ্জে চালান করে দেবে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ যদি শহরে-গঞ্জে গিয়ে উকিল ধরে জামিনে খালাস করে আনতে পারে—এমন উদ্দেশ্য নিয়ে শশীমাস্টার মুড়াপাড়া রওনা হয়ে গেল।

ছোটকাকা বাড়ি না থাকায় বাড়িটা খালি লাগছে। মাস্টারমশাই দুপুরে রওনা হয়ে গেলেন। এখন একমাত্র বাড়িতে পুরুষ বলতে ঈশম আর পাগল জ্যাঠামশাই। ঠাকুর পূজা কে করবে? জেঠিমা বড়দাদাকে পশ্চিমপাড়া যেতে বলেছে। সেখানে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার আছে। গোলক চক্রবর্তী খবর পেয়েই চলে এসেছে। ঠাকুমা পূজার আয়োজন করে দিয়েছেন। শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন বেটে এবং কোষাকুষি ঠিক করে, ফুল-ফল সাজিয়ে তিনি বসে আছেন। সোনা ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে রয়েছে। ছোটকাকা বাড়ি নেই। কাজকর্ম দেখে-শুনে করতে হবে। সে, ঠাকুমা কি আনতে বলবে, কখন কি আদেশ করবে, সেজন্য বসে রয়েছে। ঠাকুমা আয়োজন করার সময় সারাক্ষণ স্তব পড়ছিলেন। এই মন্ত্রপাঠ সোনাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি মুগ্ধ করে রাখে। জেঠিমা আজ রান্নাঘরে। মার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ক'দিন থেকে শুয়ে আছে কেবল। এবং ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই কি যেন এক বিষণ্ণতা সারা পরিবারে ছড়িয়ে আছে।

ঈশম গরুগুলি গোপাটে দিয়ে এসেছে। সে জমিতে তরমুজের লতা লাগিয়ে দিয়েছে। হেমন্ত পার হলে শীতকাল আসবে, শীত পার হলেই বসন্ত। বসন্তে সেই বড় বড় তরমুজ। খর রোদ, কাঠফাটা রোদে তরমুজের

রস। এখন থেকে লতার যত্ন না নিলে গাছ বড় হবে না, লতা বাড়বে না। সে গাছ, লতা এবং ফুলের প্রতি যত্ন নেবার জন্য মাথায় করে একটা ছই—যেমন নৌকায় ছই দেয়া থাকে, তেমনি সেই ছই চরের বুকে নিয়ে ফেলবে। কারণ বর্ষার আগে সে ছইটা তুলে এনেছিল ডাঙাতে, এখন জল নেমে গেছে চর থেকে, সে চরের বুকে আবার মাথায় করে ছই নিয়ে যাচ্ছে। ছোটকর্তা বাড়ি নেই বলে ঈশম বড় বেশি লক্ষ্য রেখে কাজকর্ম করছে। সোনা দেখল ছই মাথায় ঈশমদাদা নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। কত যে কাজ সংসারে। সারাক্ষণ মানুষটা কোন না কোন কাজের ভিতর ডুবে থাকে। ছোটকাকা বাড়ি নেই বলে তার যেন আরও বেশি কাজ। সে আর সোনাকে দেখা হলেও কথা বলছে না। এ-বছর মামাবাড়ি যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই মামাবাড়ি যাবার কথা। কবে যাবে, সেও জানে ঈশম। সেই খবর আনবে, ফাউসার খাল থেকে জল নেমে গেছে কিনা। জল না নামলে ধনবৌ বাপের বাড়ি যেতে পারে না। বৌ-মানুষ খালের জল ভাঙে কি করে। এখনও বেহারা যারা আসে বিহার অথবা পূর্ণিয়া থেকে তারা আসে নি। ওরা আসবে পৌষে। ঈশমই খবর নিয়ে আসবে ওরা দক্ষিণপাড়াতে এসেছে কিনা। কিন্তু এবার খবর নিয়ে এলেও ওরা যেতে পারছে না। ছোটকাকা বাড়ি নেই। তিনি বাড়ি না থাকলে যাবার অনুমতি কে দেবে। সোনা কি ভেবে ছুটে গেল পুকুরের পাড়ে।

সে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই ফ্লুট বাজনা, অমলা-কমলার মুখ সব মনে পড়লে এই অর্জুন গাছটার নিচে এসে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে ভিটাজমি ফসলবিহীন। ফতিমা চলে গেছে ঢাকায়। ফতিমা বাড়ি থাকলে ওকে দেখতে পেত। দেখতে পেলেই চলে আসত চুপি চুপি। একা একা সে নানারকম গাছপালার ভিতর দিয়ে পালিয়ে চলে আসত। চলে এলেই মনের ভিতর সেই রহস্যটা জেগে যেত। অমলা রহস্যের স্পর্শ দিয়ে সহসা উধাও। কমলা কি করছে এখন! কলকাতায় বড় বাড়ি, কি প্রাচুর্য—এসব মনে হলেই ওর রাতের কথা মনে হয়, লুকোচুরি খেলার কথা মনে হয়, ছাদের কথা মনে হয়। আর মনে হয় এমন যে মাঠ সামনে পড়ে আছে—অমলা কমলা যদি একবার এ-দেশে আসত! সে তাকে নিয়ে যেত নদীর চরে।

সামনের মাঠে তার নেমে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে এখন। কারণ মার শরীর ভাল না। ওর কেন জানি কিছু ভাল লাগছে না। অথচ এই গাছের নিচে

দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট এবং অস্পষ্ট ছায়ার মতো গরু-বাছুর। এটা টিলার মতো জায়গা বলে অনেক দূর দেখা যায়। এবং মনে হয় জোটন তার নিবাস দেখে-শুনেই সবচেয়ে উঁচু ভূমিতে তৈরি করেছে এবং খুব দূরে দু'একজন চাষী মানুষ দেখা যাচ্ছে অথবা এই যে অঞ্চল, অঞ্চলের চারপাশে শুধু বেনা ঘাস, হোগলার বন শরের জঙ্গল সব পার হয়ে মানুষের আসা খুব কঠিন। অগম্য স্থান। এমন একটা অঞ্চলে জোটন থাকে। রঞ্জিত শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঢুকে গেছে। সুতরাং আর কোন ভয় নেই। মুখে-চোখে সেই নিশ্চিন্ত ভাবটাও কাজ করছে রঞ্জিতের। জুটির এখন আর সেই খেটে-খাওয়া চেহারা নেই। পীরের নিবাসে বাস করে ওর মুখে-চোখেও কেমন পীরানি-পীরানি ভাব। সে শরীরটা ডেফল গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে দিল। সে যে এসব বলছে, মালতী শুনতে পাচ্ছে কিনা আবার এই ভেবে চারিদিকে তাকাতেই দেখল মালতী দূরে কবরের নিচে করবী গাছের ফুল তুলছে কোঁচড়ে।

জোটন আবার কথা আরম্ভ করল। —পানি আইনা দেই। গোসল করেন। ছাগলের দুধ আছে, আতপ চাউল আছে, সীম আছে। সিদ্ধ ভাত খান। মালতীরে খাইতে দ্যান। পরে ভাইবা যা হয় কিছু ঠিক করতে হইব।

জোটন এবার কবরের কাছে গেল। রঞ্জিত পিছনে-পিছনে হাঁটছে। একটা লাউএর টাল, সেটা অতিক্রম করে যেতে হয়। ওরা দু'জনই টালের নিচে গুড়ি মেরে ওপারে উঠে গেল। জোটনের শীত-শীত করছে। সে ওর কাপড় দিয়ে শরীর ভাল করে ঢেকে নিল। ওরা দেখল কবরের ওপারে দু'পা ছড়িয়ে এখন মালতী বসে রয়েছে। কোঁচড়ে করবী ফুল। ফুলগুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেবল কি খুঁজছে যেন। বুঝি সে তার যা হারিয়েছে তা ফিরে পেতে পারে কিনা, ফুলের ভিতর হাত রেখে তার অনুসন্ধান। এখানে উঠে এসেই তার ফের মনে পড়েছে পেটের ভিতর এক বৃশ্চিক বাড়ে দিনে-দিনে। লেজে হুল, মুখে কাঁটা, দু'পায়ে সাঁড়াশি। মাঝে-মাঝে এটা ওর চোখের সামনে খুব বড় হয়ে যায়। যেন সেই নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে অতিকায় এক বৃশ্চিক যার পা যোজন প্রমাণ, যার হুল আকাশে উঠে গেছে, প্রায় হাতির শামিল এক জীব ওকে দলে-পিষে মেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছে। অথবা সাঁড়াশি দিয়ে গলা টিপে মারবে। সে তখনই হাঁসফাঁস করতে থাকে। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে—না-না-না। যেন সেই হুল ভিতরে বারে-বারে দংশন

করছে। আতঙ্কে সে শিউরে উঠছে। তার লাবণ্য আর নেই। সেও মরে যাচ্ছে বুঝি। আগামী শীতে এভাবে বাঁচলে সে মরে যাবে।

জোটনের চোখ-মুখ ফেটে জল আসছিল। কি সুন্দর মুখ কি হয়ে গেছে! জোটন যতটা পারল পায়ের কাছে গিয়ে বসল, ওঠ মালতী।

রঞ্জিত দেখল জোটনের কথায় মালতী উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং জোটনের সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছে। সেও হাঁটছিল। কোন কথা নেই। পায়ের নিচে ঘাস এবং শুকনো পাতা। ওরা আবার লাউ গাছের টাল অতিক্রম করে এল। ডেফল গাছটা পার হলেই জোটনের চটি। চটির ভিতর ঢুকলে জোটন বলল, হাত-পা পানিতে ধুইয়া নে। কর্তা দুধ গরম কইরা দ্যাউক, তুই খা। খাইলে শরীরটা ভাল লাগব।

জোটন ছাগল দুয়ে দিল। নতুন মাটির হাঁড়িতে দুধ। সে তিনটে কচার ডাল কেটে আনল। তিনটে ডাল খোঁটার মতো পুঁতে ওপরে দুধের হাঁড়ি রেখে সে বলল রঞ্জিতকে, ইবারে আগুনডা জ্বালেন।

শুকনো ঘাস পাতা এনে দিয়েছে জোটন। এত বড় বনে জ্বালানির অভাব নেই। সে ঘর থেকে টিন বের করেছে। চিড়া বের করে দিয়েছে হাঁড়িতে। মালতীকে জল আনতে বলেছে কুয়ো থেকে। জোটন সব কিছু বের করে দেবার সময় কত কথা বলছিল, এত-এত খাইছি ঠাকুরবাড়ি। ধনমামী বড়মামী কি না খাওয়াইছে। ঠাইনদি ভাল যা কিছু হইছে আমারে না দিয়া খায় নাই। অর্থাৎ এসব বলে জোটন পুরানো দিনের স্মৃতি স্মরণ করছে। সে কি করতে পারে তাঁর মেমানদের জন্য! এই মেমান এসেছে ঠাকুরবাড়ি থেকে। ঠাকুর-বাড়িতে সে অভাবে অনটনে খেয়ে গেছে। খুদকুড়া যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, বড়মামী জোটনকে ডেকে দিয়ে দিত। সে যে এটুকু ওদের জন্য করতে পারছে সে যেন সবই আল্লার মেহেরবানি।

ওরা জোটনের অতিথি। জোটন এখন দু-চার-দশজনকে, ইচ্ছা করলে দু'দশ মাস ধরে খাওয়াতে পারে। যখন মেলা হয়েছিল, মানুষজন এসেছিল কত। দোকান-পসরা, লাল-নীল বেলুন, তালপাতার বাঁশি, পীরের মাজারে কত পয়সা, বাতাসার থালায় কত চৌআনি, টাকা। সে সবই পীরানির প্রাপ্য। সে এভাবে দু'বিঘা ধানের ভূঁই—কারণ মোরলের বেটা হয় নি, পীরের মাজারে মানত করে বেটা হয়েছে, সে দুই বিঘা ভূঁই লিখে দিয়ে গেছে জোটনকে। সকালের দিকে কেউ-কেউ আসে, ব্যারামি নাচারি মানুষকে তারা ধরাধরি করে

তুলে নিয়ে আসে। জড়ি-বুটি যা কিছু ছিল ফকিরসাবের, সে অসুখে-বিসুখে সে-সব ব্যবহার করে। কেউ এলেই দরগার অনেক নিচে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, পীরের দরগায় মানুষ উইঠা যায়। হাঁক পেলেই জোটন তাড়াতাড়ি চটিতে উঠে যায়—কারণ জোটনের কাছে এই বন উদাসী এক জগৎ। ওর চোখে-মুখে পীরানি পীরানি ভাব। বনের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লা কিছুই দিয়ে পাঠায় নি কাউকে। শরীরের বসন-ভূষণ অধিক মনে হয়। লজ্জা নিবারণের কি আছে এত বড় বনে! বনের ভিতর একা-একা জ্যোৎস্নায় তার হিন্দুদের দেবীর মতো হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছা হয়। সে শরীরে বাস রাখে না। খালি অঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায় বনে, মানুষ দরগায় উঠে এলেই বেনা ঘাসের অন্তরালে উঁকি দেয়। তারপর হাঁকে—মানুষ উইঠা যায়। কেয়ামতের দিন কবে জানতে চায়। কে জাগে দরগায়?

পীরানি তাড়াতাড়ি তখন জোটন হয়ে যায়। বসন-ভূষণ পরে গলায় মালা-তাবিজ পরে সে তাড়াতাড়ি পীর সাহেবের ছইটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। তারপর হাঁকে, পীরানি জাগে। তখনই মানুষটা দরগায় উঠে আসতে সাহস পায়। নতুবা সে যতক্ষণ হাঁক না দেবে, পীরানি জাগে—ততক্ষণ সেই জড়ি-বুটির জন্য যারা আসবে ঘাসের অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করবে। কখন বনের ভিতর থেকে ডাকটা ভেসে আসবে—পীরানি জাগে। পীর মুর্শিদ নিয়ে রঙ্গরস করা যায় না, চুরি করে তাদের লীলাখেলা দেখা পাপ। সুতরাং সোজা-সুজি কেউ দরগায় উঠে আসতে সাহস পায় না। কেবল বছরে যেদিন আশ্বিনের অষ্টমী তিথিতে মেলা বসবে সেদিন হাঁক দেবার নিয়ম নেই। সোজা তুমি দরগায় উঠে আসবে—এমন একটা নিয়ম এ ক'মাসই চালু হয়ে গেছে।

জোটন মনে-মনে বড় প্রসন্ন। কতদিন পর দরগায় বাপের দেশ থেকে মেমান এসেছে! মালতী যে গর্ভবতী এবং রঞ্জিত যে পলাতক—ওরা দুজন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে পালিয়ে এসেছে—সে-সব ভুলে কোথায় কি পাওয়া যাবে এখন, যেমন সীমের মাচানে সীম, লাউয়ের মাচানে লাউ সে তুলে বেড়াচ্ছে। অতিথিদের রাতের খাবার ব্যবস্থা করছে। সে মালতীকে ডাকল, আয়, দেইখা যা। সে তার নিজের হাত লাগানো সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান এবং পুঁই মাচায় হলুদ রঙয়ের উচ্ছে ফুল দেখাল। সে যে এখন পীরানি, তার নসিব পাল্টে গেছে এবং বড় মায়ায় চারিদিকে সে তপোবনের মতো এক দরগা গড়ে তুলছে, সে-সবও দেখাল মালতীকে।

আজকাল রাত হলে আর ভয় থাকে না জোটনের। কবর দিতে আসে যারা তারা পর্যন্ত পীরের দরগায় কিছু দিয়ে যায় অথবা মোমবাতি জ্বালাতে আসে কেউ। সে তখন রসুনগোটার তেলে প্রদীপ জেলে, গলায় মালা-তাবিজ পরে এবং মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকারে চোখ রক্তবর্ণ করে বসে থাকে। মানুষের এক ভয়, মৃত্যুভয়। যম-দুয়ারে দিয়া কাঁটা আমার ভাইয়েরে দিলাম ফোঁটা। জোটন যেন ভাইফোঁটার মতো বিড়বিড় করে কি বলে তখন। মানুষেরা অনেক দূরে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে। মানুষেরা তার কাছে পর্যন্ত আসতে সাহস পায় না তখন।

জোটন বলল, তর কোন অসুবিধা হইব না মালতী। ল, তুই সান করবি।

রঞ্জিত মালতীকে দুধ গরম করে খেতে দিল। দুধটা খেয়ে মালতী স্নানের জন্য বসে থাকল। ছাগলটা আনতে গেছে জোটন। সে ছাগলগুলো বেঁধে রাখল ডেফল গাছে। বলল, ল যাই। সান করলে শরীর ঠাণ্ডা হইব।

জোটনের আছে বলতে এক ছই। আর চটিতে আছে দুটো ঘর। ভাঙা ইটের পাঁচিল। সে ঘর দুটোর একটাতে ছাগল-গরু এসব রাখবে বলে করেছে। অন্য ঘরটা করেছে মেলার সময় তার বাপের দেশ থেকে কেউ এলে থাকবে। তার সারাটা দিন বনে-বনে কেটে যায়। কখনও সে ছইয়ের নিচে বসে নামাজ পড়ে। অথবা মালা-তাবিজের ভিতর পা মুড়ে কেমন মাথা নিচু করে বসে থাকে। ঘর দুটো তার ব্যবহারের দরকার হয় না।

যেটাতে এলে বাপের দেশের মানুষ থাকার কথা সে-ঘরে এখন চুপচাপ রঞ্জিত একটা কাঠের জলচৌকিতে বসে রয়েছে। জোটন মালতীকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে থাকে না বলে কেমন এক বন্য স্বভাব জোটনের। রঞ্জিত এসেই যেন সেটা টের পেয়ে গেছে। সে রাতে ছইয়ের ভিতর থাকে এবং বাইরে রসুনগোটার গাছে মুশকিলাসানের লম্ফটা সারারাত জ্বললে সে নির্ভয়ে ঘুম যেতে পারে।

জোটন কবর পার হয়ে এসেই কেন জানি মালতীকে একটু থামতে বলে আবার ডেফল গাছটার নিচে চলে গেল। বলল, কর্তা, মালতীর কাপড়টা ঘাটের সিঁড়িতে রাইখা আসেন।

রঞ্জিত মালতীর পোঁটলা থেকে সাদা এক থান বের করল। জোটন ওদের কিছুই ধরছে না। হিন্দুর ধর্মাধর্ম এই। অন্য জাতি ছুঁলে জাত বাঁচে না। সে ছুঁয়ে দিলে মালতী সারারাত না খেয়ে থাকবে। এমন কি সে যে সীম, বরবটি,

লাউ এবং দুটো পেঁপে পেড়েছে—সব একসঙ্গে আলাদা রেখে দিয়েছে। জোটন রান্না করার জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে দিয়েছে। গোবরে লেপে দিলেই সব পবিত্র হয়ে যায়। চারপাশটা গোবর ছড়া দিয়ে জায়গাটাকে একজন হিন্দু বিধবা রমণীর উপযুক্ত করে তুলেছে। অথচ পেটে মালতীর জাতক। গাছপালায় বাতাসের শনশন শব্দ। জোটন নিরামিষাশী। ফকির-সাবের মৃত্যুর পর সে মাছ-মাংস আহার করে না—যেন ফকিরসাবের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মাছ-মাংস বলতে যা কিছু সম্পর্ক বোঝায় তা ছেড়ে দিয়েছে। সে আর আল্লার মাশুল তুলছে না ভেবে বলে না, আমারে একটা পুরান-তুরান যা হয় ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু মালতীর এমন কাঁচা বয়স, রঞ্জিতের এমন সুন্দর মুখ, এক ঘরে এক বিছানায় ওদের বড় মানাবে।

মালতী তার মেমান। রঞ্জিতও। ওর দিদি ক্ষুধার দিনে কত যত্ন নিয়ে খাইয়েছে তাকে। সে-সব মনে পড়লে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে। সে রঞ্জিতকে বলল, সিঁড়িতে নিয়া রাইখা দ্যান। মালতী কাপড় ছোঁবে না। জোটন একটা গাছে বিচিত্র নীল রংয়ের ফুল দেখবার সময় মালতীকে ছুঁয়ে দিয়েছে। স্নান না করা পর্যন্ত মালতী পবিত্র হবে না। সে মালতীকে বড় এক সরোবরে নিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে সব বড়-বড় ঝাউ গাছ। গাছের নিচে কত সব বিচিত্র ঘাস ফুল। কাঠবিড়াল গণ্ডায়-গণ্ডায়। সাদা রংয়ের ডাহুক। ডাহুকের ছানা।

রঞ্জিত হাতে কাপড় নিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেল। জোটন আগে, মালতী মাঝে এবং রঞ্জিত পিছনে। ওরা টিলা থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এই পথেই জোটন সারাদিন মরা ডাল, শুকনো পাতা, গাছের ফল কুড়িয়ে বেড়ায়—সে এই পথেই নেমে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের আলো পাতার ফাঁকে ওদের মুখে পড়ছে। চারপাশে সব গাছ, বড় গরান গাছ, গজারি গাছ, রসুনগোটার গাছ—নিচে তিন মানুষ, এবং ক্রমে শুধু নেমে যাওয়া। যেন জোটন এবং রঞ্জিত এক বন্দিনী বনদেবীকে খোলা মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দূরের বিল থেকে খাল থেকে হাঁস উড়ে আসে এ-সময়। কচ্ছপেরা উঠে আসে ডিম পাড়ার জন্য। এখানে সব জীবজন্তু, এমন কি কচ্ছপেরা জোটনকে ভয় পায় না। জোটন তাদের মতো জলে-জঙ্গলে থাকে বলে বনের জীব হয়ে গেছে। রঞ্জিত যেতে-যেতে দেখল দুটো কচ্ছপ খালের পাড়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে। রোদ পোহাচ্ছে কি ডিম পাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা রঞ্জিত এবং মালতীকে দেখেই জলে নেমে গেল। জোটন একা থাকলে কচ্ছপেরা ভয় পেত না। সে ব্যাপারটা

বুঝাতে পেরেই কেমন ডেকে যাবার মতো বলে গেল, আমার মেমান। ডর নাই জীবেরা। তোমার কেউ অনিষ্ট করব না।

অদ্ভুত এক ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। আস্তানাসাবের দরগা এটা। মাঝে একটা জল-টুঙি। সেখানে আস্তানাসাবের কবর। পাশে ফকিরসাবের দরগা। এক সময় আস্তানাসাবের দৌলতে এই সরোবর কাটা হয়েছিল এবং কথিত আছে, এই সরোবরের ঠিক মাঝখানে জলের ওপর বসে আস্তানাসাব নামাজ পড়তেন, খড়ম পায়ে জল পার হয়ে যেতেন, মৃত্যুর আগে তিনি মন্ত্রবলে জল-টুঙি বানিয়ে গেলেন একটা। সেই জলে-স্থলে তাকে সমাহিত করা হল। জোটন আস্তানাসাবের দরগায় ঢুকেই বলল, পীর সাহেব আপনের সরোবরে স্নান করাইতে আনছি মালতীরে। অরে মুক্ত কইরা দ্যান।

সিঁড়িতে নেমে রঞ্জিত মালতীর কাপড় রেখে দিল।

জোটন বলল, ডুব দেওয়নের সময় মনের বাসনা আস্তানাসাবের কাছে কইস।

মালতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে গেল।

—তর যা বাসনা, তুই যদি সরোবরে ডুব দিয়া কস তবে বিফলে যাইব না।

জলে দাঁড়িয়ে মালতী কি ভাবছে! জলটা নাড়ছে। কি কাচের মতো স্বচ্ছ জল! দুটো-একটা মাছ ওর পায়ের কাছে এসে ঘোরাফেরা করছে। সে জলের নিচে এই সব ছোট ছোট মৌরলা মাছ দেখে—জীবন এভাবে কতদিন আর, এমন ভাবছিল।

জোটন দেখল মালতী জলে ডুব দিচ্ছে না। সে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে। জোটন কাছে এসে বলল, আপনে যান। মালতীর স্নান হইলে আমি নিয়া যামু।

রঞ্জিত হেঁটে হেঁটে চলে এল। এই কবরভূমিতেই জব্বর মালতীর পিছনে ছুটে ছিল। আর সেই লোকগুলি। মালতী বলেছিল, সে তিন চারজনের মুখ এক সঙ্গে পায়ের কাছে ভেসে উঠতে দেখেছিল। তিন চারজন মিলে সারারাত ওর ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। এই যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে, সে কে! তার অবস্থা এখন কি! এ কোন দেবতার আশীর্বাদ! জন্ম নিলে তার পরিচয় কি হবে! জোটন কি এই অশুভ দেবতার হাত থেকে মালতীকে রক্ষা করতে পারবে না! সে তো পীরানি। জড়ি-বুটি আছে তার। সে কি বলবে, জোটন, এখন তুমি দ্যাখো কি করতে পার। একে তুমি রক্ষা কর।

তখন জলে ডুব দিল মালতী। যেন একটা মাছরাঙা পাখি জলের নিচে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল। কত বড় সরোবর। পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সব গাছপালা। একটা অপরিচিত পাখি বার বার একই স্বরে ডেকে চলেছে। জোটন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মালতী কেবল ডুব দিচ্ছে। জোটন বলল, উইঠা আয় মালতী। তর বাসনার কথা কইতে কিন্তু ভুইলা যাইস না।

জোটনের কথামত ডুব দিয়ে তার বাসনার কথা বলল।—আমারে আস্তানাসাহেব মুক্তি গ্যান। যেন বলার ইচ্ছা—আমাকে আগের মালতী, পবিত্র এবং সুখী মালতী করে দিন। আমি আবার নদীর পাড়ে পাড়ে হাঁটি।

মালতী স্নান করে উঠে এলেই বড় পবিত্র লাগছে মুখ-চোখ। জোটন বলল, কি কইলি!

ছল ছল চোখে মালতী বলল, আমারে মুক্তি দিতে কইছি।

জোটন আর তাকাতে পারছে না মালতীর দিকে। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বোধ হয় জোটন আর মালতীর সঙ্গে কথাও বলতে পারত না। যদি না মালতী হেসে বলত, জুটি, তর একলা ডর করে না?

—না।

মালতীর এই হাসি জোটনকে কেমন সাহসী করে তুলল। বলল, আমার লগে আয়। তর কোন ডর নাই।

—কত বড় বন! আগের বার চোখ খুইলা সব দ্যাখতে পারি নাই।

—এই বনে ঢুইকা গ্যালে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।

ওরা ফিরে এলে রঞ্জিত দেখল মালতী খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এমনকি মালতী ওকে স্নান করে নিতে বলছে। এতটা পথের কষ্ট, স্নান করলেই দূর হয়ে যাবে এমনও বলেছে। মালতী আবার যেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে কতক্ষণ! এই বন, নির্জনতা, এবং জোটনের কাছে সাময়িক আশ্রয় জোটনের অতিথিপরায়ণতা কিছুক্ষণের জন্য ওকে মুগ্ধ করে রেখেছে। পেটে যে একটা আজব জীব বাড়ছে এবং রক্তের অন্তরালে যে জীবটা, অতিকায় নৃশংস এক জীব, মুখ কেবল ব্যাদান করে আছে—সেই মুখ স্মৃতিতে ভাসলেই মালতী আবার অধার্মিক হয়ে যাবে। ভ্রূণ হত্যার জন্য সে নিজের শরীরের ভেতর অন্য একটা শরীর খুঁজে বেড়াবে।

শুধু এই এক ভয় রঞ্জিতের। সে এই যুবতীকে নিয়ে যায় কোথায়! কারণ,

এই অঞ্চল থেকে তার সরে পড়ার একমাত্র পথ নারাণগঞ্জে উঠে যাওয়া। এবং সেখান থেকে রেল অথবা স্টিমারে দূরদেশে সরে পড়া। কিন্তু সে জানে তাকে ধরার জন্য জাল পাতা আছে শহরে-গঞ্জে। ওর সব বয়সের ছবি আছে পুলিশের ঘরে। সে একা থাকলে ভয় পেত না, কিন্তু এই যুবতী মেয়ে—পেটে হাত পড়লেই হিক্কা এবং বমির মতো ভাব, চারিদিকে তখন পাগলের মতো থুথু ছিটাতে থাকে।

রঞ্জিতের ইচ্ছা মালতীর সন্তান নাশের ব্যাপারে একটা পরামর্শ করে জুটির সঙ্গে। মালতী দলাদলা হিং খেয়েছে। আভারানী এনে খাইয়েছে। কিছুই হয় নি। মূল এবং গাছের শেকড়-বাকড় আছে, তা ব্যবহার করা হয় নি। আভারানী সাহস পায় নি এটা দু'কান করতে। নরেন দাস, যত বমি করছে মালতী তত ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছিল। এখন জুটিকে বলার সময় নয়। দু' চারদিন থাকার পর কথাটা সে তুলবে। আপাতত এই এক জোটন যে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আছে। প্রায় সে আত্মসমর্পণের মতোই এসে উঠেছে। এবং জোটনের এই আশ্রমের মতো জায়গায় মালতীর যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়! সে নিজে কথাটা পাড়তে পারছে না। জোটন এই নিয়ে কথা তুললেই সব পরিষ্কার করে খুলে বলতে হবে। তুই কিছুদিন ওকে রাখ জোটন। অন্তত সন্তান প্রসবের দিন ক'টা পর্যন্ত। তারপর আমি ওর আস্তানা ঠিক করে নিয়ে যাব। আর তার আগে যদি গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই। আমি আর মালতী কোনদিকে চলে যাব। ঘর বাঁধব।

রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে জোটন বলল, এত ভাবছেন কি! বলে সে হা হা করে হাসল। বলে সে হাঁড়ি-পাতিল সব বের করে দিল। সবই নূতন। কিছু খাদা পাথর। মেলা থেকে সে কিনেছে। খাদা পাথর সে কোনটা কত দিয়ে কিনেছে, তা এক এক করে বলছে। রঞ্জিত বসে বসে দেখছে সব। ওর শৈশবের কথা মনে পড়ছে। এই জুটি কচ্ছপের ডিম পেলে, হিন্দু গ্রামে উঠে যেত। সে শাকপাতা, যেমন গীমাশাক এবং গন্ধপাদাল, বেতের নরম ডগা কেটে হিন্দু বাড়ি উঠে কচ্ছপের ডিম, শাকপাতা দিয়ে খুদকুঁড়া চেয়ে নিত। ধান ভেনে চিঁড়া কুটে তার আহার সংগ্রহ। ওর স্বামী তালাক দিলেই আবেদালির কাছে চলে আসা। আবেদালির কথা মনে হতেই রঞ্জিত বলল, আবেদালির নয়া বিবি এখন ওকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। যেন জোটন ইচ্ছা করলে এখন আবেদালিকে কাছে এনে রাখতে পারে।

জোটনের মুখ বড় কাতর দেখাল। সে এটা পারে না। সে পীরানি। পীরানির ভাব-ভালবাসা থাকতে নাই। সংসারে তার আপনজন থাকতে নাই। তার আপনজন সকলে।

—এই যে আমরা আইলাম।

—সকলে আমার আপনজন কর্তা। কিন্তু কোন মায়া নাই। অর্থাৎ কোন মায়ায় আর জড়িয়ে পড়তে চায় না জুটি। সে একা। কেবল একা থাকতে চায়। আর আল্লা অথবা নবীদের নামে সে মনের ভিতর ডুবে থাকে। রাত বাড়লেই ছই এর নিচে ঢুকে কালো রঙের আলখেল্লা পরবে ফকিরসাবের। গলায় মালা-তাবিজ ঝোলাবে এবং কোরানের পর পর বয়াত মুখস্থ বলবে মুশকিলাসানের লম্ফের দিকে চোখ রেখে।

রঞ্জিতকে মালতী রান্না করতে দিল না। জোটন ভাজা মুগের ডাল বের করে দিল। গরুর দুধের ঘি। তেল শিশিতে। তেল-ঘিতে দোষ নেই। বাটনা বাটার শীলনোড়া আছে। ওটা জোটন ব্যবহার করে বলে দিল না। কোনরকমে রাতের রান্না আজ সেরে ফেললে কাল জোটন সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। মালতী হলুদ এক টুকরো আস্ত ডালে ফেলে দিল। হলুদ না দিলে রান্নার ত্রুটি থেকে যায়। হলুদ দিতেই হয়। কোথায় এখন বাটা হলুদ পাবে। সে আস্ত হলুদ ফেলে দিল গরম ডালে, মেতি মৌরি তেজপাতা সম্ভারে মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পেঁপে এবং সীম সেদ্ধ। আতপ চালের ফেনা ভাত। বড় কলাপাতা কেটে এনেছিল জোটন। ওরা খেলে পর যা থাকবে, একপাশে আলগা হয়ে খেয়ে নেবে। সে নিজের জন্যও একটা কলাপাতা কেটে রেখেছে।

জোটন খেতে বসে মালতীকে অপলক দেখছিল। জব্বর এই যুবতীকে বিনষ্ট করেছে। মালতী বছরের পর বছর আল্লার মাশুল না তুলে আছে কি করে! অথচ জব্বর জোরজার করে পবিত্র যুবতীকে অশুচি করে দিল। জোটনের নিজেরই কেমন শরীর গোলাচ্ছে। সে জব্বরকে শিশু বয়স থেকে বড় করেছে। জব্বর এই কাজ করেছে! অপরাধের দায়ভাগ জোটনের। সে ভিতরে ভিতরে জব্বরকে কাছে পেলে যেন গলা টিপে ধরত, এমন চোখ-মুখ এখন। মালতী রঞ্জিতকে খাইয়ে আলাদা পাতায় যত্নের সঙ্গে ভাত এবং ডাল বেড়ে দিয়ে দিল জোটনকে। মালতী রঞ্জিতের পাতায় ভাত বেড়ে নিয়েছিল। ওরা আল্‌গা হয়ে একটু দূরে বসে পরস্পর নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে। কিন্তু জোটন

খেতে পারছে না। সে অপলক চুরি করে মালতীকে দেখছে, যেন সেই ঠাকুর-বাড়িতে বসে সে খাচ্ছে। সে খেতে খেতে মালতীর রান্নার খুব তারিফ করল।

রঞ্জিত পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার রাত। লম্ফের আলোতে দুই নারী মূর্তি বনের ভিতর চুপচাপ খাচ্ছে। এক সময় জোটন বলল, মামা-মামীরা কেমন আছে?

—ভাল। বস্তুত সারাদিন পর এই খাওয়া, একটু ঘি, সীমসিদ্ধ, বেগুন সিদ্ধ ভাত এবং মুগের ডাল বেগুন ভাজা অমৃতের সামিল। আর মালতীর এতদিন পর, স্বপ্ন তার সফল হচ্ছে—সে তার প্রিয়জনকে দুটো রান্না করে দিতে পারছে, তার পাতে খেতে পেরেছে. পেটের ভিতর যে এমন একটা দানব দিনে দিনে বাড়ে চন্দ্রকলার মতো, সে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছে না—ঘরে লম্ফ জেলে রেখে এসেছে জোটন—একই ঘরে আজ রঞ্জিত আর মালতী থাকবে। জুটি সেই কবে থেকে প্রায় বলা যায় মালতীর জন্ম থেকে বড় হওয়া, ওর বিয়ের সব সে চোখের ওপর দেখেছে। স্বামীর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর মালতীর ফিরে আসা। সেই শোক-বিহ্বল চেহারা জোটন যেন ইচ্ছা করলে এখনও মনে করতে পারে—তারপর দীর্ঘকাল একা একা মালতী একটা গাছের নিচে সারাদিন বসে থাকল, কেউ এল না হাত ধরে নিয়ে যেতে—নদীর পাড়ে যাবার ইচ্ছা তার বার বার। কিন্তু সে একা। একটা গাছের পাতা কেবল সারা মাসকাল ওর মাথার ওপর ঝরে পড়েছে। গাছের নিচে আজ তার সত্যি একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। মালতী আজ কিছুতেই রঞ্জিতের দিকে তাকাতে পারছে না। কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উচ্ছিষ্ট এক যুবতী সে। সোনার মতো মানুষ, তার কাছে দেবতার শামিল রঞ্জিত এখন ঘরে চুপচাপ হোগলার ওপর শুয়ে আছে। সে গেলে মানুষটা আলো নিভিয়ে দেবে। অথচ রঞ্জিতকে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। সে তার কাছে কিছুতেই যেতে সাহস পাচ্ছে না। তার হাত-পা কাঁপছে।

এখানে থাকলে মালতী ঘরের ভিতর ঢুকবে না। জোটন তাড়াতাড়ি ছইএর নিচে ঢুকে যাবার জন্য কবর পার হয়ে চলে গেল। পিছনের দিকে তাকাল না। কেবল মনে মনে হাসল। মালতী, তুই মনে করিস আমি কিছু বুঝি না। তুই বিধবা বইলা তর বুঝি কিছু ইচ্ছা থাকতে নাই। মাচানে উঠেই জোটনের মনে হল সরোবরে আজ দুটো মাছ সারাদিন জলের নিচে ঘুরে

বেড়াবে। সরোবরে দীর্ঘদিন একটা মাছ ছিল। জোয়ারের জলে আর একটা মাছ ভেসে আসতেই সরোবরের মাছটা লাফিয়ে জলে ভেসে উঠল। ওর কাছে সরোবরের মাছ মালতী। কি যে দুঃখ মেয়েমানুষের স্বামী বিহনে জীবনযাপন—সে মর্মে মর্মে তা জেনেছে। জোটন মুশকিলাসানের আলোতে এবার নিজের মুখ দেখল। সে কেমন তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর মতো হয়ে যাচ্ছে। এক সুদূর আলোর রেখা ক্রমে বড় হতে হতে গাছপালা ভেদ করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। মালতী ক্ষুধায় পীড়িত। একটা মানুষ তাকে আজ কি যে আনন্দ দিচ্ছে! আহা, বসুন্ধরার মতো, অথবা আবাদের মতো, ফসলের জমি খালি ফেলে রাখতে নেই। আজ, আজ রাতে দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আকাশ ভেঙে ঢল নামবে। ওর আরামে চোখ বুজে এল। সে ফকিরসাবের উদ্দেশে মাথা নিচু করে এবার বসে থাকল। মনে হচ্ছে সামনে সেই সোনালী বালির চর—আকাশ ভেঙে ঢল নেমেছে। একটা সাদা বিনষ্ট পবিত্র ফুল সেই জলে চুপি চুপি ভিজছে। সে এবার মনে মনে উচ্চারণ করল, খুদা মেহেরবান। সে বিনষ্ট হতে দেবে না ফুলকে। আবার, আবার পরিচ্ছন্ন করে তুলবে সব। মালতীর পেটে জারজ সন্তান। জারজ সন্তান পেটে রেখে সে কিছুতেই এমন নিষ্পাপ যুবতীকে বিনষ্ট হতে দেবে না। হাতে তার কত তন্ত্রমন্ত্র আছে, গাছ-গাছালি আছে—সে কি না পারে! কারণ তার নিজের মানুষ ফকিরসাব। মরার আগে সব তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁক ওকে দিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সারাজীবন ধরে যে মাশুল আল্লাকে দেবার কথা, আজ সে তাই বিনষ্ট করতে যাচ্ছে। সে তার লাখোটিয়া চিজ সেই মাশুলের ওপর ছুঁড়ে দেবে। তবু মালতী আবার পবিত্র হোক, সুখী হোক। সে মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে চুপিচুপি উঠে এল। এসে দেখল মালতী তখনও একা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জিত পরিশ্রান্ত। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে ডাকল, এই মালতী। মালতী কাছে গেলে বলল, ভিতরে যাস নাই?

—না।

—পানি আন।

মালতী ভেবে পেল না, কেন এসব! সে তবু জোটনের এমন রুদ্র চোখ-মুখ এবং পীরানি পীরানি ভাবটা দেখে কেমন আবিষ্টের মতো এক ঘড়া জল নিয়ে এল। জোটন বলল, নে, হাত পাত। পানিতে গিলা খা। জলটা খেয়ে ফেললে বলল, যা ভিতরে। আর ডর নাই। বলেই সে যেমন এসেছিল সহসা

তেমনি ছইয়ের ভিতর লম্ফ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সে ছইয়ের নিচে বসে এই মুহূর্তে হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে করতালি বাজাল। সে গোনা করল অর্থাৎ মহাপাপ, ভ্রূণ হত্যার মহাপাপ। সে জোরে জোরে হাঁকল, ফকিরসাব, কবরে জাইগা আছেন? সে চিৎকার করে বলল, কন খুদা আমারে বেহেস্তে পাঠাইব না দোজকে পাঠাইব? কন ত কি হইব জবাবডা! বলেই সে লক্ষ লক্ষ শয়তানকে কলা দেখিয়ে কাঁথা-বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। তারপর খুব ফিসফিস গলায়, যেন ফকিরসাব কবরে নেই, মাচানে এসে তার পাশে শুয়েছে—জোটন এমনভাবে নালিশ দিচ্ছে—কি, জবাবডা দ্যান! কিন্তু ফকিরসাব কিছু বলছেন না। পাশ ফিরে শুলেন। এবার তার যেন বলার ইচ্ছা, এই ভ্রূণ হত্যার জন্য দায়ী কে! আমি, মালতী, আপনি, না জব্বর। কেডা হইব কন। সে দু'হাতে বুক চাপড়ে মাচানে পড়ে তার এই মহাপাপের জন্য বনের ভিতর কাঁদতে থাকল।

গাছ-পাতার ফাঁকে সূর্যের আলো—ছায়া ছায়া ভাব, হেমন্তের শীত। সোনা চিঠি হাতে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শীত এসে যাচ্ছে বলে সকাল সকাল দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা অমলা লিখেছে। নতুবা কে তাকে চিঠি দেবে! অমলার কথা মনে হলেই সে নীল রঙের আবছা আলো, পুরানো পাঁচিলের গন্ধ টের পায়। সেই ভাঙা কুঠির অন্ধকার এবং অমলার মুখ, চোখ, শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তার ভিতরে কেমন একটা অনুভূতি হয়—মনে হয় জ্বর আসছে কম্প দিয়ে। শীত করছে। সে, ভিতরে ভিতরে মায়ের মুখ মনে ভাবলে শক্ত হয়ে যায়। সে একটা পাপ কাজ করে এসেছে। মা বুঝি টের পেয়েছে। মুড়াপাড়া থেকে ফিরে আসার পরই মা ভালভাবে কথা বলে না। মা যেমন ওর সামান্য অসুখ করলে মুখ দেখে টের পায় তেমনি টের পেয়ে গেছে। গায়ের গন্ধ শুঁকে মা টের পেয়েছে বুঝি সোনা আর পবিত্র নেই। সোনা মুড়াপাড়া থেকে নতুন একটা অসুখ বাঁধিয়ে এসেছে।

সোনা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। আজ সে খেলতে গেল না পর্যন্ত। প্রতাপচন্দ্রের মাঠে ভলিবল নেমেছে। সোনা খেলে না। বোধহয় আগামীবার সে খেলতে পাবে। এখনও সে মাঠ থেকে বল কুড়িয়ে দেয়। এবং খেলা হলে ওর মতো সমবয়সীরা মাঠে নেমে কিছুক্ষণ বল নিয়ে লাফালাফি করে—সেই লাফালাফির নেশাও কম নয় তার। বিকেল হলেই সে ছুটবে। কিন্তু এই চিঠি সারাক্ষণ তাকে নানাভাবে বিব্রত করছে। সে কোথাও এমন জায়গা খুঁজছে যেখানে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়লে কেউ টের পাবে না। চিঠি পড়ে অমলাকে লিখবে, তুমি আমাকে আর চিঠি দিও না। কারণ সোনার ভয়, অমলা হয়তো লিখবে, তুই কাউকে বলে দিস নি তো! এসব কথা কিন্তু কেউ কখনও বলে দেয় না। বলতে নেই। শুধু আমি তুই জানি। আবার যখন তুই মুড়াপাড়া আসবি তখন আমরা আরও বড় হয়ে যাব। কি মজা হবে না তখন!

সোনা শোবার ঘরে ঢুকে আয়নায় মুখ দেখল। সে মাঝে মাঝে আজকাল চুরি করে আয়নায় মুখ দেখছে। আয়না ধরলেই মা জেঠিমা রাগ করেন। জেঠিমা বলবেন, কি এত মুখ দেখা! এমন ছোট বয়সে এত বেশি

মুখ দেখতে নেই। কখনও বলবেন, আয়না ধরবে না সোনা। তোমাদের জ্বালায় কিছু রাখা যায় না। সব ভেঙে ফেলছ। সে চুরি করে মুখ দেখছে। মা বিছানায় শুয়ে আছেন। সোনা টেবিলের ধারে কি খুটখুট করছে। ধনবৌ মাথা তুলে দেখল, সোনা নিবিষ্ট মনে আয়নাটা মুখের কাছে এনে দেখছে। নানাভাবে দেখছে মুখ। চোখ বড় করে, কপাল টান টান করে দেখছে। টেবিল থেকে চুরি করে মার স্নো মাখছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়ে সে বিছানার দিকে তাকাতেই মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেল। ভারি লজ্জা পেল সোনা। ধনবৌ ছেলের সাজগোজ দেখে কাছে ডাকল। সোনা কাছে গেলে চুলটা আরও ভাল করে পাট করে দিল। স্নো যেখানে মুখের সঙ্গে মিশে যায় নি, সেটা সুন্দর নরম হাতে মিলিয়ে দিল। বড়বৌ এসেছে দেশলাই নিতে। এসে দেখল মা ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। এই অবেলায় সোনা কোথায় যাবে! অন্যদিন এ-সময়ে খেলার জন্য ওকে কিছুতেই আটকে রাখা যায় না বাড়িতে। সে জামা-কাপড় না পাল্টেই ছুটতে থাকে মাঠের দিকে। তাকে ধরে রাখা যায় না। গোপাটে নেমে গেলে বড়বৌ ডাকবে, সোনা, লক্ষ্মী আমার, কাপড়-জামা পরে যা। ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হবে। কে কার কথা শোনে! সে ছুটে মাঠে নেমে যায়।

অথচ আজ সোনা খেলার মাঠে যায় নি। বড়বৌ সামান্য বিস্মিত হল। বড়বৌ বলল, কিরে সোনা, মাঠে খেলতে গেলি না।

সোনা মাকে, জেঠিমাকে দেখল। সে কিছু বলল না। সন্তর্পণে পকেটে হাত রাখল। নীল রঙের খামটা ওর পকেটে। সে তাড়াতাড়ি এ-ঘর থেকে পালাতে চায়। সোনা বের হবার মুখে শুনল, জেঠিমা বলছেন, সোনা তোমার মাকে এক গ্লাস জল এনে দাও।

সোনার ভারি রাগ হল মায়ের ওপর। মা ফাঁক পেলেই শুয়ে থাকে। শরীর খারাপ। কি যে অসুখ মায়ের সে বুঝতে পারে না। অন্য অনেকদিন সে চুরি করে আয়নায় মুখ দেখলে মা তাকে ডাকে, তাকে সাজিয়ে দিতে চায়। সে কাছে যায় না। গেলেই ধরা পড়ে যাবে এমন ভয়ে সে দূরে থাকে। নিজেই মাথার চুলটা ঠিক করে নেয়। মা রোগা হয়ে যাচ্ছে। ভাত খেতে চায় না। তবু জেঠিমা সাধ্য সাধনা করে দু'মুঠো খাওয়ান। মার সেই খাবার দৃশ্য দেখলে সোনার কান্না পায়। খেতে খেতে কোনদিন মা মালসাতে বমি করে ফেলেন। মার জন্য সে যে কি করবে ভেবে পায় না। অথচ আজ এই জল আনতে বলায়

মার ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। কি দরকার ছিল বলা জেঠিমাকে, জল দিতে। জেঠিমার হাতে গুচ্ছের কাজ। সেজন্য তিনি সোনাকে জল দিতে বলেছেন। সে বের হয়ে যাবার পর কেন মা জল চাইল না। সে এখন পাল বাড়ির পুকুর পাড়ে চলে যাবে। পাড়ে পাড়ে কত লটকন গাছ। ছোট ছোট গাছের ডাল বেয়ে অনায়াসে সে ওপরে উঠে যেতে পারে। ডালপালা শাখার কোন ঝোপের ভিতর বসে সে যদি চিঠিটা পড়ে তবে কেউ টের পাবে না।

তার এখন তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। সাঁজ নামলে সে দূরে কোথাও যেতে পারে না। ভয় হয়। আর এসময় মা বলছেন, জল দিতে। সে জল না দিয়েই চলে যেত, কিন্তু ঈশম বলেছে, জল না দিলে পরের জন্মে মাছরাঙা হয়। সে কিছুতেই মাছরাঙা হতে চায় না। সে মাছরাঙা হবার ভয়ে মার শিয়রে জল এনে রেখে দিল।

দরজার মুখে এলেই ধনবৌ আবার ডাকল, সোনা।

সোনা পিছন ফিরে তাকালে, ধনবৌ বলল, কোনখানে যাবি?

সোনা বলল, কোনখানে যামু না।

—আমার শিয়রে একটু বসবি? আমারে বাতাস দিবি? শরীরটা আমার ভাল না।

একথা শুনে সোনার রাগ বাড়ছে। সে সব সময়ই মায়ের অনুগত। মেজদার মতো সে নয়। মেজদাকে মা কোন কিছু করতে বললেই পারবে না বলে চলে যায়। মা নিরীহ স্বভাবের। মেজদা শুধু ছোট কাকাকে ভয় পায়। সোনাই মার ফুট-ফরমাস খেটে দেয়। অথচ আজ তার এমন কথায় রাগে কান্না পাচ্ছে।

এবং এখন কত কথা মা তাকে বলছে। সে শিয়রে বসে থাকলে মায়ের খুব ভাল লাগবে। মার একা-একা ভাল লাগছে না। বাবাকে মা রাতে চিঠি লিখেছে, এই নিয়ে তিনটে চিঠি সে ডাকবাক্সে ফেলে এসেছে—অথচ বাবা একটা চিঠির জবাব দেয় নি। আর কিছুক্ষণ সে মার কাছে বসে থাকলেই বলবে, হাঁ রে, সোনা পিয়ন আইছিল?

বাবার চিঠি এলেই মা সেদিন খুব সুন্দর সাজে। ভাল কাপড় পরে। লাল বড় সিঁদুরের টিপ কপালে এবং চুলে নানারকম ক্লিপ এঁটে মা বাবার জন্য কেবল কি প্রার্থনা করে।

সে আর মায়ের কাছে গেল না। কাছে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তার পকেটে একটা নীল খামের চিঠি। সে বলল, আমার ভাল লাগে না। সে মায়ের সঙ্গে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলল, আমি মাঠে খেলতে যামু মা।

ধনবৌ এবার উঠে বসল। মুখে খুব অরুচি। কিছু খেতে ভাল লাগে না। আমলকি খেলে জিভের স্বাদ ফিরে আসতে পারে। সে বলল, সোনা, আমার লাইগা আমলকি আনবি? মাঝি বাড়ির আমলকি গাছে খুব আমলকি হইছে।

মাঝিদের বাড়িতে আমলকী গাছ। সোনা গাছটা চেনে। সময়ে অসময়ে গাছটায় ফল ধরে থাকে। সে ভাবল মার জন্য দুটো আমলকী চেয়ে নেবে। সে কতদিন আমলকী ফল খেয়ে জল খেয়েছে। আমলকী খেয়ে জল খেলেই মিষ্টি মিষ্টি লাগে জলটা। সে একটা আমলকী খেত, এবং এক ঢোক জল খেত।

এতক্ষণ মা তাকে এই অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে চেয়েছিল, যেমন অমলা তাকে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—তখন চরাচরে কদম ফুল ফোটে, কদম ফুল ফুটলেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়—কেমন যেন একটা নতুন অসুখের জন্ম হচ্ছে শরীরে। ভালবাসা, ভাল লাগার—কি একটা ব্যাপার, সে বুঝতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না নিজেকে—কেবল ঘুরে ঘুরে লটকনের ডালে ডালে সে একটা নিরিবিলি ঝোপ পেতেই চিত হয়ে ডালের ওপর শুয়ে পড়ল। কেউ গাছের নিচে হাঁটছে। সে তাড়াতাড়ি আবার চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল। তারপর মুখ নিচু করে দেখল, না, কেউ নেই। গাছের মাথায় একটা সাদা বক এসে বসেছে। সে যে এক বালক, অমলার চিঠি নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে, বকটা টের পায় নি। সূর্যের মুখে মুখ করে বসে আছে। কুক কুক শব্দ করছে।

সোনা খুব যত্নের সঙ্গে নীল খামটা খুলল। জায়গাটা যথার্থই নির্জন। গ্রামের এটা উত্তর দিক। শীতকালে ভাল রোদ পায় না। পালেদের বাঁশ-বাগান সামনে। পশ্চিমে ছোট একটা নালা। এখনও জল আছে নালাতে। কত রকমের সব হেলঞ্চা কলমি লতা এবং জল সেঁচি আর কত সব ফড়িং, বিচিত্র বর্ণের। হেমন্তের পরেই শীত আসবে। শীত শেষ হলে নালাতে জল থাকবে না। তখন সোনা এবং সকলে খাল পার হয়ে খেলার মাঠে যাবে।

এই খালটায় জল আছে বলে এখনও এ-পথে মানুষ নেমে আসে না। সোনা

পাড়ে পাড়ে সব লটকন গাছ দেখতে পাচ্ছে। গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে আসবে—কতবার শীতের শেষে ওরা গাছের নিচে বসে থাকত নীলকণ্ঠ পাখি দেখবে বলে। কিন্তু পাখি এল না। সূর্যাস্ত হল। কোন কোনদিন সাদা জ্যোৎস্নায় সে ঈশমের হাত ধরে বের হত। জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকতেন। তালি বাজাতেন হাতে। সোনা ভেবেছিল তিনি তালি বাজালেই ওরা কোন দূরের সরোবর থেকে অথবা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। সে নীল খামটা খুলতে গিয়ে একটা পাখির চোখ দেখতে পেল। পাখিটা কি তবে সেই তার নীলকণ্ঠ। যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, জ্যাঠামশাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখে তার কি দুঃখ! সে দেখল পাখিটা সেই পাখি, সাদা পাখি—একটা সাদা বক, সে কক্ কক্ করছে। সে খামটা এবার ছিঁড়ে ফেলল।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। বেশ বড় বড় করে লিখেছে অমলা। ধরে ধরে লিখেছে সোনাকে। সোনার মুখে এসে শেষ হেমন্তের রোদ পড়ছে পাতার ফাঁকে। মা তার শুয়ে আছে ঘরে। মার অসুখ। সে নিতান্ত বালক সে চিঠিটা পড়ার জন্য এমন একটা গোপন জায়গায় চলে এসেছে।

সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—প্রিয় সোনা। আশা করি তুই ভাল আছিস। কেমন বড় মানুষের মতো লিখেছে। অমলা, কলকাতার মেয়ে। তার তো সবই তাড়াতাড়ি জানার কথা। সে সুন্দর ভাষায় চিঠি তো লিখবেই। প্রিয় সোনা এই কথা ভাবতেই ওর মুখটা লজ্জায় মহিমময় হয়ে গেল। তোর জন্য আমাদের খুব মন খারাপ। কিছু ভাল লাগে না রে। বড় একঘেয়ে। সকালে স্কুল, বিকেলে দু'জনে আমরা টেবিল-টেনিস খেলি আর রাতে মাস্টারমশাই আসেন। এখানে আসার পর থেকেই বাবা আমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। তারপর কিছু শব্দ অমলা কেটে দিয়েছে। এমনভাবে কেটেছে যে সোনা বুঝতে পারল না। আমরা আসার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি নি। সারা রাস্তায় আমরা কেঁদেছি। কারণ আগামী শীতে শুনেছি মা মরে যাবে। খবর পেয়ে আমরা চলে এসেছি। এসে দেখি মা একটা সাদা বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের চিনতে পারছেন না। সাদা চাদরের নিচে মায়ের নীল রঙের পা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি কমলা মায়ের সুন্দর পা ছুঁতেই দক্ষিণের দিকের জানালাটা খুলে গেল। দেখি সেখানে কারা একটা সিলভার ওক লাগিয়ে রেখেছে।

কি যে হয়েছে মায়ের!

চিঠিটা পড়তে পড়তে সোনার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে

মা এখন আমার জানালায় শুয়ে থাকেন। দক্ষিণের জানালাটা কারা খুলে রাখে। দুর্গের রেমপার্ট জানালা থেকে স্পষ্ট। মনে হয় বাবা আর মাকে কোন কষ্ট দিতে চান না। মা যা ভালবাসেন বাবা তাই করছেন। সারাদিন শুয়ে থাকেন। ওঠার ক্ষমতা নেই। গভীর রাতে রেকর্ডে বাবা কিছু ধর্মীয় সঙ্গীত বাজান, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি। কোন কোন দিন ঘুম ভেঙে গেলে এসব টের পাই।

সকালবেলাতে বাবা মাকে পাঁজাকোলে বারান্দায় নিয়ে আসেন। নার্সরা তখন কাছে থাকে না। রেলিঙের ধারে বসে থাকেন তিনি। যতক্ষণ না সিলভার ওকে রোদ এসে নামবে ততক্ষণ বসে থাকবেন। তারপর গাছটায় রোদ এসে পড়লেই বাবা আবার মাকে খাটে শুইয়ে দেন। যেদিন কলকাতার আকাশে রোদ থাকে না—সেদিন মায়ের যে কি কষ্ট! মার মুখ দেখলেই মনে হয় তখন, আজ অথবা কাল তিনি মরে যাবেন।

কেন যে এমন হল সোনা!

মা মরে গেলে আমরা কার কাছে থাকব সোনা!

আমরা স্কুল থেকে এসে কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসি। বৃন্দাবনী মাকে সাজিয়ে দেয় রোজ। মা এখন আর বব চুল কাটে না। চুল বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় চুলে মাকে যে কি সুন্দর লাগে! মা গাউন পরে না। সাদা রঙের সিল্ক, লাল পাড়ের সিল্ক, মা সিল্ক পরে সারাদিন বড় খাটে প্রার্থনার ভঙ্গিতে শুয়ে থাকেন। আমরা ডাকি, মা মা! মা আমাদের সঙ্গে কোন কথা বলেন না। বুঝি শুধু দুর্গের রেমপার্টে একটা নীল রঙের পাখি খোঁজেন।

মা বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেন। কিট্‌সের কবিতা মায়ের খুব পছন্দ। আমরা পায়ের কাছে বসে ছুটির দিনে কিট্‌সের কবিতা আবৃত্তি করি। মা শুনতে পান কিনা জানি না। বাবা বলেছেন, তোমাদের মা যা ভালবাসবেন তাই করবে। আমরা মাকে আবৃত্তি করে কবিতা শোনাই। সেই সব স্তবক যা মার খুব পছন্দ। বাবা সময়ে সময়ে যাই বলেন, সবই মাকে কেন্দ্র করে, বাবার সঙ্গে কার্ডিফের কোন পার্কে মার প্রথম দেখা, বাবা মাকে কি বলতেন, বাবা ভারতবর্ষের মানুষ, বাঙালী, কলকাতায় তাদের বাড়ি, বাবা প্রথমে মাকে এমনই বলেছিলেন। বাবা বলেন, জানি না তোর মা কেন কলকাতা বললেই বিষণ্ণ চোখে তাকাত।

যেমন সেই স্তবক—

I made a garland for her head And bracelets too and fragrant zone ; She looked at me as she did love, And made sweet moan.

কখনও কখনও বাবা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গলা মেলান।

সোনা কবিতার কোন অর্থ ধরতে পারল না। সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ল। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রবল। সে দু'বার পড়তে না পড়তেই কবিতাটা মুখস্থ করে ফেলল।

চিঠিটা পড়তে পড়তে এক সময় সোনা নিজেই কেমন একটা গাছ হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার মা বিছানায়। মার অসুখ। কিছু খায় না। আগামী শীতে কি তার মাও মরে যাবে! অমলা আমি কি করি! আমিও কি মার পায়ের কাছে বসে থাকব। সেই অন্ধকার ঘরে, অমলার সাপ্টে ধরা, ওর ভাল লাগা, এবং নদীর কাছে গিয়েও পাপ কাজের কথা বলতে না পারা, বলতে পারলে নদী, অর্থাৎ এই জল, জল মানেই জীবন, জীবন হচ্ছে প্রাচুর্যের দেবতা, দেবতা তাকে পাপ থেকে মুক্তি দিতেন। অসময়ে তুমি সোনা নদীর পাড়ে হেঁটে গেলে। বন্যা এসে তোমাকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। সোনা নিচে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। সে বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে তার বড় কষ্ট হচ্ছে। মার পায়ের কাছে বসে কমলা অমলা আবৃত্তি করছে। সে কি করবে! মা বলেছে তাকে আমলকী ফল নিতে। সে খালপাড় এসে প্যান্ট খুলে ফেলল। তারপর খাল পার হয়ে ফের প্যান্ট পরে ছুটল। ঘুরে গেলে রাত হয়ে যাবে। সে খাল পার হয়ে সোজা ঢুকে গেল মাঝিবাড়ি। কিছু আমলকী ফল নিয়ে গাঁয়ের পথে বাড়ির দিকে ছুটে চলল।

সে ঘরে ঢুকেই মায়ের শিয়রে দাঁড়াল। সে খুব হাঁপাচ্ছে। যেন ভয় পেয়ে সে ঘরে ঢুকেছে। অথবা কেউ ওকে পেছনে তাড়া করেছে।

ধনবৌ ছেলের কাতর মুখ দেখে বলল, তর কি হইছে?

সোনা কিছু বলল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে খেলার মাঠে। জানালাগুলো খোলা। দিনের আলো মরে আসছে। সে ফলগুলো মায়ের হাতে দিল।

ধনবৌ ভেবেছিল, সোনা আমলকী না বলে এনেছে। মাঝিদের কেউ ওকে কিছু বলতে পারে। সে তাই ছুটে পালিয়ে এসেছে। সে তাই বলল, অরা কিছু কইছে তরে!

—না মা। কিছু কয় নাই।

কিন্তু অদ্ভুত, সোনা কিছুতেই ফল হাতে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে না। মায়ের শিয়রে চুপচাপ বসে রয়েছে। ধনবৌ অপলক ছেলের মুখ দেখছে। সোনা যেন কিছু বললেই কেঁদে ফেলবে। ধনবৌ মাথায় হাত রেখে বলল, কি রে, তুই কথা কস না ক্যান। কথা না কইলে আমার ভাল লাগে!

এ-সময় বড়বৌ এসে ঘরে ঢুকল। সোনা শিয়রে বসে রয়েছে। চুপচাপ। মাথা গোঁজ করে হাঁটুর ভিতর মুখ রেখে বসে রয়েছে।

—ধন, তুমি রাতে কি খাবে?

—কিছু খামু না বড়দি।

—কিছু না খেলে চলবে কেন। তোমার জন্য পাতলা করে কই মাছের ঝোল করে দিচ্ছি। দুটো হেলঞ্চার ডগা ফেলে দেব। খেতে ভাল লাগবে। শিয়রে লেবুর পাতা রেখে গেলাম। ওক উঠলেই পাতা শুঁকবে। তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সোনা, তুমি খেলতে গেলে না?

সোনা এবারেও জবাব দিল না। সে মাথা গুঁজে একগুঁয়ে বালকের মতো বসে থাকল।

বড়বৌ ধনবৌকে বলল, ওর হয়েছে কি!

—কি কই কন। চুপচুপ বইসা আছে। কথা কইলে জবাব দেয় না।

—তুই ওকে বকেছিস?

—না দিদি।

—তবে ও এমন শক্ত হয়ে বসে আছে কেন?

—জানি না।

—সোনা এস। বলে বড়বৌ ওকে টেনে তুলতে চাইল। কিন্তু সে মায়ের শিয়র থেকে কিছুতেই উঠল না।

বড়বৌ বলল, ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে গেছে! তাতে কি হল! ওরা কিছু করতে পারবে না, আবার চলে আসবে।

কিন্তু সোনা একইভাবে বসে থাকল।

বড়বৌ ভাবল, তবে কি রঞ্জিত নেই বলে! সে বলল, তোর মামাকে ধরে সাধ্য কার। ধরা পড়লে তো ওর ফাঁসি হবে। বলতেই বুকটা কেঁপে উঠল বড়বৌর।

এবং সোনার প্রতি বড়বৌ আরও কোমল হয়ে গেল। চল বাইরে। দেখ তো তোর জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছে। খুঁজে আনতে পারিস কিনা।

সোনার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে উঠল না।

বড়বৌ কেমন বিরক্ত গলায় বলল, কি হয়েছে সোনা, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে!

সোনা বলল, না।

—তবে এভাবে বসে আছ কেন! খেলতে যাও নি কেন! শরীর খারাপ?

সোনা ফের নির্বাক। এই অসময়ে সোনা ঘরের ভিতর মায়ের শিয়রে চুপচাপ বসে রয়েছে। এভাবে বসে থাকা ভাল না। এবার বড়বৌ বলল, ছাখ তো সোনা তোর ঈশম দাদা তরমুজের খেত থেকে উঠে এসেছে কিনা!

কিছুতেই কিছু সে শুনল না। সে যেমন মায়ের শিয়রে বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। মার কপালে ওর হাত। কি ঠাণ্ডা মার কপাল, শরীর! মা তার নিশিদিন বমি করে কেন! মাঝে মাঝে সে দেখেছে বমি করতে করতে মার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে কোন কোনদিন শিয়রে দাঁড়িয়ে মাকে বাতাস করেছে। বড় জেঠিমা দুধ গরম করে দিয়েছেন। দুধ খেয়েই মা হড় হড় করে সব ফের তুলে দিয়েছে। একবার গোপাল ডাক্তার এসেছিল। মায়ের অসুখ দেখে জেঠিমাকে হাসতে হাসতে কি বলে গেছে। তখন মনে হয়েছিল তার, চুরি করে ডাক্তারের সাইকেল পানচার করে দেবে। সোনাকে এমন শক্ত থাকতে দেখে ধনবৌ পর্যন্ত উঠে বসেছে। মা তার সব টের পায়। মা বলল, আমার কিছু হয় নাই সোনা। এই যেই না বলা, সোনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—আমলকী ফল খাইলেই ভাল হইয়া উঠমু।

বড়বৌ এবার হাসতে হাসতে বলল, সোনাবাবুর সে জন্য কান্না। হ্যাঁ রে তোর মার কিছু হয় নি! তোর এবার দেখবি বোন হবে একটা। বোকা। বলে সোনাকে জোরজার করে চৌকি থেকে তুলে আনল। বোকা কোথাকার। তা তুমি বলবে তো ধন। সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সেজন্য তুই মার কাছে বসে আছিস! আয়। বড়বৌ সোনাকে বাইরে নিয়ে গেল। সে জেঠিমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টলটল করছে।

—বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঈশম এতক্ষণে চলে এসেছে। সে বলল, তাই নাকি। এর লাইগ্যা কান্দন।

কি যেন এক পুলক শরীরে। আনন্দে সোনার ভিতরটা সহসা আকাশের নিচে খেলা করে বেড়াতে চাইল। সে ঈশমের কথায় ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

ঈশমও ছুটে গেল সোনার পিছনে। সে এসে ওকে নদীর চরে আবিষ্কার করল। কিছু খড়কুটো পাতার দরকার ছইয়ের নিচে। সে হাঁটতে হাঁটতে ছইয়ের দিকে গেল। সোনাকর্তাকে কিছু বলল না। ছোট্ট বাবুটি এখন নদীর চরে ঘাসের ওপর বসে আছে। আনমনা নদী জল আকাশ দেখছে।

শীত পড়তে পড়তেই চন্দ্রনাথ চলে এল বাড়িতে। ভূপেন্দ্রনাথ আসবে মাঘ মাসের সতেরো তারিখ। কারণ সেই তারিখে শচীন্দ্রনাথ ছাড়া পাচ্ছে। কোর্ট-কাছারি অথবা কি করে কি যে হয়েছিল সোনা জানে না। ছোটকাকা ফিরে আসছেন। ছোটকাকা ছাড়া পাচ্ছে এটাই একটা এখন সুখবর। ওরা শীতের মাঠে রোদে পিঠ দিয়ে জোরে জোরে পড়ছিল।

এই শীতকালটা পড়ার চাপ কম। নতুন বই, নতুন চাদরের মতো, গায়ে দিলেই কি রকম একটা গন্ধ যেন, সোনা নতুন বই পড়তে পড়তে নাকের কাছে এনে গন্ধটা শোঁকে। নতুন বই এলেই শীতের ভোরে রোদে পিঠ দিয়ে গাছের নিচে পড়তে বসে ওরা। অর্জুন গাছের নিচে বড় একটা শতরঞ্চ পেতে দিয়ে যায় ঈশম। সকাল হলেই রোদ এসে নামে গাছটার নিচে। খুব ঘন পাতা বলে গাছের নিচে তেমন শিশির পড়ে না। ওরা সকালে মাস্টারমশাইকে ঘিরে পড়তে বসে। তখন ঠাকুমা ডালায় করে গরম মুড়ি তেলে মেখে রোদে পাঠিয়ে দেন। গাছের নিচে নরেন দাসের পেঁয়াজ খেত। লালটু কোন কোন দিন চুপি চুপি পেঁয়াজকলি তুলে আনে। মাস্টারমশাই যেন জানতে না পারে সে এমনভাবে যায়। কোনদিন পলটু যায় মাঠে। শিশিরে পা ভিজে যায়। সে খেত থেকে ধনেপাতা তুলে আনে। পেঁয়াজকলির কুচি, ধনেপাতার কুচি তেলেমাখা মুড়ি, কাঁচালঙ্কা, হুসহাস ঝালের শব্দ আর পিঠে শীতের রোদ্দুর—সামনে নতুন বই, নতুন ছবি এসব মিলে সোনার এক ঐশ্বর্যভরা জগৎ। তিন-জন তখন জোরে জোরে পড়ে। পড়ে না কাঁসর-ঘণ্টা বাজায় বোঝা দায়। কারণ অনেক দূর থেকে মনে হয় শীতের ভোরে কয়েকটা মোরগ লড়াই করছে।

সেই শীতের সকালে চন্দ্রনাথ বাপের পায়ের কাছে বসেছিল। সে বাপের পা টিপে দিচ্ছে। শীত এলেই বুড়ো মানুষটার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। কফের টানে এ-সময় তিনি খুব কষ্ট পান। হাত-পা-মাথা সব গরম কাপড়ে ঢাকা থাকে। ফ্লানেলের লম্বা টুকরো দিয়ে বুকে-পিঠে যেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কাছে এলেই কেমন কর্পূরের গন্ধ এবং কফের গন্ধ। গলায় গরম উলের মাফলার, পায়ে গরম মোজা এবং মাথায় ফেটি বাঁধা। শ্বাসকষ্ট এত প্রবল যে জানালায় শীতের

রোদ, গাছে কামরাঙা ফুল, ফুলে মধু, মধু খেতে এসেছে পাখিরা—সে-সব কিছুই টের পাচ্ছেন না। লেপ-কম্বলে শরীর ঢেকেও শীত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। পৃথিবীর সর্বত্র বুঝি তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবীর শেষ উত্তাপ শেষ সুখ বুঝি কেউ হরণ করে নিচ্ছে। নতুবা সারা রাত তিনি শীতে এত কষ্ট পাবেন কেন। সারা রাত উত্তাপের জন্য আর্তনাদ করবেন কেন! খাটের নিচে পাতিলে তুষের আগুন—সারা রাত তুষের আগুন জালিয়ে রেখেছে বড় বৌ। তবু মানুষটা উত্তাপ পায় নি। হাত-পা কি যে ঠাণ্ডা! সূর্য কি তবে পলাতক বালকের মতো সৌরজগতের অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। পৃথিবীকে সে সামান্য উত্তাপটুকু পর্যন্ত দিতে পারছে না! কবে একবার সূর্যোদয় দেখবেন বলে বের হয়েছিলেন আর বের হতে পারেন নি। এখন যে একবার বলবেন, অথবা তার বলার ইচ্ছা, পৃথিবীতে কি আর সূর্যোদয় হবে না! আমাকে তোমরা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সূর্যোদয় দেখাবে না! আমি কি সত্যি এভাবে ঠাণ্ডায় মরে যাব? তিনি বলতে পারছেন না। বললেই যেন তাঁর সন্তানেরা পায়ের কাছে এসে বসবে, যেমন এখন বসে রয়েছে চন্দ্রনাথ, বলবে, সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে আর কি লাভ। এবারে চন্দ্রায়নটা তবে করে ফেলি। এবং এ সময়েই তিনি শুনতে পেলেন তাঁর তিন নাতি জোরে জোরে পড়ে চলেছে। নতুন বই এলেই ওরা এভাবে পড়ে। কঠিন যা কিছু শব্দ আছে ঘুরেফিরে বার বার পড়ে। পড়ে বুঝি জানায়, এই যে আমরা বালকেরা আছি, আমরা কত কিছু শিখে ফেলেছি, আমরা পৃথিবীর কত খবর এনে দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা কিছু জানো না। আর নতুন বই পুরোনো হলেই শরীরের মতো জরাজীর্ণ অবস্থা। —আর কতকাল পৃথিবীর জায়গা আপনি আটকে রাখবেন। এবার চন্দ্রায়নটা করে ফেলি। তারপর বলহরি হরিবোল বলে আপনাকে আমরা নিজ হাতে আপনি যে গাছ রোপণ করেছেন তার নিচে দাহ করি। আর কতকাল! শতবর্ষ পার হতে আর বাকি কি!

ফলে মহেন্দ্রনাথ গলার কাছে যে কাশিটা উঠে আসছে তা আটকে রেখেছেন। তিনি কিছুতেই ধরা পড়বেন না, ভাল নেই তিনি, ভীষণ কাশি, শরীর দুর্বল, হাত-পা ঠাণ্ডা। যেন তাঁর যথার্থই কোন কষ্টবোধ নেই। পায়ের কাছে ছেলে তাঁর বসে আছে। তিনি কত সবল দেখানোর জন্যই যেন লেপের ভিতর থেকে শীর্ণ হাতটা বের করার চেষ্টা করলেন। হাওয়ার ওপর তুলিয়ে

দেখাতে চাইলেন, তিনি কত সবল আছেন, সুস্থ আছেন। চন্দ্রায়নের সময় তাঁর এখনও হয় নি।

চন্দ্রনাথ বাপের এসব বোঝে। মনে মনে স্নেহে হাসল। কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। চন্দ্রনাথ হাতটা আবার লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আমি চন্দ্রনাথ বাবা।

—তুমি যে চন্দ্রনাথ, তা বুঝি আমি টের পাই নাই মনে কর?

একেবারে বালক হয়ে গেছেন তিনি। পাছে চন্দ্রনাথ চন্দ্রায়নের কথা বলে, ভয়ে এমন বলছেন মানুষটা। সে এবার বলল, সোনা, লালটু, পলটুর উপনয়ন দিতে চাই। মাঘ-ফাল্গুনে দিন আছে।

—তা ভাল। বলেই যে কাশিটা এতক্ষণ গলার কাছে আটকে ছিল সেটা মুখে তুলে আনলেন। তারপর কোত করে গিলে ফেললেন কফটা। চন্দ্রায়ন করতে বলবে এই ভয়ে তিনি শরীর শক্ত করে রেখেছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু ছেলে যখন বলছে উপনয়নের কথা তখন একবার উঠে বসা যায় কিনা চেষ্টা করা যাক।

—আমারে চন্দ একটু ধর। উইঠা বসতে পারি কিনা ভাখি।

চন্দ্রনাথ বলল, বারান্দার রোদ নামুক, আপনেরে নিয়া যামু বারান্দায়।

বুড়ো মানুষটা এবার যথার্থই প্রাণ ফিরে পেলেন হাতে। হাসি হাসি মুখে বললেন, ধনবৌমার দিকে লক্ষ্য রাইখ। সন্তানাদি পেটে। সন্তানাদি কথাটা বললেন এই জন্য যে, পৃথিবীতে এই যে একটা জগৎ মা জননীরা গর্ভের ভিতর সৃষ্টি করে রাখে, সেই জগৎ সম্পর্কে এখন তার শিশুর মতো পুলক অথবা কৌতূহল, ক্রমে ছোট হতে হতে একেবারে অণুর মতো হয়ে যাওয়া, এবং সেই সৃষ্টির আঁধারে প্রবেশ করা, প্রবেশ করার আগে অন্ধকারের ভয়। একবার প্রবেশ করে গেলে ভয় থাকে না। সেই জগৎ, যেখানে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বিচরণ করবেন। অন্তহীন নীহারিকাপুঞ্জে তার অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে নক্ষত্রের মতো আকাশের গায়ে জ্বলতে থাকবে। তারপর তিনি শিশিরপাতের মতো কোন ঝিনুকের অন্ধকারে টুপ করে একদা ঝরে পড়বেন পৃথিবীর মাটিতে। তার জন্ম হবে আবার। আবার সেই শৈশবের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে এই বৃক্ষের নিচে। সেই আদি অন্তহীন আঁধারের প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার না করে পারলেন না। প্রায় যেন গৌরবে বহুবচনের মতো। সুতরাং তিনি সন্তান না বলে সন্তানাদি কথাটা ব্যবহার করলেন।

চন্দ্রনাথ বসে বসে বাবার মুখ দেখল। বাবার সেই মহিমান্বিত চেহারার সাদৃশ্য এই মানুষের মুখে কোথাও খুঁজে পেল না। কতকাল থেকে তিনি এই বিছানায় কালাতিপাত করছেন। এবং এই কালাতিপাতের সময় শরীর ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে। এত হাল্‌কা যে চন্দ্রনাথ কত অল্প আয়াসে তাঁকে একটা ডলপুতুলের মতো পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দার যেখানে রোদ এসে নেমেছে সেখানে দু'পাশে বালিশ দিয়ে এক ছোট্ট পুতুলের মতো বসিয়ে দিল। বসতে পারেন না, তবু দুহাত সামনে বিছিয়ে যেমন শিশুদের ছবি তোলা হয় তেমনি তাঁকে চারপাশের বালিশে রেখে দেওয়া হল। দাঁত নেই। চোখ অন্ধ। এক বীর্যবান মানুষ এই সংসারে শতবর্ষের আয়ুতে আবার সেই আঁধারে ভ্রূণের মতো প্রবেশ করবেন। ক্রমে ভ্রূণ থেকে কীটে এবং তারপর সেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে পৃথিবীর শস্যভরা মাঠে নতুন আলোক বর্ষিত হবে। তখন সাদা জ্যোৎস্নায় উপনয়নের বালক সন্ন্যাসীরা মাথা নেড়া করে নদীর জলে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতের অঞ্জলিতে নদীর জল পূর্বপুরুষকে জলদান করবে। বাপের তৃষ্ণার্ত মুখ দেখে চন্দ্রনাথের এমনই মনে হল।

আবার সেই বাদ্য বাজছিল। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজছে। জল ভরতে গেছে মেয়েরা। মাথা নেড়া করছে সোনা লালটু পলটু। উৎসবের বাড়ি, কত আত্মীয়-কুটুম। তাদের সন্তান-সন্ততি। সব ছেলেপুলে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বুঝি তামাশা দেখছে—এমন এক ভাব চোখেমুখে। ওরা কেউ কেউ ঠাট্টা-তামাশা করছে। সোনা শক্ত হয়ে বসে আছে, সে মাথা নেড়া করবে না। তাদের তাড়িয়ে না দিলে মাথা নেড়া করবে না। যারা হাসছিল তাদের তাড়িয়ে দিল ঈশম। এবার মাথা পেতে দিয়েছে সোনা। ঈশমের এমন খুচরো কাজ কত। ঈশম অবসর পাচ্ছে না। সে এইমাত্র নয়াপাড়া থেকে ঘুরে এসেছে। আবার তাকে বিশ্বাস পাড়া যেতে হবে। যজ্ঞবার আগে সে গাছে উঠে আমের শুকনো ডাল, বেলপাতা, পল্লব, হোমের জন্য পেড়ে রেখে দিয়েছে।

রান্নাঘরের পাশে কাল সারাদিন খেটে ঈশম একটা নতুন চালাঘর তুলেছে। বড় বড় ডেগ, হাঁড়ি, পেতলের বালতি, মালসা চালার নিচে। ফুলকপি, বাঁধা-কপি কাটছে হারান পালের বৌ। বড় মাছ কাটছে দীনবন্ধুর দুই বউ। বড় ডেগে গরম হচ্ছে দুধ। মুসলমান পাড়া থেকে সবাই দুধ দিয়ে যাচ্ছে। শচি সব দুধ মপে রাখছে।

এই উৎসবের বাড়িতে একমাত্র ধনবৌ কিছু করতে পারছে না। পেটে তার সন্তান। সন্তান পেটে নিয়ে শুভকর্মে হাত দিতে নেই। ধনবৌ চুপচাপ বারান্দার এক কোণে বসে শুধু পানের খিলি বানাচ্ছে। সুতরাং বড়বৌর ওপরই চাপ বেশি। বড়বৌ এই শীতেও ঘেমে গেছে। খুব ভোরে উঠে স্নান করেছে বড়বৌ। লালপেড়ে গরদ পরেছে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য সকালের জলখাবার ঠিক করতে হয়েছে। দক্ষিণের ঘরে ফরাস পাতা হয়েছে। পঞ্চমীঘাট এবং ভাটপাড়া থেকে সব বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। ওঁরা ধর্মাধর্মের তর্কে ডুবে আছেন। ওঁদের জন্য বাটিতে গরম দুধ এবং মুড়ি, দুটো সন্দেশ জলখাবার গেছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য ঘাটের পাড়ে জমি সাফ করে দেওয়া হয়েছে। সারা সকাল পণ্ডিতেরা সেখানে বসে আহ্নিক করেছেন।

যারা দূর থেকে আসছে তাদের চন্দ্রনাথ দেখাশোনা করছে। ভূপেন্দ্রনাথ

টাকা-পয়সা এবং কোথায় কি প্রয়োজন হবে সারাক্ষণ তাই দেখাশোনা করছে। কেউ বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না। শশিভূষণ বৈঠকখানায় পণ্ডিতদের সঙ্গে ন্যায়নীতির গল্পে ডুবে গেছে।

মাঝে মাঝে ভূপেন্দ্রনাথ কাজ ফেলে পণ্ডিতপ্রবরদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। কোন ত্রুটি যদি হয়ে থাকে—মার্জনা ভিক্ষার মতো মুখ—আমাদের এই পরিবারে আপনাদের আগমন বড় পুণ্যের শামিল। এভাবে সে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। আপনাদের আগমনেই এই উৎসব সফল, এমন নিবেদন করছে।

শচীন্দ্রনাথ তখন শশীবালার কাছে গিয়ে বলল, মা, তোমার আর কি লাগবে?

শশীবালা আলু, বাঁধাকপি, পটল, কুমড়ো এসবের ভিতর ডুবে ছিল। যত লোক খাবে তার হিসাব মতো সব বের করে দিচ্ছে শশীবালা। মায়ের পাশে শচীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সুলতানসাদির বাজারে আর বারদীর হাট থেকে মাছ এসেছে। তবু মাছে কম হবে কিনা, একবার দেখা দরকার। পুকুরে জাল ফেলা যদি দরকার হয়, সেজন্য গগনা জেলে জাল নিয়ে পুকুরপাড়ে বসে রয়েছে। সে গগনা জেলেকে কিছু মাছ তুলে দিতে বলল।

তা ছাড়া শচির পকেটে ঘড়ি, সে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে কখন বিদ্ধিতে বসার সময়, ক'টার ভিতর চলন দেওয়া হবে এবং হোম ক'টা থেকে ক'টার ভিতর শেষ করা দরকার, আহ্নিক হোমের আগে না পরে করাতে হবে এসব সে হিসাব রাখছে বলে ভূপেন্দ্রনাথ আর তাকে অন্য কোন কাজের ভার দেয় নি।

সে তাড়াতাড়ি পুকুরপাড়ে এসে দেখল এখনও কামানো হয় নি। সোনার মাথার অর্ধেকটা চাঁচা হয়েছে। সাদা ধবধবে মাথা, পিঠে চুল, শীতে সোনা কাঁপছে। সোনা জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে। কান ফুটো করা হবে এই বলে সকলে ওকে ভয় দেখাচ্ছে। সে ভয়ে শক্ত হয়ে আছে। ভূপেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, না কান তোমার কেউ ফুটা করব না। ভূপেন্দ্রনাথ সোনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। যারা পুকুরে জল ভরতে গেছে ওরা ফিরে এলেই স্নান। হলুদ রাঙানো কাপড় পরেছে সোনা। হলুদ মেখে স্নান করানো হবে। স্নানের শেষে ওরা নতুন কাপড় পরবে। সোনার মাথা নেড়া হলে ভূপেন্দ্রনাথ মাথায় হাত রাখলো। ছোট্ট একটা শিখা তালুতে। সোনা দু'বার শিখাতে হাত রেখে কেমন পুলক বোধ করল।

এবং তখন গান হচ্ছিল পুকুরপাড়ে। যারা জল ভরতে গেছে তারা গান গাইছে। সুর ধরে অদ্ভুত সব গান। সোনা, লালটু, পলটুর মঙ্গল কামনায় গান গাইছে। এরা এই সংসারে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে ওরা এক ধর্ম প্রচারে ডুবে যাবে—সে ধর্মের নাম হিন্দু ধর্ম। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ভিতর তুমি মহাভারতের মানুষ, এমন যেন এক বোধ গড়ে দিতে চাইছে তারা।

সোনা যেমন একবার নদীর পাড়ে ল্যাণ্ডোতে ফিরতে ফিরতে ভেবেছিল—সে ক্রমে উপকথার নায়ক হয়ে যাচ্ছে, আজও সে তেমনি নায়ক, তার জন্য কি সব জাঁকজমক। এদিনে ফতিমা কাছে নেই। থাকলে কি না সে খুশি হত।

কিন্তু নতুন কাপড় পরার সময়ই যত গণ্ডগোল দেখা গেল। পিসীমার ছোট ননদের মেয়ে দীপালি দাঁড়িয়ে আছে। শীতের রোদে ওদের স্নান করানো হচ্ছে। সেই ঢাক-ঢোল বাজছে, সানাই বাজছে। শুভকার্যে উলুধ্বনি, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওড়ার মতো যেন ওদের মাথায় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সোনা কাপড় পরে না, পরার অভ্যাস নেই। সে কাপড় পাল্টাবার সময় দেখল ভিড়ের ভিতর থেকে দীপালি তাকিয়ে আছে। ওর ভীষণ লজ্জা লাগছিল। সে দু'হাতে দশহাতি কাপড় কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, ছাড়তে পারছে না, ছেড়ে দিলেই সে নেংটো হয়ে যাবে। নেংটো হয়ে গেলে দীপালি ওর সব দেখে ফেলবে—সে শীতের ভিতর হিহি করে কাঁপছে অথচ কাপড় ছাড়ছে না। সোনা এ-সময় তার জেঠিমাকে খুঁজছিল।

পিসীমা বললেন, কাপড়টা ছাড়।

সে কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মেসোমশাই এসে বললেন, কি সোনা! শীতে কষ্ট পাইতাছ ক্যান? কাপড় ছাড়।

সোনা আবার তাকাল।

লালটু বলল, কী আদর আমার! জেঠিমা না আইলে তিনি কাপড় ছাড়তে পারতাছে না।

তখন এল বড়বৌ।—কি হয়েছে সোনা। এখনও তুমি ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছ।

সোনা এবার চারপাশের ছোট ছোট মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বড়বৌ বলল, ও তার জন্য। আয়। বলে সে সোনার হাঁটুর কাছে পা

ভাঁজ করে বসল।—আমার কত কাজ সোনা! তোরা যদি এমন করিস তবে কাজের বাড়িতে চলে?

সোনা কিছু শুনছে না মতো হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বড়বৌ শুকনো কাপড়টা আলগা করে আড়াল দিয়ে ভিজা কাপড়টা খুলে ফেলল। তারপর সুন্দর করে ধুতিটা কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিল। কাপড়টা সোনার মাপ মতো নয়। বড় বলে কিছুটা জবুথবু অবস্থা সোনার। সে নিজের কাপড়ে প্যাঁচ খেয়ে কখনও উল্টে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য বড়বৌ কাপড়ের কোঁচাটা কোমরে গুঁজে দিল।

এবার ওরা গিয়ে বসল আচার্যদেবের সামনে। আচার্যের আসনে বসে আছেন পণ্ডিত সূর্যকান্ত। তিনি দীর্ঘ এক পুরুষ এবং সূর্যের মতোই আজ তাঁর দীপ্ত চোখ-মুখ।

তিনি যেন তিন বালককে, কঠোর চোখে দেখতে থাকলেন। হে বালকেরা, তোমাদের পুনর্জীবন হচ্ছে, এমন চোখে তাদের দেখছেন। বালকদের মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছেন, এত বেলা হয়ে গেছে, এখনও সামান্য জলটুকু পর্যন্ত ওরা খেতে পায় নি। ফলে চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। এবার তিনি হাঁক দিয়ে জানতে চাইলেন, ষোড়শ মাতৃকার কতদূর, বিদ্ধি শেষ হল কিনা, না হলে এই ফাঁকে চন্দনের কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

পাল্কিতে বসার সময় সোনা দেখল দীপালি ওর ও-পাশে চুপচাপ উঠে বসে আছে। সোনার গলায় পদ্মফুলের মালা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হরিণের চামড়ার ওপর সে বসে রয়েছে। আর কত রকমের ফুল ছড়ানো সেই হরিণের চামড়ার ওপর। তিনটে পাল্কি যাত্রা করবে। ওরা যতদূর প্রতিদিন গ্রাম-মাঠ ভেঙে নদীর পাড়ে যায় ততদূর এই পাল্কিতে ওরা চলে যাবে।

সোনা দীপালিকে পছন্দ করে না। কারণ দীপালি ঢাকা শহরে থাকে। সে বড় বড় কথা বলে সোনাকে অযথা ছোট করতে চায়। আজ সে দেখছে সেই দীপালি সব সময় কাছে কাছে থাকতে চাইছে।

সোনা প্রায় ভিতরে বরের বেশে বসেছিল। সে দীপালির দিকে তাকাচ্ছে না। পাল্কিটা দুলছে। ওর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু চলতে থাকলে ওর আর ভয় ভয় করল না। পিছনে বাজনা বাজছে। সানাই বাজছে। প্রতিবেশীরা সকলে নেমে এসেছে। ওরা নরেন দাসের মাঠে এসে নামল।

তারপর গোপাটে। গোপাট ধরে অশ্বত্থ তলা পার হবার সময় মনে হল পাল্কি টোডারবাগের কাছে এসে গেছে।

দীপালি বলল, সোনা, আমারে ছাখ।

—কি ছাখমু।

—আমি কি সুন্দর ফ্রক পরেছি।

সোনা বলল, বাজে ফ্রক।

দীপালি বলল, তুই কিছু জানিস না।

সোনা উঁকি দিল এবার। আর তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল মঞ্জুর মিঞার বড় বটগাছের নিচে অনেকের সঙ্গে ফতিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে পাল্কিতে সোনাবাবু যায় দেখতে এসেছে।

বড় দ্রুত যাচ্ছিল বেহারা। নিমেষে মুখটা মিলিয়ে গেল। সোনা উঁকি দিয়েও মুখটাকে ভিড়ের ভিতর আর খুঁজে পেল না।

পাল্কিটা পাশ কাটিয়ে গেল ফতিমার। কি সব সুমিষ্ট ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেল। ভুর-ভুর গন্ধে চারপাশটা ভরে গেল। সোনাবাবু ফুলের ওপর বসে আছে। প্রায় যেন রাজপুত্রের শামিল। পাশে কে একটি মেয়ে। ফতিমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসছে। সে সোনাবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলতে পারল না।

সামুর মা সাদা পাথরের রেকাবিতে তিনটে তাঁতের চাদর এবং তিনটে আতাফল রেখে দিয়েছে। ওর কোমরের ব্যথা আবার বাড়ছে। মাঝে কিছুদিন বিছানায় পড়েছিল, এখন সে লাঠি ঠুকে চলাফেরা করতে পারছে। ঠাকুরবাড়িতে উপনয়ন। সে বাবুরহাট থেকে তিনটে তাঁতের চাদর আনিয়ে রেখেছে। এ-সব নিয়ে তার যাবার কথা। কিন্তু এই শরীরে সে যাবে কি করে। সামুর স্ত্রী অলিজানও চিন্তিত। এই উপনয়নে অথবা বিবাহে, যখন যা কিছু হয়, সামুর বাপ বেঁচে থাকতে কিছু না কিছু দিয়েছে। এবং সামুর বিয়েতেও বুড়ো কর্তা নারাণগঞ্জ থেকে পাছা পেড়ে শাড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন শুভ দিনে, এমন উৎসবের সময়ে ফতিমা সোনাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারল না—ওর ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল খুব। সে দেখল, মা একটা সাদা পাথরের রেকাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকে দিয়ে যে পাঠায়! ফতিমা বলল, মা, আমি নিয়া যামু। দাও আমারে।

তখন সেই পণ্ডিত সূর্যকান্ত, আচার্যদেব, ঋজু চেহারা যে মানুষের, বয়সের

ভার যাকে এতটুকু অথর্ব করতে পারে নি, নামাবলী গায়ে, সাদা গরদ পরনে এবং শিখাতে জবাফুল বাঁধা—তিনি জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন এবং সাধুভাষায় নানারকম নির্দেশাদি সহ: মানবক ক্ষৌরাদিকার্য সমাপনপূর্বক স্নান করিয়া গৈরিকাদিরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবে। পৈতা উপলেপনাদি মোক্ষণ সংস্কারান্ত কর্ম করিয়া যথাবিধি চরু শ্রপন করিবেন, যথা—সদাসম্পতয়ে জুষ্টং গৃহ্নামি, এই বলে তিনি আঃ আঃ আঃ যেন অগ্নেহ স্বাহা। আঃ আঃ অনেক দূরে দূরে এই উচ্চারণ প্রতিনিয়ত বাতাসে ধ্বনি তুলে গ্রামে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। ফতিমা গ্রাম থেকে নেমে গোপাটে পড়তেই সেই গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। যেন কোন মহাঋষি হাজার হাজার হোমের কাষ্ঠ জেলে কলসী কলসী ঘি ঢেলে দিচ্ছেন। তেমন এক পূত পবিত্র ধ্বনি ফতিমাকে আপ্লুত করছে। সে মাথায় রেকাবি আর কোমরে আতাফল নিয়ে ছুটতে থাকল।

অতঃপর আচার্যদেব বলিলেন, সমস্ত কার্য সমাপনপূর্বক একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বনভাবে কুমারের বাম স্কন্ধে দিবে। মন্ত্রক যথা—ওঁ যজ্ঞোপবিতং পরমং পবিত্রং······এমন সব মন্ত্র সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সোনা আচার্যদেবের সামনে এবার অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলল, ওং উপনয়স্ব মাং যুষ্মং পাদাঃ।

আচার্যদেব বলিলেন, ওং উপনেষ্যামি ভবন্তম। অনন্তর আচার্য অগ্নির উত্তরদেশে গমনপূর্বক চারিটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। তাহার পর আচার্যদেব অগ্নির দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইলেন।

সোনার সম্মুখে যজ্ঞের কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইতেছিল। উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় তাহার মুখমণ্ডল কম্পমান হইতেছে। মনে হইতেছে মুখমণ্ডলে কে তাহার দেবীগর্জন লেপন করিয়াছে। মাথায় কিরণ পড়িতেছে। সেই আদিত্যের কিরণ। ক্ষুধায় কাতর। মুখমণ্ডল বড় বিষন্ন। ক্লান্ত। সে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেছে না। তার ঊরু কাঁপিতেছে। সে তবু আচার্যদেবের সম্মুখভাগে করপুটে দণ্ডায়মান। যজ্ঞ হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। চক্ষু জ্বালা করিতেছে। ওর চক্ষুদ্বয় সহসা লাল অগ্নিবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং সুবাসিত হোমের যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে মন্ত্রের মতো এক অপরিচিত বোধ ও বুদ্ধি উদয় হইবার সময়ে ভিতরে কি যেন গুড়ু গুড়ু করিয়া বাজিতেছে। সোনার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমি তৃষ্ণার্ত, জলপান নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত।

আচার্যদেব হাসিলেন। হাসিতে বিষাদ ফুটিয়া উঠিল। কৃচ্ছ্রসাধন নিমিত্ত এই উপবাস অথবা বলিতে পার সন্ন্যাস জীবনযাপন। তিনি এইবার ধীরে ধীরে ওর অঞ্জলিতে জল সিঞ্চন করিলেন। অতঃপর সেই অঞ্জলিতে স্বীয় অঙুলি মিশ্রিতপূর্বক কহিলেন, বশিষ্ঠ ঋষি স্ত্রিষ্টুপ ছন্দোহগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিস্কেকে বিনিয়োগ। তিনি কুমারকে অভিষেক করিলেন।

অনন্তর আচার্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সূর্য দর্শন করাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, কিং নামাসি?

—শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর দেবশর্ম্মাহং ভোঃ!

আচার্যদেবের পুনরায় প্রশ্ন, কস্য ব্রহ্মচার্য্যাসি?

এবার আচার্যদেব খুব আস্তে আস্তে কিছু মন্ত্র পাঠ করিলেন। সে তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না। সে সেই মুখের প্রতি অবলোকনপূর্বক অধোবদনে নিবিষ্ট হইল।

এ-ভাবে সোনা যেন ক্রমে অন্য এক জগতে পৌঁছে যাচ্ছে। যা সে এতদিন দেখেছে এবং শুনেছে—এই জগৎ সম্পূর্ণ তার থেকে আলাদা। সে সকালে উঠে যে সোনা ছিল, আর সে তা নেই। সে অন্য সোনা, সে পূত এবং পবিত্র। চারপাশে তার পবিত্রতার বর্ম পরানো হচ্ছে। মন্ত্র সে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছে না, না পারলে চুপচাপ আচার্যদেবের দিকে তাকিয়ে থাকছে। কারণ আচার্যদেব এত দ্রুত মন্ত্র পাঠ করছিলেন যে সোনার পক্ষে অনুসরণ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সে শুধু তখন মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকছে। হরিণের চামড়ার ওপর সে বসেছিল। সামনে কোষাকুষি, গঙ্গাজল, হাতে কুশের আংটি এবং বিচিত্র বর্ণের সব ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, তিল, তুলসী।

আচার্যদেব কহিলেন, আচমন কর। সোনা আচমন করিল।

আচার্যদেব কহিলেন, কুশের দ্বারা মাথায় জল সিঞ্চন কর।

সে মাথায় জল সিঞ্চন করিল।

মন্ত্র পাঠের পর আচার্যদেব সন্ধ্যা পাঠের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন।

তিনি কহিলেন, একদা সন্দেহ নামক মহাবলিষ্ঠ ত্রিংশতকোটি রাক্ষস মিলিত হইয়া সূর্যের সংহারার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্বক সন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ সেই সন্ধ্যোপসনাকৃত বজ্রভূত জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যের বিনাশ সাধন করেন। এইজন্য

বিপ্রগণ নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। তারপরই তিনি কহিলেন, ওম্ শন্ন আপো ধন্বন্যা শমন সন্তু নৃপা…মরুদেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণ করুক, অনুপদেশজাত জল আমাদিগের' মঙ্গলপ্রদ হউক, সাগরবারি আমাদিগের শ্রেয় বিধান করুক, এবং কূপজল আমাদিগের শুভদায়ী হউক। স্বেদাক্ত ব্যক্তি তরুমূলে থাকিয়া যে প্রকার স্বেদ হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নাত ব্যক্তি যেইরূপ শারীরিক মল হইতে মুক্ত হয়, জল আমাকে তদ্রূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক। হে জলসকল, তোমরা পরম সুখপ্রদ; অতএব ইহকালে আমাদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দাও এবং পরলোকে সুদর্শন পরম ব্রহ্মের সহিত আমাদিগের সম্মিলন করাইয়া দাও। স্নেহময়ী জননী যেমন স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণবিধান করেন, হে জলসমূহ, তোমরাও তদ্রূপ ইহলোকে আমাদিগকে কল্যাণময় রসের দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। হে বারিসমূহ, তোমরা যে রস দ্বারা জগতের তৃপ্তি করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমাদিগের যেন তৃপ্তি জন্মে। তোমরা আমাদিগের সেই রসভোগের অধিকার প্রদান কর।

মন্ত্রপাঠের দ্বারা সোনার মুখমণ্ডল নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছিল। মাথার ওপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র। সম্মুখে সেই হোমাগ্নি। এবং কোষাকুষিতে তাহার হাত। আর আচার্যদেব যেন নিরন্তর তাঁহার নাভি হইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সোনা এইসব ক্রিয়া-কর্মাদির ভিতর এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে প্রোথিত হইতেছিল।

তিনি কহিলেন, মহাপ্রলয় কালে কেবল ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তখন সমস্ত অন্ধকারাবৃত ছিল। তদনন্তর সৃষ্টির প্রাক্কালে অদৃষ্টবশে সলিলপূরিত সাগর সমুৎপন্ন হইল। সেই সাগর-বারি হইতে জগৎ-সৃষ্টিকারী বিধাতা সঞ্জাত হইলেন। সেই বিধাতাই দিবা প্রকাশক সূর্য ও নিশা প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ সেই সময় হইতে দিবারাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সোনা ভাবছিল, তাহার নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মা। দেবশর্মা ভোঃ। ভোঃ শব্দ উচ্চারণে তাহার মনে হাসির উদ্রেক হইল। সে তাড়াতাড়ি হাসি নিবারণার্থে কহিল, সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষি…

আচার্যদেব কহিলেন, 'সূর্যাশ্চ মা' মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। প্রকৃতি ইহার ছন্দ। জল—দেবতা, এবং আচমন কর্মে ইহার প্রয়োগ হয়।… সূর্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি অমরগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞজনিত পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি

রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি দিবা তাহা বিনষ্ট করুন। আমাতে যে পাপ আছে, তৎসমস্ত এই সলিলে সংক্রামিত করিয়া, এই পাপময় সলিল হৃৎপদ্ম মধ্যগত অমৃতজোনি জ্যোতির্ময় সূর্যে সমর্পণ করিলাম। উহা নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক।

সোনা আর পারছে না ওর তেষ্টা পাচ্ছে। সে বোধহয় পড়ে যেত—ফতিমা ঠাকুরঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। সে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সে নাকে নথ পরে নি। পায়ে মল পরে আসে নি। ওর লম্বা ফ্রক ঝলমল করছে এবং ওড়না দিয়ে মাথায় ঘোমটা। সোনা জানে না ওর ঠিক পিছনে এক বালিকা চুপচাপ বসে সোনাবাবুর মন্ত্রপাঠ শুনছে। যত শুনছে তত বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। সে এইসব শব্দ সংস্কৃতশব্দ জানে। সে কোন অর্থ বুঝতে পারছে না। অথচ কেমন এক ভাবগম্ভীর আওয়াজ এই উৎসবকে মহিমামণ্ডিত করছে। বাবু যে দাঁড়াতে পারছে না, পা কাঁপছে; সে শেফালি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে তা টের পাচ্ছিল।

সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন উপবাসে সোনা কাতর। তিনি তাকে এক গ্লাস জল খাবার অনুমতি দিলেন। সে এক নিশ্বাসে জলটুকু খেয়ে ফেলল। ফতিমার মনে হল এবার সোনাবাবু ওর দিকে তাকাবে। সে তিনটে চাদর তিনটে আতাফল এবং তিনটে আমলকী নিয়ে এসেছে। এগুলো সে মটিতে রেখে দিলে, বড়বৌ গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে নিয়ে গেছে। গঙ্গাজল বড় দুর্লভ বস্তু। একঘটি জল এনে সেই জল শিশি করে বাড়ি বাড়ি এবং এক কলসি জলে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথ ওষুধের মতো ব্যবহার। ফতিমা জানে এ-ভাবে না নিলে এই উৎসব ওদের পবিত্র থাকবে না। বড়বৌ ওকে গাছটার নিচে বসতে বলে গেছে। সে বলে না গেলেও বসে থাকত। এত কাছে এসে সে সোনাবাবুর পৈতা হচ্ছে, না দেখে চলে যেতে পারত না। সোনাবাবু কখন ওকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে সেই আশায় অপলক তাকিয়ে আছে।

এবার ওরা পুবের ঘরে ঢুকে যাবে। এই ঘরে ঢুকলে ওরা আর তিনদিন বের হতে পারবে না। চন্দ্র-সূর্য দেখতে পাবে না। এই তিনদিনের অজ্ঞাতবাস সোনা অথবা লালটু পলটুর কাছে প্রায় বনবাসের মতো। ওরা ঘরে ঢুকে গেল। এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফতিমার দিকে সোনাবাবু একবার তাকাল না।

ওরা তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াল। হাতে বিল্বদণ্ড। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি,

গৈরিক রঙের একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়ানো। প্রথমে ধনবৌ এবং বড়বৌ এল ডালা সাজিয়ে। ওরা তিনজনকে তিনটে সোনার আংটি দিল।

সোনা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভবতু ভিক্ষাং দেহি।

ভিক্ষা দিতে গিয়ে সোনার মুখ দেখে ধনবৌ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একেবারে ঋষি বালকের মুখ। যেন কোন অরণ্যের ছোট্ট বিহারে ভিক্ষু বিদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এমন মুখ দেখলেই ধনবৌর ভয় হয়। পাগল মানুষের কথা মনে হয়। বংশের কেউ না কেউ কোন না কোনদিন নিরুদ্দেশে চলে যাবে। সোনার মুখ ঠিক ওর পাগল জ্যাঠামশাইর মতো। সোনা মাকে দেখছে। ধনবৌ ছেলের মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না। যেন এক্ষুনি জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে। লালটুর জন্য ধনবৌর এত কষ্ট হয় না। সে মায়ের পাশে শোয় না। সে আলাদা শোয়! নিজের দায়িত্ব যেন নিজেই নিতে পেরেছে। ধনবৌ সোনাকে ভিক্ষা দিয়েই তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল।

বড়বৌ তখন এক ছোট্ট হাঁড়িতে নানা রকমের মিষ্টি সাজাচ্ছিল। খুব যত্নের সঙ্গে কলাপাতা দিয়ে মুখটা বেঁধে দিয়েছে। ঈশম, এত লোকজন যে পা ফেলতে পারছে না। কখন কাকে ছুঁয়ে দেবে এই ভয়। সে ফতিমাকে নিয়ে এল। বড়বৌ ঈশমের পঙ্গু বিবির জন্য আলাদা একটা বাসনে কটা মিষ্টি তুলে রাখল। ফতিমাকে বলল, এটা নিয়ে যা। তোর নানীকে বলবি, শরীর ভাল হলে যেন একবার আসে। কতদিন দেখি না।

ফতিমা ঘাড় নাড়ল।

—তোর বাবা এসেছে?

ফতিমা বলল, না।

—নিয়ে যেতে পারবি ত? না ঈশম দিয়ে আসবে।

ফতিমা বলল, পারমু।

—ফেলে দিস না কিন্তু।

ঈশম মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে দিল। কিন্তু হাতে নিতে অসুবিধা। ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে এসেই হাঁড়িটা মাথায় তুলে নিল। তারপর যেমন সে গোপাটে নেমে এসেছিল সাদা পাথরের থালাতে তিনটে তাঁতের চাদর নিয়ে, আতাফল নিয়ে, তেমনি সে এখন মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ছুটছে। ছুটছে আর সোনাবাবু তার দিকে তাকাল না ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। সে কতক্ষণ থেকে শেফালি গাছটার নিচে বসেছিল—একবার অন্তত দেখুক সোনাবাবু, সে

এসেছে, সুন্দর ফ্রক পরে সে এসেছে, সে তার সবচেয়ে ভাল ফ্রক গায়ে দিয়ে এসেছে। সে কত কথা বলবে বলে এসেছিল, অথচ সোনাবাবু একবার চোখ তুলে তাকাল না। ফতিমা এখন অভিমানে ফেটে পড়ছে। আর তখন দেখল হাজিসাহেবের সেই খোদাই ষাঁড়টা। টের পেয়েছে ছোট্ট এক বালিকা হাঁড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। ষাঁড় তো এখন আর জীব নেই। ধর্মের ষণ্ড হয়ে গেছে। সে ফতিমাকে দেখেই শিঙ বাগিয়ে ছুটে আসছিল।

ফতিমার প্রাণ তখন উড়ে যাচ্ছে। এক চোখ কানা ষণ্ডটা ওকে দেখে ছুটে আসছে। পাগলের মতো, উন্মত্ত প্রায় ছুটে আসছে। কে কাকে রক্ষা করে—তাবৎ জীবের ওপর রোষ তার। মুখের একটা দিক পুড়ে বীভৎস। চামড়া ঝুলে গেছে। ষণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে হলে যেদিকে চোখটা নেই, সেদিকে লড়াই আরম্ভ করতে হয়। মেয়েটা হা হা করে চীৎকার করতে করতে ছুটছে। লেজ তুলে ধর্মের ষণ্ড ছুটছে। পাগল মানুষ অশ্বত্থের ডালে বসে মজা দেখছেন। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। এই দুপুরে সহসা এই চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না কেউ। সামনে শীতের মাঠ। মেয়েটা কিছুতেই মিষ্টির হাঁড়িটা ফেলে দিচ্ছে না। প্রাণপণ সে চেষ্টা করছে গ্রামে উঠে যাবার। কিন্তু পেছনে তাকাতেই সে আর নড়তে পারল না। ষণ্ডটা ক্ষেপা ঝড়ের মতো ওকে ফালা ফালা করে দেবে। ফতিমা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

আর কি এক জাদুর মায়া, পাগল মানুষ যেন সব জানেন, বোঝেন, তিনি সেই গাছের ডালে বসে বুঝে-শুনে কোন ফ্রন্ট থেকে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই চালানো যায়, এই ভাবতেই মনে হল, গাছের ডাল নিচু—অনেকদূর পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা জমিতে চলে গেছে। সে ডালে বসে হাত বাড়ালেই মেয়েটাকে তুলে নিতে পারবে। এক চোখ কানা জীব টের পাবে না কোথায় গেল সামুর মেয়েটা। ক্ষেপা ঝড়ের মতো ষণ্ডটা যেই না এসে পড়ল তিনি হাতে আলগোছে যেমন এক দৈত্য ছোট্ট পুতুল তুলে নেয়, তেমনি তুলে নিয়ে ডালে বসিয়ে দিলেন ফতিমাকে আর হা হা করে হাসতে থাকলেন। ষণ্ডটা ভীমরুল কামড়ালে যেমন এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছুটে বেড়ায় তেমনি সে ছুটে বেড়াতে থাকল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ গায়ের জামা খুলে ষণ্ডটাকে নিচে দোলাতে থাকলেন। যেন তিনি ষণ্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। তাঁর হাতের কাছে ফতিমা। কাঁপছে। চোখ বুজে আছে। মৃত্যুভয়ে চোখ খুলতে পারছে না। আর তখন মানুষটা ষণ্ডটাকে নিয়ে খেলায় মেতে গেছেন। সে পা দিয়ে জামাটা দোলালেই ওটা ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে আসে, সে জামাটা ওপরে তুলে নিলে ষণ্ডটা সামনের একটা কাফিলা গাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বার বার এমন হচ্ছে। এক সময় ফতিমা চোখ খুলল। দেখল ষণ্ডের মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে শিঙ দিয়ে রক্ত পড়ছে। আর পাগল মানুষের সঙ্গে ফতিমাও খেলাটা বড় মজার ভেবে গাছের ডালে বসে উঁকি দিয়ে থাকল।

ষণ্ডটা এক সময় বোকা বনে মাঠের দিকে চলে গেল।

ফতিমা এখন গাছের ডাল থেকে ইচ্ছা করলে লাফ দিয়ে নামতে পারে। কিন্তু ষণ্ডটা ভিটাজমিতে গিয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। শুধু বড় অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন গাছের ডালে ওরা দু'জন পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দু'জনের মাঝখানে মিষ্টির হাঁড়ি। মণীন্দ্রনাথ হাঁড়িতে কি আছে দেখার জন্য উঁকি দিলেন। ছেঁড়া কলাপাতার ভেতর থেকে তিনি দেখতে পেলেন, সব রকমের মিষ্টি একসঙ্গে মিশে গেছে। ফতিমা হাত দিয়ে একটা মিষ্টি বের করে মণীন্দ্রনাথের মুখের কাছে নিয়ে গেল। বলল, খাবেন?

মণীন্দ্রনাথ হাঁ করল।

ফতিমা প্রথম একটা দিল। তারপর একটা। আবার একটা। দিচ্ছে আর খাচ্ছে। ফতিমার কি যে ভাল লাগছে। কৌতূহল ফতিমার এই মানুষ, পাগল মানুষ, পীর না হয়ে যায় না—যেন কথা ছিল এই দিনে ফতিমা যখন গাঁয়ে উঠে যাবে তখন এক ধর্মের ষণ্ড তাড়া করবে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে—এই পীর মানুষ বুঝি জানতেন। তিনি আগেভাগে এসে অশ্বত্থের ডালে বসে আছেন। সে দেখল এবার আর একটা মিষ্টিও নেই। ফতিমা বলল, আর কি দিমু খাইতে?

মণীন্দ্রনাথ এবার হাঁড়িটা তুলে যে রসটুকু পড়েছিল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেন।

ফতিমা বলল, বাড়িতে নিয়া যামু কি!

মণীন্দ্রনাথ এবার লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লেন। তারপর মেয়েটাকে কাঁধে তুলে খালি হাঁড়িটা হাতে নিয়ে গোপাট ধরে হাঁটতে থাকলেন।

বাড়িতে উঠে মণীন্দ্রনাথ অর্জুন গাছটার নিচে খালি হাঁড়ি নিয়ে ফতিমার সঙ্গে বসে থাকলেন। ওরা দু'জন যেন এ-বাড়িতে অনেক দূরদেশ থেকে

উৎসবের খবর পেয়ে চলে এসেছে। সবাই খেয়ে গেলে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে—ওরা পাত পেতে খাবে।

ঈশম খালি হাঁড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। ফতিমা এবং পাগল মানুষ উভয়ের ভিতর যেন কতকালের আত্মীয় সম্পর্ক। ফতিমা মণীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা ঠিক সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশম বলল, তুই বাড়ি যাস নাই?

—না।

—বড়কর্তার লগে তর কি কাম।

ফতিমা দুষ্টুমি করে বলল, তাইন আমার সব মিষ্টি খাইয়া ফেলছে।

এই না যেই শোনা, ভূপেন্দ্রনাথ ছুটে এল। কি যে হবে! আবার মানুষটার পাগলামি বেড়ে গেল। ঈশমকে বলল, আবার একটা হাঁড়ি নিয়া আয় মিষ্টির। হাঁড়িটা ঈশম তুই দিয়া আয়।

মণীন্দ্রনাথ বলল, গ্যাৎচোরেৎশালা!

ফতিমা বলল, তাইন মিষ্টি খাইতে চায় নাই। আমি তাইনরে খাওয়াইছি।

ঈশমের মাথায় বজ্রাঘাত। সে তেড়ে গেল।—মাইয়া, তুই আর খাওয়ানের মানুষ পাইলি না। কি একটা অপরাধ হয়ে গেল। ঈশম বলল, মাইজা মামা, পোলাপান মানুষ, বোঝে না কিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ কিছু বলল না। বড়বৌ মিষ্টির হাঁড়ি আবার পাঠিয়েছে। ঈশম ওটা নিয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ফতিমাকে নিয়ে ঈশমের পিছনে হাঁটছেন। তিনি ফতিমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। বাড়ি পৌঁছে না দিলে ষণ্ডটা আবার ঈশম এবং ফতিমা উভয়কে তেড়ে আসতে পারে। তিনি ষণ্ডটাকে ভয় দেখাবার জন্য অর্জুনের ডাল ভেঙে নিলেন। পাতা ছিঁড়ে ডালটা মাথার ওপর পাইক খেলার মতো বার বার ঘোরাতে থাকলেন।

তখন সারাদিন পর সোনা একটু কাঁচা দুধ, গণ্ডূষ করে ঘি এবং কিছু ফল আহার করছে।

বড়বৌ ওদের দেখাশোনা করছে। সে আর বের হবে না। বাটিতে কাঁচা মুগ ভিজিয়ে রেখেছে। নানা রকমের ফল, তরমুজ ফুটি সব একটা পাথরে কেটে রেখেছে বড়বৌ।

লালটু হাপুস হাপুস ঘি খাচ্ছে। কাঁচা দুধ খেতে গিয়ে সোনার ওক উঠে আসছে। সে মধু খেল সামান্য। বেলের শরবত খেল। আর খেল দু' টুকরো ফুটি। আর কিছু সে খেতে চাইছে না।

বড়বৌ নানাভাবে ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। তার কম বয়সে পৈতা। এত ছোট বয়সে পৈতা হচ্ছে বলে ওর আদর বেশি। লালটু দু' তিনবার খেকিয়ে উঠেছে। বড়বৌ তখন ধমক দিয়েছে ওকে। তোমার এত মাথা ব্যথা কেন। আমি তো খাওয়াচ্ছি ওকে। বলে দুটো কাঁচা মুগ ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল। সোনা আর কিছুতেই খেল না।

বড়বৌ বলল, রাতে চরু হবে। খেয়ে দেখবি ভাল লাগবে।

সোনা উঠে পড়ল। সে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল সবাই খাচ্ছে।

বড়বৌ বলল, এই, কি হচ্ছে তোমার! এ-সব দেখতে নেই। দরজা বন্ধ করে দাও।

সোনা দরজা বন্ধ করে ফের এসে জেঠিমার পায়ের কাছে বসল। সে ভেবেছিল ক্ষুধার জন্য পেট ভরে খেতে পারবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে আর কিছুই খেতে পারবে না। পেটে যেমন ক্ষুধা ছিল তেমনি আছে। উঠোনে সবাই খাচ্ছে, সে কিছু খেতে পারছে না, মাছ এবং বাঁধাকপির তরকারির গন্ধ আসছে। জিভে জল চলে আসছিল। যত জল চলে আসছিল তত সবার ওপর তার রাগ বাড়ছে। সকাল থেকে তাকে নিয়ে যে কি সব হচ্ছে।

বড়বৌ বলল, তুই সোনা যদি এটুকু খেয়ে নিস তবে একটা আতাফল পাবি।

সে আতাফল খেতে ভালবাসে। সে বলল, কই ছাখি।

বড়বৌ তিনটা আতাই দেখাল।—তুই যদি আর একটু খাস তবে দেব।

সোনা শেষবার চেষ্টা করল, কাঁচা মুগের সঙ্গে নারকেল দিয়ে খেতে চেষ্টা করল। কোনরকমে পাথরের সবটুকু খেয়ে হাত পাতল।

বড়বৌ একটা আতা দিল সোনাকে। সে তিনদিনে তিনটা আতা পাবে। এই আতাফলের লোভে যেন সোনা অনায়াসে তিনদিন এই ঘরে বনবাসী হয়ে কাটিয়ে দেবে। অথবা প্রায় সবটা ওর অজ্ঞাতবাসের মতো। ওর সমবয়সী আত্মীয়স্বজনেরা এসে গোল হয়ে বসেছে। দীপালি আসছে বার বার। কেউ কেউ গল্প জুড়ে দিয়েছে এবং এক সময় রাত গভীর হলে বড়বৌ একপাশে, মাঝে সোনা লালটু পলটু এবং সব শেষে পাগল মানুষ খড়ের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়বে।

ঠিক জানালার নিচে মাটির গাছা। তার ওপরে প্রদীপ। তিনদিন অনির্বাণ

এই প্রদীপশিখা ওদের শিয়রে জ্বলবে। বড়বৌ রাতে ঘুম যেতে পারবে না ভাল করে। সলতে তুলে না দিলে কখন সলতে প্রদীপের বুকে এসে একসময় নিভে যাবে—নিভে গেলেই অমঙ্গল হবে ওদের—বড়বৌর প্রায় সারারাত জেগে থাকার মতো, লক্ষ্য রাখা প্রদীপ না নিভে যায়। প্রদীপ নিভে যাবার আশঙ্কায় কিছুতেই ঘুম আসে না চোখে।

তখন স্মৃতির ভিতর বড়বৌকে ডুবে যেতে হয়। বালিকা বয়সের কথা মনে হয়। যেন কোন কনভেণ্টের সবুজ মাঠে সে ছুটছে। পাশে গীর্জা, গীর্জার চুড়োয় সোনালী রোদ, এবং তার ছায়ায় লম্বা আলখাল্লা পরে ফাদার দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে স্মিত হাসি। সব কিছু দেখছেন। গীর্জার ছায়ায় তার অবয়ব কেন জানি বড়বৌর বড় দীর্ঘ মনে হত। তিনি বলতেন, আদিতে ঈশ্বর, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল তখন। এবং অন্ধকার জলধির ওপর ভাসমান এই জগতে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। ঈশ্বর, দীপ্তির নাম দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। তখন বড় বেশি বালিকা বড়বৌ, বড় বেশি চঞ্চল, অথচ ফাদার গীর্জার বেদিতে উঠে দাঁড়ালেই সে কেমন গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই ঈশ্বরপ্রতিম মানুষের কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইবেলের প্রাচীন মানব-মানবীর ভিতর হারিয়ে যাবার ইচ্ছা হত। অথবা কোন কোন রাতে কেন জানি মনে হত সেই প্রাচীন মানব-মানবী আর কেউ নয়, সে নিজে। এবং অন্য একজন মানুষ কোথাও নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে তখন। সে মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মানুষের সঙ্গে নিষিদ্ধ ফল খাবার লোভে ঘুরে বেড়ালে মনে হত সামনে এক নীল বর্ণের নদী। পাড়ে সে এবং তার প্রিয় পুরুষটি। ফাদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছেন। যেন তিনি আর ফাদার নন। একেবারে দেবদূত। তিনি বলছেন হাত তুলে, দেয়ার ইজ লাইট। এমন কথায় গীর্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বড়বৌর ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা হত। সংসারে সবাই পাগল মানুষকে ভাল করার জন্য সব কিছু করেছে, কেবল কেউ তাকে গীর্জায় নিয়ে যায় নি। বলতে পারে নি কেউ, দেয়ার ইজ লাইট। সিঁড়িতে উঠে গীর্জার সেই সুন্দর পবিত্র ধ্বনি শুনলে হয়তো তিনি আর পাগল মানুষ থাকতেন না। গীর্জার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফাদারের মতো প্রিচ করতেন। তিনি ভাল হয়ে যেতেন। তিনিও বলতেন, দেয়ার ইজ লাইট।

আবার এও মনে হয় বড়বৌর, মানুষটা এ-পৃথিবীর মানুষ নয়। অন্য সৌর-

লোকের মানুষ তিনি। তাঁকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা কারো নেই। সংসার থেকে একবারে বিচ্ছিন্ন এই মানুষ নদীর পাড়ে পাড়ে বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি।

এখন সেই মানুষ ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওর জন্য দুটো আলাদা বালিশ রেখেছিল বড়বৌ। কিন্তু তিন বালক শুয়ে আছে, শিয়রে তাদের কোন বালিশ নেই, শক্ত খড়কুটোর ওপর কম্বলের ওপর শুয়ে আছে এবং তাদের গায়ে কম্বল, আর কিছু নেই, নেই মানে থাকতে নেই, তাদের এই কৃচ্ছ্রতার প্রতি সমবেদনা জানানো বুঝি তার ইচ্ছা, তিনি বালিশে মাথা রাখেন নি। আল্লা শুয়েছেন। ওদের মতো কম্বল গায়ে শুয়েছেন। বড়বৌ যতবার শিয়রে বালিশ দিয়ে এসেছে ততবার তিনি তা সরিয়ে দিয়েছেন।

সোনা ঘুমের ভিতর গায়ে কম্বল রাখছে না। সে দুপুরবেলায় কাপড় ছাড়ার সময় লজ্জায় ম্রিয়মাণ ছিল। এখন তার গৈরিক কাপড় খুলে কোথায় সরে গেছে। একেবারে সেই আদি মানব। বড়বৌ কম্বলটা ফের তুলে ওর শরীর ঢেকে দিল। এইসব কাজ তার এখন এই ঘরে। কে বালিশ রাখছে না মাথায়, কার হাত কম্বলের বাইরে এবং প্রদীপের আলো কমে গেলে বাড়িয়ে দিতে হবে—এসব কাজের ভিতর তার রাত কেটে যাচ্ছে। পাগল মানুষ, ঘি-এর প্রদীপ, ফলমূলের গন্ধ আর রাতের নির্জনতা এবং পাখিদের ডাক তাকে বার বার অন্যমনস্ক করছে। মালতী নিখোঁজ। রঞ্জিত এখন কোথায়? ওর মনে হল তখন রাত পোহাতে বেশি আর দেরি নেই। সে এবার পুবের জানালাটা খুলে দিল। সে দেখল অনেক দূরে মাঠের ওপর দিয়ে লণ্ঠন হাতে কেউ এদিকে উঠে আসছে। যেন অর্জুন গাছটার নিচে উঠে আসার জন্য প্রাণপণ হাঁটছে। কে মানুষটা! সবাই যখন এ-পৃথিবীতে ঘুমিয়ে পড়েছে এমন কি কীটপতঙ্গ, তখনও একজন মানুষের কাজ থাকে। তার কাজ ফুরোয় না। এতক্ষণে মনে হল, এ নিশ্চয়ই ঈশম হবে। সূর্যকান্ত পণ্ডিতকে বারদির স্টীমারঘাটে তুলে দিয়ে ফিরে আসছে। এসে লণ্ঠন রাখবে দক্ষিণের ঘরে। হাত-পা ধোবে। নামাজ পড়বে। তারপর বালির চরে নেমে তরমুজ খেত পাহারা দেবে।

ঈশম বলেছিল, সাদা জ্যোৎস্নায় যখন বালির চরে পাতার ভিতর তরমুজ ভেসে থাকে এবং নদীতে যখন রাতের পাখিরা নামতে শুরু করে, দূরের মসজিদে আজান শুনলে তখন তার দু'হাত ওপরে তুলে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে

ইচ্ছা করে। তার ঘুম আসে না চোখে। সে সেই এক জগতের মায়ায় জড়িয়ে যায়। নির্জন মাঠে তার তখন কেবল মনে হয়, আল্লা এক, তার কোন শরিক নেই।

বড়বৌ বলেছিল, আমায় একবার নিয়ে যাবে? সাদা জ্যোৎস্নায় আমি তোমার তরমুজ খেত দেখব। তোমার আল্লার করুণা দেখব।

ঈশম বলেছিল, গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা হবে না।

বড়বৌ বলেছিল, কেন, আমি কি সেই মায়ায় জড়িয়ে যাব।

সাদা জ্যোৎস্না, নদীর চর এবং তরমুজ খেত আর নির্জন রাতের কোন এক দূরবর্তী আলোর মায়া বড়বৌকে টানে। কে জানত এই মায়ার টানে যথার্থই বড়বৌ এক রাতে পাগল মানুষের পিছু পিছু প্রায় সেই আদম ইভের মতো নদীর চরে নেমে যাবে।

সেটা এক বসন্তকালের ঘটনা।

আজ দণ্ডী বিসর্জনের দিন। খুব সকালে উঠে সোনা, লালটু পলটু, আহ্নিক করল। সূর্যোদয়ের আগে ওদের আজ নদীর পাড়ে হাজির হতে হবে। আহ্নিক শেষে ওরা এসে উঠোনে দাঁড়াল। তরমুজ খেত পার হলেই নদী। সেই নদীতে ওরা ডুব দিতে যাবে। নদীতে বিল্বদণ্ড, যে দণ্ড এ-তিনদিন ওদের হাতে ছিল, তা আজ বিসর্জন দিতে যাবে। ব্রহ্মচারী বালকেরা সন্ন্যাসীর এই আলখেল্লা ছেড়ে ফেলবে নদীর পাড়ে। ডুব দেবে জলে, ডুব দিলেই ফের তারা গৃহী হয়ে যাবে।

সূর্যোদয় না হতে আজ ঠাকুরবাড়ির সবাই নদীর পাড়ে নেমে যাবে—সোনাবাবুদের আজ দণ্ডী বিসর্জনের দিন, সে দিনে কি কি হয় সব জানে সামসুদ্দিনের মা। রাতে যখন ফতিমাকে পাশে নিয়ে শুয়েছিল, তখন গল্প করেছে, খুব ভোরে উঠে বাবুরা যাবে নদীতে ডুব দিতে। যা কিছু বসন-ভূষণ সন্ন্যাসীর সব ছেড়ে ফেলবে। ছেড়ে সব নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

ফতিমা ভোর রাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখল। রাজপুরীর পাশে এক বন। বনে এক রাজপুত্র জন্ম নিচ্ছে। বৈশাখী পূর্ণিমা। এক মহামানবের জন্ম হচ্ছে। তারপরই সে স্বপ্নে দেখল—কিছু জরাগ্রস্ত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে, কারা যেন হাজার হাজার মৃতদেহ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এবং এক পাগল মানুষ সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। পাগল মানুষের সঙ্গে সেও সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। কিন্তু কেউ ফিরছে না। এমন কি সোনাবাবু ওর প্রিয় পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে পালাচ্ছে! ঘুম ভেঙে গেল ফতিমার। সে উঠে বসল। স্বপ্নটার সঙ্গে তার বইয়ে পড়া একটা ইতিহাসের দৃশ্য কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরই সহসা মনে হল খুব সকালে, সূর্যোদয়ের আগে, এমন কি মনে হয় যখন কেউ ঘুম থেকে জাগবে না তখন ওরা নদীতে যাবে। ফতিমা বাইরে এসে দাঁড়াল। মোরগগুলো ডাকছে সে নেমে যেতেই মোরগগুলো মাঠে শস্যদানা খেতে বের হয়ে গেল। সে চুপি চুপি পেয়ারা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মাঠ ফাঁকা। শস্যদানা কিছু আর এখন পড়ে নেই। সে দেখল, সোনাবাবুর নেড়া মাথা, হাতে বিল্বদণ্ড, গায়ে গৈরিক বসন। সেই মহামানবের মতো মুখ চোখ সব। যেন খুব বড় হয়ে গেছে,

লম্বা হয়ে গেছে সোনাবাবু। পাগল কর্তার মতো কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে একা মাঠের ভিতর নেমে গেল।

একটা মিছিল যাচ্ছে মানুষের। সবার আগে পাগল মানুষ। পরে সোনা লালটু পলটু। পিছনে আশ্বিনের কুকুর এবং চন্দ্রনাথ। শশীভূষণ, ভূপেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আরও পিছনে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে যাচ্ছে। সবার শেষে যাচ্ছে ঈশম। সে ভোর রাতে জেগে গেছে, কারণ তাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হবে সবাইকে। ভোর হয়ে গেছে, এবারে উঠতে হয়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সবাইকে ডেকে দেবার ভার ছিল তার।

ঈশম এই তিন ব্রহ্মচারীকে দেখবে না বলেই সকলের পিছনে আছে। দেখলে যা কিছু পুণ্য এই তিন বালক উপবীতের ঘরে অর্জন করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সে সেজন্য সবার শেষে, সবার পিছে থাকছে। ডুব দিয়ে উঠলেই আর কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না। সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারবে।

ওরা যাচ্ছিল, ওদের উপবীত গলায়। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে। ওদের মুখ উপবাসে কাতর। তিনদিন শুধু ফলমূল আহার এবং দুপুরে চরু রান্না হয়েছিল গতকাল। খেতে বিস্বাদ। আজ পুকুরে জাল ফেলবে চন্দ্রনাথ। এবং বড় মাছ, পাবদা, কই অথবা রুই মাছের ঝালঝোল। এই নদীর জলে নেমে গেলে সেই এক খাদ্যবস্তু মনোরম গন্ধ বয়ে আনে। চন্দ্রনাথ, ওরা নদীতে ডুব দিয়ে উঠলেই পুকুরে গিয়ে জাল ফেলবে।

সোনা ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল। পাশাপাশি দাঁড়াল তিনজন। পুবের আকাশ গাঢ় লাল। ঠাণ্ডা কনকনে শীত। মনে হচ্ছিল সমস্ত শরীর এই হিম-ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছে। তবুও ওরা দাঁড়াল। মন্ত্রপাঠ করল। প্রথম উত্তরীয় ফেলে দিল জলে। তারপর বিল্বদণ্ড জলের নিচে গুঁজে দিল। সেই দণ্ডী বিসর্জন দিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ করল ওরা। এবার পরনে যে বাসটুকু ছিল তাও জলে ভাসিয়ে দিল। ওরা এবার সূর্যপ্রণাম সেরে উঠে আসার সময় দেখল, ঈশম দাঁড়িয়ে আছে তরমুজ খেতে। ফতিমা ঈশমের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুর দণ্ডী বিসর্জন দেখছে।

তখন পাগল মানুষ নদী সাঁতরে ও-পারে চলে যাচ্ছেন।

এ-ভাবেই ফতিমা দাঁড়িয়ে থাকে, বড় জ্যাঠামশাই নদী পার হয়ে যান। ফতিমা কি যেন বলতে চায় তাকে। মেলাতে যাবার সময় কি একটা কথা

বলেছিল, যার অর্থ সোনা বোঝেনি। মেলাতে ওরা একসঙ্গে পুতুলনাচ দেখেছিল একবার। রাবণের সীতা হরণ। এ-ভাবেই বর্ষা আসার আগে পাট গাছগুলো ক্রমে বড় হতে থাকে। শীতের ছুটিতে এসে দেখে গেছে ফতিমা ফসলবিহীন মাঠ, আর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে দেখতে পায় ফতিমা পাট গাছগুলো বড় হয়ে গেছে মাঠে। পাট গাছ বড় হলেই সে চুপি চুপি অতি সহজে এ-গাঁয়ে উঠে আসতে পারে। কেউ দেখতে পায় না, শহরের এক মেয়ে প্রায় চুপি চুপি অর্জুন গাছটার নিচে এসে বসে আছে। বাবুর জন্যে সে ঢাকা থেকে নানারকমের জলছবি নিয়ে আসে। কখনও রাজারানীর, কখনও প্রজাপতির। সে বাঘ-হরিণের ছবি আনে না। রাবণের সীতা হরণের ছবি আনতেও সে ভয় পায়।

এ-ভাবেই এ-দেশে নিদারুণ গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে। থেকে থেকে এ অঞ্চলে ঝড় হতে থাকে, বৃষ্টি হতে থাকে। আবার কি রোদ! রোদের উত্তাপে শস্যের চারা সব জলতে থাকে।

ঈশমের শরীর ভাল ছিল না বলে মাঠে যায় নি। সে কয়েতবেল গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। সোনা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ মাঠ দেখছে। মাঠে মাঠে কত কামলা। ওরা রোদের ভিতরে মাথলা মাথায় জমিতে নিড়ি দিচ্ছে। এবং গান গাইছে। সোনা এবং ঈশম বুঝি সেই গান শুনছিল। বেশ জারি জারি সারি সারি গান, গমকে গমকে আকাশে বাতাসে বাজছে।

ঈশম গাছের ছায়া দেখে এখন বেলা কত বলতে পারে, এই বেলায় বেলায় জমিতে যারা নিড়ি দিচ্ছে, বেলাবেলি শেষ করতে পারবে কিনা, পারলে আকাশের যা অবস্থা, ঈশান কোণের একটা বড় মেঘ দেখে টের পায় ঈশম ঝড় উঠবে এক্ষুনি। তাড়াতাড়ি মাঠে যা কিছু আছে, যেমন গাই-বাছুর, ঘাস পাতা সব নিয়ে আসতে হবে।

ঈশম পাশের জামরুল গাছটার দিকে তাকাল। গাছের ডাল, বড় বড় পাতা সব জামরুলে ঢেকে গেছে। সাদা সাদা ফল, কি মনোরম দেখতে, যেন সারা অঙ্গে লাবণ্য। ঝড় উঠলেই সব ঝুরঝুর করে পড়বে। মনে হবে কেউ যেন শুভ কাজে গাছের নিচে বড় বড় খৈ বিছিয়ে গেছে। ওর এই গাছ এবং ফলের জন্য মায়া হবে তখন।

তখন কালো রঙের মেঘটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন ঘুরে ঘুরে অথবা আসলে নিজেই একটা মেঘের সমুদ্র তৈরী করে ফেলেছে। ঘুরে ঘুরে

প্রচণ্ড ঢেউ তুলে মেঘগুলো ক্রমে কালো রং থেকে ছাই রং হয়ে যাচ্ছে। আকাশের অবস্থা বড় খারাপ। ঈশম বলল, চলেন কর্তা, বাড়ি যাই।

কোথাও বজ্রপাতের শব্দ। দুটো একটা পাতা বাতাসে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে গেল। দু' এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল শরীরে। দারুণ যে গ্রীষ্ম গেছে এই বৃষ্টি অথবা ঝড়ে তা ঠাণ্ডা হবে। সোনার এই বৃষ্টিতে বড় ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে।

জমিতে যারা পাট ধান নিড়ি দিচ্ছে, জমি থেকে তারা এখনও উঠছে না। তারা বৃষ্টির ঢলে জমি কাদা না হলে উঠবে না। ওরা প্রাণপণ কাজ করছে এবং উতরোলে গাইছে জারি জারি সারি সারি গান। যেন ঝড় অথবা বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্বরে গেয়ে চলেছে। এই শেষ সময়—আর ওরা এসে জমিতে বসতে পারবে না, নদীনালা পুকুর সব জলে ভরে আছে—বড় ঢল নামলেই নদীনালা উপচে জল জমিতে উঠে আসবে, তারপরই জেয়ারের জলে সরপুঁটি, বোয়াল মাছ। কাজ-কাম তখন কম। সারাদিন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে মাছ মারো খাও।

সারা মাঠে মাথলা মাথায় মানুষ। জমিতে জমিতে জোয়ারের জল। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও পায়ের পাতা ডোবে না। সারাদিন সারারাত বৃষ্টি। মাঠে মাঠে মানুষ। মাথলা মাথায় কোচ পলো হাতে মানুষ। ওরা সকাল-সন্ধ্যা কেবল মাছ মারবে। লণ্ঠন হাতে, কেউ পলো হাতে ঝুপঝাপ জল ভেঙে বড় মাঠে নেমে যাবে অন্ধকারে। অন্ধকারে মাছেরা মানুষকে এ-দেশে ভয় পায় না।

সুতরাং এই যে সব ঘাস এতক্ষণ রোদে পুড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দাবদাহে পৃথিবীর শেষ রসটুকু বুঝি এবার বিধাতা শুষে নেবেন, তখন আকাশে আকাশে মেঘের খেলা। জলে আবার দেশ ভরে যাবে। ওরা দু'জন তখনও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ভিতর কৃষকদের গান শুনছিল। কত ঘাস এবং প্রজাপতি এই মাঠে। পঙ্গু বিবির কথা মনে পড়েছে ঈশমের। আগামী হেমন্তে অথবা শীতে বুঝি তার বিবিটা মরে যাবে। ক্রমে বিবি বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এত কাজ এই সংসারে, সময় করে দু'বার বেশি যাবে তা পর্যন্ত পারে না। মনে হয় কেবল কিছু না কিছু কাজ বাকি থেকে গেল।

ঝুপ ঝুপ করে এবার ঢল আরম্ভ হল। ঘাস পাতা সব ভিজে যাচ্ছে। জল পড়ছে টুপটাপ। সোনা, ঈশম, পাগল জ্যাঠামশাই সবাই দক্ষিণের ঘরের জানালাতে বসে আছে। বৃষ্টির শব্দ শুনছে। ঘাস পাতা কেমন বর্ষার জলে

ভিজে ভিজে নাচছে। কোথাও একটা গরু ডাকছে—হাম্বা। বোধহয় ওর বাছুরটা এখনও মাঠে, বৃষ্টিতে ভিজছে।

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছিল—ঝুমঝুম। সোনা দুটো হাত দু'কানে চেপে রাখছে, সহসা হাত দুটো আবার আলগা করে দিচ্ছে। দিলেই বিচিত্র এক শব্দ। কান থেকে হাত আলগা করে দিলেই, বৃষ্টির ক্রমান্বয় অন্বেষণের মতো এই শব্দ। বার বার কান চেপে, হাত মৃদু আলগা করে—ওর এক ধরনের কানের ভিতর ঝমঝম খেলা, বেশ মজা পেয়ে যাচ্ছে সে। সে এমন একটা মজার খবর জ্যাঠামশাইকে দেবার জন্য ইজিচেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। হাত কচলে কবিতা আবৃত্তি করছেন। সমস্বরে সেই গানের মতো। যেন বলছেন, মায়া মাখানো জগতে কোথায় যে তুমি ঈশ্বর এই মাটি এবং ঘাসে কখন কি ভাবে নেমে আস জানি না।

সোনা জ্যাঠামশাইর দু'কানে দু'হাত চেপে তালে তালে হাত খুলে দিয়ে তালি বাজাতে থাকল। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে বলল জ্যাঠামশাইকে—শুনতে পাইতাছেন না! ওঁয়া ওঁয়া কইরা কাঁদছে কারা? সে এমন বলল।

এই পৃথিবীতে নিয়ত কারা যেন কাঁদছে। আমরা জন্ম নেব এবার। ধনবৌ তখন বারান্দায় একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেও সেই কান্না শুনতে পাচ্ছে। আমি এবারে জন্ম নেব। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে ধনবৌ'র মুখ। উঠোন জলে ভেসে গেছে। জলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড়। অজস্র তারার মতো জলের ওপর ফুটছে। উঠোনে অশুজ ঘর। শুকনো কাঠ ফেলে দিয়ে গেছে ঈশম। পাটকাঠির বেড়া। ওপরে শণের চাল। ঝাঁপের দরজা। ঈশম সারা-দিন খেটে ঘরটা করেছে। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে ধনবৌর মুখ। এ-ঘরে কেউ নেই। তার ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কারণ সারা আকাশ যেন এখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে। আকাশ ভেঙে প্লাবন নেমেছে। ব্যাঙ ডাকছে। কচুপাতায় পুতুলনাচ হচ্ছে। পাতাগুলো জলের ভারে নাচছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ অথবা রাবণের সীতা হরণ। ধনবৌর মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে। সে আর পারছে না।

বড়বৌ ভাবল, একবার খোঁজ নিয়ে যাবে। রাতের খাবার তৈরি করতে যাবে সে। সন্ধ্যা না হতেই রাতের খাবার করবে। খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। খাবার সময় ধনের খবর নেবে।

সে হাঁটু জলে কাপড় তুলে রান্নাঘরে উঠে যাবার সময়ই দেখল ধন একটা বাঁশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে টের পেল, পৃথিবীতে ঈশ্বর আসছেন। সে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ডাকল, ঈশম, একবার যাও নাপিত বাড়ি। নাপিত বৌকে ডেকে আন। ধন বড় কষ্ট পাচ্ছে ব্যথায়।

ঈশম যখন দরজায় এসে দাঁড়াল, বড়বৌ দেখল, ওর চোখ লাল।

—তোমার শরীর খারাপ!

—না মামী।

—চোখ লাল কেন?

—ইট্টু জ্বর হইছে। সাইরা যাইব।

এবার বড়বৌ বলল, লালটু কোথায়? পলটু!

—জানি না মামী।

—সোনা, এদিকে এস।

সোনা এলে বড়বৌ ছাতা খুলে দিল।—তুমি যাও। নাপিত জেঠিকে ডেকে আনো।

—আমি যামুনে! ঈশম তাড়াতাড়ি গামছা মাথায় বের হয়ে এলে বড়বৌ বলল, ঈশম, তোমার শরীর ভাল না, তুমি শুয়ে পড় গে। রাতে ভাত খাবে না। বার্লি খাবে। ছেলেরা সব বড় হয়েছে। তোমার যা কাজ, এবার থেকে ওরা কিছু কিছু করবে।

বড়বৌর এমন কথায়, ঈশমের চোখ জলে ভার হয়ে এল। সে বলল, শুকনা গাছের গুঁড়ি আরও আছে। গোয়াল ঘরে তুইলা রাখছি। অশুজ ঘরে লাগলে কইয়েন। দিয়া আমু।

সোনা এমন দিনে বৃষ্টিতে ভেজার একটা কাজ পেয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নেমে এল উঠোনে। এবং ছাতা মাথায় যাবার সময় দেখল মা বাঁশে হেলান দিয়ে কেমন ঝুলে আছে যেন। মা, তার মা। কি সুন্দর আর সজীব ছিল। এখন তার মা ক্রমে কি হয়ে যাচ্ছে! ঘরের বারান্দা টিন কাঠের, দুটো খুঁটির ওপর বাঁশ ঝুলছে এবং মা এখানে অন্যদিন তার ভিজা কাপড় মেলে দেন। কিন্তু আজ কাপড় নয়, ভিজা কাঁথাও নয়, মা নিজেই কেমন ঝুলে আছেন। সোনার বড় কষ্ট হল মাকে দেখে। মাটিতে মার পা দুটো ঈষৎ ঝুলে অথবা ছুঁয়ে আছে যেন মাটি। চোখ দুটো বড় বিষন্ন মায়ের। সে কেমন নড়তে পারছে না আর।

বড়বৌ বলল, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস! তাড়াতাড়ি যা! বলবি এক্ষুনি যেন চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে ধনবৌ কাতর গলায় বলল, যা বাবা, নাপিত বাড়ির জেঠিরে ডাইকা আন। লালটু কই গ্যাছে? অরে কখন থাইকা দ্যাখতাছি না। মার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকল না। সে এক দৌড়ে যাবে, এক দৌড়ে ফিরে আসবে। কোথাও কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না। গল্প করবে না।

সে ছুটল ছাতা মাথায়, জলে ভিজে ছুটল। ছাতায় জল আটকাচ্ছে না। গাছের নিচে জল পড়ছে টুপটাপ। ওর শরীর ভিজছে। কাদা-জল ছলাৎ ছলাৎ ছড়াচ্ছে চারপাশে। সে মার কষ্টের মুখটা ভাবছে আর ছুটছে। পাল বাড়ির বাঁশ বাগান অতিক্রম করে সে মাঝি বাড়িতে উঠে গেল। নাপিতবাড়ির জেঠি, এখানে কি একটা কাজে এসেছে। সে ডাকল জেঠিকে, জেঠি তুমি লও যাই। মায় কেমন করতাছে।

মাঝিবাড়ির ছোটবৌর দাঁতগুলো ভোঁতা। কি সব বলছে মার সম্পর্কে। ওর এ-সব শুনতে ভাল লাগছে না। বৌটার দাঁত কালো। মার বয়সী কি তারও বড়, মনে হয় জেঠিমার বয়সী। কালো কুচকুচে দাঁত কালশুটি কালপাহাড়ের মা! সোনা এবার উঁকি দিল ঘরে। কালপাহাড় ঘরে নেই। কালপাহাড় নিশ্চয়ই জোয়ারের জলে মাছ ধরতে গেছে। এমন বর্ষার দিনে সে মাঠে নেমে যেতে পারল না, জোয়ারের জলে সে সরপুঁটি, পিরের বোয়াল ধরতে পারল না। ওর ভিতরে কষ্ট! বড়দা মেজদা হয়তো পালিয়ে চলে গেছে মাছ ধরতে। তার ভিতর থেকে এমন দিনে মাছ ধরতে না পারার কষ্ট ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে। সে বলল, অ জেঠি, লও যাই! মায় কেমন করতাছে!

নাপিত জেঠিকে খবর দিয়েই সোনা ছুটতে থাকল। ছুটছে আর ছুটছে। কাদা-জলে ওর জামা-প্যান্ট নষ্ট হচ্ছে। তবু সে ছুটছিল। কারণ এখন জল নামছে অবিশ্রান্ত ধারায়। আহা, কি বৃষ্টি! মাঠ জমি সব জলে ভেসে যাচ্ছে। সে এসেই খবর দিল মাকে, মা, জেঠিরে কইছি। সে বড় জেঠিমাকে খবর দিল, জেঠিমা, নাপিত জেঠি আইতাছে। বড়বৌ তখন উনুনে জল গরম করছে। আভারানী এসেছে ছুটে। দীনবন্ধুর দুই বউ মানকচু পাতা মাথায় এসেছে খবর নিতে। বড়বৌ সবার সঙ্গে জল গরম করতে করতে কথা বলছে।

সোনা দেখল, মা তখন টিনকাঠের ঘরটা থেকে কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হচ্ছিল মার মাথায় ছাতা ধরে। মার মুখ এমন নীল বর্ণ হয়ে গেছে কেন! সেই যে সে একবার নীল রঙের একটা আলো জলতে দেখেছিল একটা ঘরে, নীল রঙের আলোর ভিতর সে এবং অমলা, অস্পষ্ট মুখের ছবি, মার মুখ কি কষ্টে যেন তেমন নীলবর্ণ ধারণ করছে। সে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে না।

ঈশম তখন বৃষ্টিতে ভিজে আরও দুটো শুকনো কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে গেল। মা ঘরে ঢুকে গোঙাচ্ছে। সোনার ভারি কষ্ট হতে থাকল। সে ঝাঁপ খুলে মাকে বলবে ভাবল, তোমার কষ্ট হচ্ছে মা, আমি কি করতে পারি। আমি জোয়ারের জলে মাছ ধরতে যাব, বড় বড় সরপুঁটি সব জোয়ারের জলে উঠে আসছে।

আভারানী বলল, বৌদি মুখটা ছাখছেন?

সোনার রাগ হচ্ছিল বড় জেঠিমার ওপর। এখনও জেঠিমা রান্নাঘরে কি করছে। বের হচ্ছে না।

বড়বৌ বলল, মুখ দেখেছি। সময় হয় নি। তুই ঘরে যা। আমি যাচ্ছি। ধনের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাক।

সোনা রান্নাঘরে এসে দেখল বড় জেঠিমা আবু-শোভার মার সঙ্গে ফিস-ফিস করে কি কথা বলছে। সে বুঝতে পারছে না কিছু। নিরামিষ ঘরের পাশে বৃষ্টির জল বড় বড় ফোঁটায় পড়ছে। জলে দুটো ব্যাঙ লাফাচ্ছিল। এমন বৃষ্টির দিনে মার কষ্ট, অথবা ছোট ঘরটায় মার গোঙানি সে সহ্য করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে গেলে এ-সব শুনতে হবে না, দেখতে হবে না, সে পলোটা নিয়ে ছাতা মাথায় মাঠে নেমে গেলে জেঠিমা বলল, ভাল হবে না সোনা। জলে ভিজলে জর হবে।

সোনা বৃষ্টির শব্দে জেঠিমার কথা শুনতে পেল না। সে ছাতাটা মাথায় দিল, এবং পা টিপে টিপে জল ভেঙে হাঁটছে। হাতে পলো। সে হাঁটছে। চারপাশে সতর্ক নজর, মাছ উঠে আসতে পারে। সে কালোজাম গাছটা পার হতেই শুনল কচুর ঝোপে কি খলবল করছে। সে উঁকি দিল ঝোপের ভিতর। মাছ। কৈ মাছ। পালেদের পুকুর থেকে নতুন জলের গন্ধ পেয়ে কৈ মাছ উঠে আসছে। সে পলো দিয়ে চাপ দিল। ভেবেছিল সব কটা কৈ পলোর নিচে, সে হাত দিয়ে দেখল মাত্র দুটো। রান্নাঘরের দরজায় সে মাছ

দুটো ছুঁড়ে দিল। বলল জেঠি, দুটো কৈ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে টাপুর-টুপুর। সে তখন দুটো কৈ মাছ ফেলে দিয়ে আরও মাছের জন্য মাঠের ভিতরে নেমে গেল।

বৃষ্টি ফের জোর নামছে। আকাশটা ছাই রঙের। সুতরাং এসব দিনে বৃষ্টি ভিজে হাঁটুজল ভেঙে কোথাও যাওয়া অথবা ধানখেতে জোয়ারের জলে মাছ ধরা সবই সুখী ঘটনার মতো, আর ব্যাঙেরা ডাকছে চারদিকে। ডালে বসে কাক ভিজছে। পাখিরা আকাশে উড়ছে না। ঘন মেঘ সব এখন আকাশে পাখিদের মতো ডানা মেলে ঝাপটাচ্ছে। চারদিকে জল নামার শব্দ। পুকুর-গুলো সব মাঠের জলে ভরে গেছে এবং কচুর পাতায় তখন পুতুলনাচ হচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ, পাতা ভিজছে, টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটায় কচুর পাতা নাচছে। সোনা পুতুল খেলা দেখছে—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, রাবণ-সূর্পণখা। এখন কচুর পাতা পুতুলনাচের মতো। জলের ফোঁটায় ওরা হাত-পা তুলে নাচছে। কখনও হেঁটে যাচ্ছে যেন। কখনও ডগাগুলো বৃষ্টির ফোঁটায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কচুর ঝোপটায় সোনা অনেকক্ষণ পুতুলনাচ দেখল। ওর মন ভাল না। সে ধানখেতে নেমে একটা পাতা ছিঁড়ল ধানের। ভাবল ফতিমা ওর সঙ্গে মেলায় পুতুলনাচ দেখেছে। ফতিমা ফেরার সময় সোনাকে একটা মন্দ কথা বলেছে। এই যে ঈশ্বর তাকে একটা ভাই দেবে, মাকে ভগবান, একটা ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে, দিয়ে যাবেন—সেটা যেন ঠিক না। ফতিমা মন্দ কথা বললে সোনার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাতে মাকে চুপি চুপি কথাটা বলে দিয়েছিল।

মা বলেছিল, ফতিমা নচ্ছার মেয়ে।

মা হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, তুমি ওর সঙ্গে যাবে না সোনা। তুমি ওর সঙ্গে কোথাও একা যাবে না।

মা তাকে বলেছিল, ঘরটায় ঢুকে মা বসে থাকবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর ভাইটাকে মার কাছে দিয়ে যাবে। ওর বড় জানার ইচ্ছা তখন, সে কি করে এসেছে মার কাছে?

মা বলত, ওকে কারা রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল, মা তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে।

সোনা তখন হাউহাউ করে কাঁদত। কোন কোন দিন সে তার জামা-প্যাণ্ট নিয়ে চলে যেত গোপাটে। সে অন্ধকারে একা-একা সেখানে বসে

থাকত। মা তাকে খুঁজে নিয়ে আসত। কোলে তুলে বলত, সোনাকেও তার ভগবান কোল আলো করে রেখে গেছে।

এখন সোনার জানার বড় ইচ্ছা, মা এই যে আজ, ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে গেল, কাঠের শুকনো সব গুঁড়ি, গুঁড়িতে আগুন জ্বালানো হবে, ধূপ ফেলে মা আগুন জেলে আরাধনা করবে, সেই এক ছোট্ট ঘর থেকে মা তাকে নিয়ে তেমনি বের হয়েছিল কিনা!

কিন্তু কেন জানি, কি এক রহস্য এই জন্মের ভিতর, সে বুঝতে পারে না, ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। ধানপাতাগুলি নড়ছে। টুপটাপ বৃষ্টি। সে ছাতা মাথায় অল্প জলে দাঁড়িয়ে আছে। জল আর জল, পুকুর খাল বিল ভরে জমিতে জল উঠে আসছে। ধানের গোড়া জলে ডুবে গেছে, পাতাগুলো বাতাসে নড়ছে। সে বুঝতে পারে না, ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। জোয়ারের জলে পা ডুবে যাচ্ছে। চারপাশের জমি, ধানখেত পাটক্ষেত জোয়ারের জলে ভেসে যাচ্ছে। মা-র নীলবর্ণের মুখ দেখে সেও কেমন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই সে দেখল একটু দূরে ধানগাছগুলো তিড়িং তিড়িং করে সরল রেখায় ছুটে যাচ্ছে। আবার দূর থেকে তিড়িং তিড়িং করে ধানগাছগুলো বৃত্ত সৃষ্টি করে ক্রমাগত এক জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। খেলাটা বড় মজার। গাছগুলো প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। কখনও সরল রেখায়, কখনও ছোট্ট ত্রিভুজের মতো কোণ সৃষ্টি করে গাছগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটায় নড়ছে না। জলের নিচে মাছ ছুটে আসছে, খেতের ভিতর ঘুরছে—একটা দুটো নয়, অনেক ক'টা মাছ। জোয়ারের জলে তার পায়ের পাতা ডুবে গেছে কখন। হাঁটুর নিচে জল উঠে এসেছে। গাছের গোড়ায় জোয়ারের জলে খেলা করছে বলে ধানগাছগুলো এখন তিড়িং তিড়িং করে ছুটে বেড়াচ্ছে। সে এবার সন্তর্পণে ডাহুকের মতো পা বাড়াল। কারণ জলে বেশি শব্দ করতে নেই। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের শব্দ, ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দকে ডিঙিয়ে জলে তার পায়ের শব্দ কিছুতেই বেশি হবে না। মাটি জল শুষে নিচ্ছে বলে ফুর্-ফুরর্ এক শব্দ এবং জলের ওপর অজস্র ফুটকরি। জলের ওপর অজস্র ফুটকরি ভেসে উঠে ভেঙে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। এত সব শব্দের ভিতরও সোনা সন্তর্পণে পা সুচালো করে একটা ডাহুকের মতো শিকারের আশায় পা বাড়াতে থাকল।

সে মাছগুলোর পিছনে হেঁটে-হেঁটে অনেক দূর চলে এসেছে। আর দুটো জমি পার হলেই ফতিমাদের পুকুর, মোত্রাঘাসের জঙ্গল। মোত্রাঘাসের জঙ্গলের

ভিতর দিয়ে জমির জলটা ওদের পুকুরে পড়ছে। মোত্রাঘাসের ভিতর ঢুকে ফতিমা নিশ্চয়ই মাগুর মাছ ধরার জন্য বঁড়শি ফেলেছে।

সামনের জমি উঁচু, জল কম। মাছগুলো এখনও গাছের গোড়ায় নড়ছে। কম জলে উজানে উঠে যাচ্ছে মাছ। সে মোত্রাঘাস অতিক্রম করে যেখানে ফতিমার মাছ ধরার কথা সেখানে গিয়ে বসে থাকবে কিনা ভাবল। কারণ সে বুঝতে পারছে না, এই যে চারপাশে সব ধানগাছ দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে তার নিচে কি সব মাছ আছে। মাছ হতে পারে আবার সাপও হতে পারে। জলের নিচে মাছ না সাপ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

তখন একটা শোল মাছ কিছুতেই ধানখেতের আল পার হতে পারছিল না। আলে এসে মাছটা আটকা পড়েছে। এবং বাধা পেয়ে মাছটা জলে লাফ দিতেই দেখল সোনা ছাতা মাথায় পলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠময় জোয়ারের জল। সবাই জোয়ারের জলে মাছ ধরার জন্য কোচ পলো নিয়ে হাঁটছে। সোনা জলে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। মাছটা ভয়ে-ভয়ে লেজ নেড়ে সহসা মোত্রাঘাসের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোনা মাছটা এত সামনে পেয়েও ছুটে গেল না। সে জানত মাছটার সঙ্গে সে ছুটে পারবে না। ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার ডাহুকের মতো সে ধানখেতে হাঁটতে থাকল। যদি কোথাও বোয়ালের পির চোখ পড়ে। অথবা সোনার ইচ্ছা এখন বৃষ্টি আরও ঘন হোক, এবং পাটখেতে ঘন অন্ধকার নামুক। আকাশ ছেয়ে মেঘ তাড়কা রাক্ষুসীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের শব্দ। পৃথিবী যেন ভেসে যাবে। মাছেরা নিরাপদে জলের ভিতর খেলে বেড়াচ্ছে তখন! সোনাও খুব নিরাপদে ফতিমার পাশে চুপি চুপি দু'জনে ছাতা মাথায় মাছ ধরার নামে পাশাপাশি বসে থাকবে। এক সঙ্গে বসে জল নামার শব্দ শুনবে। কোথাও তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চমকালে সে আর ফতিমা পরস্পর ভয়ে জড়িয়ে ধরবে। তারপর ছোট একটা কথা বলে ফতিমার মুখ দেখবে। মুখের রেখায় কি রং ফুটে ওঠে দেখবে।

যদি রঙটা জানপাড় আমগাছের সিঁদুরে আমের মতো হয়, যদি পাতার মতো রঙ ধরে, যদি ফতিমা রাগ করে অথবা ওদের চাকরটাকে বলে দেয়···ছিঃ ছিঃ, সোনা কি সব জোয়ারের জলে দাঁড়িয়ে ভাবছে! মার মুখটা মনে পড়ল। নীলবর্ণ মুখ। ঘরের কোণে শুকনো কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। আগুনের চার-পাশে মা, জেঠিমা সকলে গোল হয়ে বসে আছে। ওরা প্রার্থনা করছে হাত তুলে। রাত হলেই ঈশ্বর নেমে আসবেন পৃথিবীতে। আগুনের পাশে এক

শিশুকে শুইয়ে দেবে। সে যে কি নাম রাখবে ভাইটার! ভাই না বোন। বোন হলে ভাল হয়। আকাশে কি প্রচণ্ড মেঘের গর্জন। যেন সব দেবদূতরা মিলে পৃথিবী থেকে সব দুঃখ তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাড়কা রাক্ষুসীকে তাড়িয়ে ওরা আকাশের অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা সে যেন দেখতে পেল চারপাশে আগুন, মা মাঝখানে, জেঠিমা, নাপিত জেঠি, আবুর মা আগুনের চারপাশে নৃত্য করছে। ভয়ে মা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শালুকপাতার মতো রঙ মুখে। মা যদি সোনার মনের ভাবটা এখন জানতে পারত! মা, সোনার মা, জগতে একটি মাত্র মা, সোনার মা। সে মা-মা বলে ডেকে উঠল।

বিচিত্র সব চিন্তা সোনা আজকাল করতে শিখেছে। সেই অমলা ওকে কি যে শেখাল! তারপর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মাঝো-মাঝো। কি সব আজে-বাজে দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকে। আঁধার রাত, গ্রামের সব কুকুর-কুকুরী এবং মেনি গাইর বাচ্চা হবার আগের ঘটনা। বাচ্চা হবার আগে কোন গ্রীষ্মের দিনে গরুটা সারা মাঠে ছুটে বেড়াত। কেউ কাছে যেতে সাহস পেত না। কাছে গেলেই লাফাত। তারপর ঈশমদা ওটাকে কত কায়দায় ধরে আনত। ঈশমদা আর ও-পাড়ার হরিপদ গরুটাকে নিয়ে সকালে-সকালে কোথায় চলে যেত। গরুটা তখন হাম্বা করে ডাকত কেবল। হরিপদর কাঁধে দুটো বাঁশ, ঈশমদা গরুটার দড়ি ধরে রাখত। আর ফিরত রাত করে। এসেই ছোটকাকাকে কৌশলে কি বলত। সোনা কিছু বুঝতে পারত না। এই মেনি তখন গোয়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুমা বার বার সাবধান করে দিতেন ঈশমকে, ঈশম মেনিরে খাওয়ন দেইস না, দিলে ডাক থাকব না।

ঠাকুমার কথা শুনে মনে হত গরুটা সারা দিন সারা মাঠ ছুটিয়ে মেরেছে সকলকে। তার শাস্তি দিচ্ছে ঠাকুমা। সোনা তখনই দেখল অনেকগুলো ধানগাছ নড়ে উঠছে। নিশ্চয়ই ধানগাছের গোড়ায় জলের ভিতর অনেকগুলো মাছ এক সঙ্গে খেলা করছে। সোনা এবার পলোটা চেপে বসাল মাটিতে। সে পলোর ওপর উঠে দাঁড়াল। উঠতেই একেবারে সর্বনাশ—ওর চোখের তারা বড় হয়ে গেল। গোল গোল হয়ে গেল। কি বড় সাদা বোয়াল! মাছটা চিৎ হয়ে আছে। ফোটকা মাছের পেটের মতো সাদা বোয়ালের পেট জলের ওপর ভাসছে। মাছটার সে সবটা এখন দেখতে পাচ্ছে। মাছটা খুশিতে এমন জোয়ারের জলে, মেঘলা দিনে লেজ নাড়ছে।

সোনা এর আগে কোনদিন পিরের বোয়াল ধরে নি। ঈশমদা, চন্দদের চাকর, কালপাহাড়, পিরের বোয়াল ধরেছে। এবং এমন সব গল্প সোনা ঈশমদার কাছ থেকে শুনেছে। সোনা পিরের বোয়াল ধরা দূরে থাকুক, সে দেখেনি পর্যন্ত। আজ প্রথম দেখল। দেখে বুঝতে পারল, এটা মেয়ে বোয়াল, ডিমে পেট উঁচু। চিৎ হয়ে আছে। ওর কেন জানি সহসা মনে হল মা ঠিক বোয়াল মাছটার মতো অশুজ ঘরে শুয়ে আছে। আগুন জ্বলছে চারপাশে। জেঠিমা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে। মার নীলবর্ণ মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

সোনার মনে হল জলের ভিতর এত বড় মাছটাও কাতর। ব্যথায় নীলবর্ণ না হলে এত বড় মাছটা এমন কম জলে উঠে আসবে কেন!

আবার সেই ডাহুক, ডাহুকের মতো সে হাঁটছে। কিছু সাদা বক ধানখেতের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। ওরা কম জলে কুচো মাছ ধরে খাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হল সাদা বকেরা যেমনি সন্তর্পণে পা বাড়ায়, জলে সে তেমনি হাঁটবে। বকগুলো গঙ্গাফড়িং খাচ্ছে এবং ছোট-ছোট পুঁটি মাছ ধরছে। ডারকিনা মাছ ধরছে। ডারকিনা, পুঁটি শাড়ি পরেছে বর্ষার জলে। লাল চেলি, তসর গরদ, ঠিক যেন পুজোমণ্ডপে মার মতো। তখন কে বলবে এই মা তার একটা ছোট ঘরে ঢুকে আগুন জেলে বসে থাকবে।

কালপাহাড় হলে এতক্ষণে কোচ ফিকে দিত বোয়ালটার গায়ে। এবং বোয়ালটাকে ডিমসুদ্ধু ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু সে তা চাইল না। খেলাটা জমুক। বোয়ালের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অন্য বোয়ালগুলো যখন ওর উঁচু পেট কামড়াতে আসবে অথবা পির বাঁধবে সকলে মিলে তখন সুযোগ মতো পলোতে এক চাপ এবং সঙ্গে-সঙ্গে আট-দশটা বোয়াল পলোর নিচে। একসঙ্গে সে এতগুলো বোয়াল নিয়ে যাবে কি করে!

গাভীন বোয়ালটার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল সোনা। ভয়, ওকে দেখে মাছটা না আবার গভীর জলে নেমে যায়। কিন্তু একটা খবর সে রাখে, গাভীন বোয়ালের ব্যথা উঠলে বেশি নড়তে পারে না। বোয়ালটার এখন নিশ্চয়ই ব্যথা উঠেছে। ডিম পাড়ার ব্যথা। মাছটার ভয়ঙ্কর কষ্ট। বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয়ে পড়ছে না এখন। ছোট ছোট ফোঁটা। ঝড়ো হাওয়া থেমে গেছে। কড়াৎ-কড়াৎ শুধু বজ্রপাতের শব্দ। গুটিকয় অন্য বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো মাঠে। প্রসবের এক নিমজ্জিত গন্ধ এই জলের ভিতর অন্য মাছেদের উত্তেজিত করে

তুলছে। এবং ওরা মেয়ে বোয়ালটার কাছে আসবেই। না এলে পেট ফুটে ডিম বের হবে না। পুরুষ বোয়ালেরা, কি ওরা মেয়ে বোয়ালও হতে পারে—জোরে-জোরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে পেটে, পেট থেকে ডিম বার করে দেবে। মাছটা তাই নড়তে পারছে না। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং সোনা একটা শ্যাওড়া গাছ হয়ে গেল! সে ছাতা মাথায় চুপচাপ ঠিক একটা ছোট্ট গাছের মতো মাঠের ভিতর মাছটাকে দেখতে থাকল। সে নড়ল না। উলানি পোকা পা কামড়ে ফুলিয়ে দিয়েছে। সে তবু চুলকাল না। চুলকালেই নুইতে হবে, নড়তে হবে। শ্যাওড়া গাছ ইচ্ছামতো নড়তে পারে না। সে অনেকক্ষণ নিজেকে শ্যাওড়া গাছ করে রাখল। অন্যান্য মাছেরা ডিমের গন্ধে উঠে আসুক, না আসা পর্যন্ত সে শ্যাওড়া গাছ হয়েই থাকবে। তখন কিনা একটা ছোট্ট বোয়াল ওর পা ঘেঁষে চলে গেল। কি আশ্চর্য, মাছটা ওকে শ্যাওড়া গাছ ভেবে ফেলেছে। মাছটা গা ভাসিয়ে বড় মাছটার পেট কামড়ে ধরল। পেট থেকে ডিম বার হচ্ছে। জলে জলে ডিম ভেসে স্রোতের মুখে কাগজের নৌকার মতো ভেসে গেল। সোনা সারাক্ষণ শ্যাওড়া গাছ হয়ে কাগজের বিন্দু-বিন্দু নৌকা জলের ওপর ভাসতে দেখল।

জীবের এই জন্মরহস্য সোনাকে কিছুক্ষণ অভিভূত করে রাখল। গাছপালা পাখি নিয়ত তার চারপাশে বাড়ছে। বড় হচ্ছে আবার বিনষ্ট হচ্ছে। এই সব গাছের নিচে কত মাছ হবে আবার। বিন্দু-বিন্দু কাগজের নৌকা আবার মাছ হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে, বড় হলেই জোয়ারের জলে উঠে আসবে। খেলা করবে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। সোনা এমন মজার খেলা দেখতে-দেখতে ক্রমে কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছে। ওর হুঁশ নেই যেন। তখন মনে হচ্ছে গ্রামের ভিতর থেকে তাকে কে ডাকছে—সোনাবাবু, আপনের আর মাছ ধরতে হইব না। বাড়ি আসেন।

সোনা দেখল বৃষ্টি মাথায় ঈশমদা গাছতলা থেকে ডাকছে। সে উঠে দাঁড়াল। একটা মাছও নেই সামনে। মাছগুলো এই জলে এসেছিল সন্তানের জন্ম দিতে। ওরা জন্ম দিয়ে চলে গেছে। কেবল কিছু জল আর ধানগাছ, আর বৃষ্টি, তাড়কা রাক্ষুসীর মতো মেঘেদের ভেসে বেড়ানো, এবং এক গভীর অন্ধকার চারপাশে যেন নামছে। সোনা খালি হাতে উঠে যাচ্ছে। সে এত সামনে এমন পিরের বোয়াল পেয়েও ধরতে পারল না। কেমন এক অন্য পৃথিবী ক্রমে তার রহস্য খুলে ধরছে। যত ধরছে তত সে সোনা থাকছে না, অতীশ দীপঙ্কর

হয়ে যাচ্ছে। সে ফতিমার খোঁজে তাড়াতাড়ি মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল। দেখল ফতিমা নেই। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

বৃষ্টির ফোঁটা এবার বড় হয়ে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটল। টিলা ধরে বাড়ির সীমানায় উঠে দেখল, কচুর ঝোপে আবার পুতুলনাচ হচ্ছে। রাম-রাবণ-সূর্পণখা। সে মুখ ভেংচে দিল সূর্পণখাকে। শুধু রাম-রাবণ এখন কচুর ঝোপটায় যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। ওর মন ভাল নেই বলে কচুর ঝোপে বৃষ্টির ফোঁটায় রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে থাকল।

ঈশম আবার ডাকল, কি করতাছেন কচুর ঝোপে!

সোনা জল ভেঙে উঠোনে উঠে এল। ঈশম দক্ষিণের ঘরে চলে গেছে। সে এখন একা। কেউ নেই চারপাশে। রান্নাঘরের শেকল তোলা। ছোট্ট ঘরটার চারপাশে কত বড়-বড় সব সোনা ব্যাঙ। ওরা মুখ তুলে কেবল ডাকছে। তুমুল আর্তনাদের মতো মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দ, এবং কীটপতঙ্গের ডাক। অজস্র বেতপাতা ঘরটার চারপাশে। ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ বের হচ্ছে। পিরের বোয়াল গেছে, মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ফতিমা নেই, মা ছোট ঘরটায় চুপচাপ আগুন জেলে শুয়ে আছে। ওকে আজ মেজদার সঙ্গে একা থাকতে হবে। একা থাকতে হবে ভয়ে ওর এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল।

তখনই মনে হল ছোট্ট ঘরটায় মা, ভীষণ কষ্টে গোঙাচ্ছে। মার মুখ নীলবর্ণ। বড় জেঠিমার গলা সে পাচ্ছে। নাপিতবাড়ির জেঠি কথা বলছে। আবুর মা হারান পালের বৌ ঘরের ভিতর কি যেন করছে। মার কষ্টের আওয়াজটা কিছুতেই থামছে না। তার মতো অথবা মেজদার মতো মা আবার একটা ভাই ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে। সে যে এখন এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না। পলোটা ফেলে দিল উঠোনে। এবং মা, তার মা, পুজোমণ্ডপের মা ছোট্ট ঘরটায় কি করছে এখন! সে স্থির থাকতে পারছে না। চুপি চুপি সে ছোট ঘরটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। পিরের বোয়াল ধরার সময় অথবা ফতিমা পাশে বসার মতো উত্তেজনায় ও কাঁপছে। ঠিক প্রার্থনা নয়, ঠিক কষ্ট নয়, ঠিক অন্য কিছু হচ্ছে এই সংসারে যা সে এতদিন জানতে পারে নি। সে চারপাশে যখন দেখল কেউ নেই, বেড়ার ফাঁকে গোপনে মুখ গুঁজে দিল।

তারপর, তারপর সোনার এই সংসার জগৎময় বিশ্বময় পাক খেতে থাকল।

সে চোখের ওপর এসব কি দেখছে! সে আশ্চর্য, না কি সে ক্রমে বোবা হয়ে যাচ্ছে! তার মা, তার একমাত্র মা, জগতে যার নাই তুলনা, মরা সাপের মতো অথবা ধাড়ি বোয়ালের মতো পেট উঁচু করে পড়ে আছে। বড় জেঠিমা, নাপিতবাড়ির জেঠি, হারান পালের বৌ সবাই খোলা পেটের ওপর উবু হয়ে আছে। ওর এবার সহসা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল—মা! গলার রগ ফুলে উঠছে তার। পুজোর সময় বাবুদের বাড়ি পাঁঠা বলি হয়—ছাল তুলে নেওয়া বলির পাঁঠার মতো মাকে দেখতে। বীভৎস। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এ যেন তার মা নয়, সে তার এ-মাকে চেনে না। কারণ তখন পৃথিবীতে আর এক ঈশ্বর নামছিলেন। নাপিতবাড়ির জেঠি তিনবার উলু দিতে বলছে। সবাই একটা জীবের পাশে দাঁড়িয়ে উলু দিচ্ছে। সোনা সেই ঈশ্বরকে দেখল। সে ওর জন্ম দেখল এবং নিজের জন্মের কথা ভেবে সে কেমন বেদনায় মূক হয়ে গেল। জল ভেঙে সে দক্ষিণের ঘরে উঠে গেল চুপচাপ। তেমনি বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায়। ঈশম বৃষ্টির শব্দ শুনছে দরজায় বসে। পাগল জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি এসব দেখে তিনি কেমন উদ্‌বিগ্ন। সোনা জলে ভিজে শীতে কাঁপছে। শশিভূষণ ওর গামছা দিয়ে শরীরের জল মুছে দিল। বলল—তোর একটা বোন হয়েছে সোনা।

সোনা কথা বলতে পারছিল না। শীতে থরথর করে কাঁপছিল। শশিভূষণ চাদর দিয়ে ওর শীত নিবারণের চেষ্টা করছে। সোনা তক্তপোশের ওপর বসে স্থবিরের মতো চোখ মেলে তাকাল বাইরে। ভয়ঙ্কর কঠিন কিছু দেখে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই পর্যন্ত ওর এমন মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।

সোনা একা জানালার পাশে চাদর গায়ে বসে থাকল। ক্রমান্বয় বৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমান্বয় কচুর পাতায় পুতুলনাচ হচ্ছে। সব হয়ে যাচ্ছে একভাবে। বৃষ্টি, বজ্রপাত, পুতুলনাচ এবং জীবের জন্ম, সব একভাবে হয়ে যাচ্ছে। গাছের গুঁড়িতে কাগজের বিন্দু বিন্দু নৌকা মাছ হয়ে গেল। পুজোমণ্ডপের মা আর মা থাকল না। কেমন একটা মরা সাপ হয়ে গেল। সে আর এই মাকে কাছে নিয়ে শুতে পারবে না। কেমন এক দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষের শরীরে, মাকে ছুঁতে গেলেই তার এমন মনে হবে। সে এবার ভীষণ কষ্টে দু'হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে দিল। মার নীলবর্ণের মুখটা কিছুতেই আর মনে করতে পারল না। কেবল সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

জানালা খোলা। কামরাঙা গাছের অন্ধকারে কিছু জোনাকি জ্বলছে। বেতঝোপ পার হলে মাঠ। মাঠ আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না। বড়বৌ সেই সাদা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়েছিল, না ঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল বোঝা যাচ্ছে না। গলায় চন্দ্রহার পরেছে বড়বৌ। নীল রঙের বেনারসী পরেছে। হাতে চূড়। চোখে বড় করে কাজল টেনেছে। মুখে স্নিগ্ধ প্রসাধন। মানুষটা যদি আসে, এই আশায় দরজা খোলা রেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালে এ-বাড়িতে কিছুটা উৎসবের মতো ঘটনা ঘটেছে। কারণ ভূপেন্দ্রনাথ দু'জন মানুষ নিয়ে এসেছিল। ওরা সন্ন্যাসী মানুষ। ওরা এ-বাড়িতে সারা রাত ধুনি জালিয়ে বসেছিল। এবং পাগল মানুষকে নিরাময় করার জন্য অপার্থিব সব ঘটনা ঘটিয়ে বাড়ির মানুষদের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল। ওদের ভোজনের নিমিত্ত নানাবিধ পায়েস হয়েছে। বড়বৌ সারাদিন খেটে স্বামীর শুভ কামনায় রাত হলে নিজের ঘরে চলে এসেছে। তিনি এখনও আসছেন না। এলেই দরজা বন্ধ করে দেবে বড়বৌ। শীতকালটা অন্যবার বেশ শান্ত থাকেন। এবারে তাও না। আজকাল রাত হলে বড়বৌ নানাভাবে সাজতে থাকে। যে যে চেহারায় ওকে বিদেশিনী মনে হতে পারে সে তা করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বড়বৌ একেবারে অন্য জগতের ভিতর ডুবে যায়। সে যেন তার স্বামীকে নিয়ে পুতুল খেলতে বসে। সেই ছোট্ট বয়সের মুখ-চোখ তার চারপাশে খেলা করতে থাকে তখন। খেলা করতে করতে কবে সে প্রথম এ-মানুষের সঙ্গে সহবাসের আনন্দ পেয়েছে এমন ভাবে। বোধহয় সেটা এক বসন্তকালই হবে, এবং বোধহয় আকাশে সেদিন আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না ছিল।

কেন জানি বড়বৌর, আজ ঠিক সেই দিনটি, এমন তার মনে হল। সে জানে এখনও মানুষটা দক্ষিণের বারান্দায় বসে রয়েছে। না ডাকলে বোধহয় আসবে না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল বারান্দায় একটা হারিকেন জ্বলছে। তবু ভারি লজ্জা করছে এই সাজে উঠোনে নেমে যেতে। প্রায় অভিসারে যাবার মতো। গেলেই তিনি উঠে পড়বেন। তাঁর মনে হবে তখন বড়বৌ তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায়। এ-সব ভাবতে বড় ভাল লাগে। সে নেমে যাবে কিনা ভাবছিল, তখন দেখল তিনি হেঁটে এদিকে আসছেন। তাড়াতাড়ি

বড়বৌ জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মানুষটার জন্য যে তার প্রতীক্ষা, তিনি না এলে যে বড়বৌর অভিমানে চোখে ঘুম আসে না এমন বুঝতে দিতে চাইল না। সে শক্ত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মানুষটা এসেই আজ কেমন পাগলের মতো বড়বৌকে জড়িয়ে ধরল। দরজা খোলা। কেউ দেখে ফেলতে পারে। দরজা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। কিন্তু এমন যে আবেশ মানুষটার যদি তা হারিয়ে যায়, দরজা বন্ধ করতে গেলে তিনি যদি রাগ করেন, অথবা পাগলের মতো চোখ-মুখ আলগা করে রাখেন তবে এ-রাতের নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে এমন কি মুখ ঘুরিয়ে মানুষটকে দেখল না। ওর ঘুম চলে আসছে। মানুষটা এখন নীল রঙের এমন সুন্দর শাড়িটা টেনে খুলে ফেলল। ফের হুঁশ হল বড়বৌর। দরজা খোলা। তবু সে দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেল না। মানুষটা এখন যা খুশি করুক। অন্যদিন এই মানুষই দরজা বন্ধ করলে ক্ষেপে যায়। হঠাৎ হঠাৎ টেবিল ঠেলে ফেলে দেয়। থাম ধরে ধরে ঝাঁকাতে থাকে। কখনও কখনও টেবিলে ঘুষি মেরে সব কাচের বাসন ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর এক প্রলয়-নাচন নাচতে আরম্ভ করলেই বড়বৌ ডাকে, ঠাকুরপো, ও, ছোট ঠাকুরপো! দেখুন এসে কি আবার আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীতু মানুষের মতো মণীন্দ্রনাথ খাটের ওপর উঠে লেপের ভিতর ঢুকে যায়। যেন কিছুই সে করে নি। সে বড় ভাল ছেলে। আর সেই মানুষ কি যে করছে তাকে নিয়ে! বসন-ভূষণ খুলে ফেলছে। আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় যেন স্বপ্নের মতো ঘটনা। এমন ভালবাসা সে কতদিন চেয়ে চেয়ে তবে পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে বড়বৌ অস্থির হয়ে পড়ছিল। দু'হাতে যা খুশি করুক এমন ইচ্ছাতে বড়বৌ শরীর খাটে বিছিয়ে দিল। নরম শরীর, স্তন এবং কোমল হাত এবং কোথায় যেন প্রপাতের মতো জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, সে ঠেলে সেই মানুষকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মানুষটা যেন প্রপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না—কি যে করণীয় এই শরীর নিয়ে বুঝতে পারছে না যেন। মানুষটাকে এবার জোরে চুমু খেল। এবং পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়তেই মণীন্দ্রনাথ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। মণীন্দ্রনাথ খাট থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ালেন।

বড়বৌ বলল, এই শোন। আমি আর এমন করব না।

মণীন্দ্রনাথ শক্ত শরীরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—আমি কিছু করব না বলছি। এস আমার পাশে শোবে।

মণীন্দ্রনাথ সাদা জ্যোৎস্না দেখছেন এখন।

—তুমি আমার পাশে শুধু শোবে। বলে হাতটা নিয়ে বুকের ভিতর খেলা করতে থাকল।

দরজা খোলা। সে দরজা বন্ধ করে দিল এবার। এবং জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

ঘরে মৃদু আলো জলছে। একটা পাখি ডাকছিল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলি পাখি ডেকে উঠল। ভিতরে বড় কষ্ট বড়বৌর। মানুষটা এমন পাহাড় বেয়ে ছুটতে পারে, আবেগে ডুবে যেতে পারে—তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে যেন স্বপ্ন দেখে উঠে এসেছে। সব বৃথা। কারণ কতভাবে—বড়বৌ যে চেষ্টা করছে! এই গ্যাখো আমার শরীর, এই গ্যাখো নীল শিরা উপশিরায় কি প্রসন্ন আলো খেলা করে বেড়াচ্ছে। তুমি একটু ছুঁয়ে গ্যাখো, মনে হবে তোমার, দীর্ঘদিন তুমি বনবাসে ছিলে। গ্যাখো এই চোখ, মুখ। তুমি আমার কপালে হাত রাখো। আমি তো তোমার কাছে কিছু চাই নি। কিছু চাই নি! কেবল তুমি যদি একবার আমাকে অপলক দেখতে। আমার মনে হয় তবে তুমি এমনভাবে গ্রামে মাঠে ঘুরে বেড়াতে না। আমাকে আর একবার জড়িয়ে ধর না গো। আমি কিছু করব না। সত্যি বলছি। তিন সত্যি।

মানুষটা বড়বৌকে কিছুতেই আর স্পর্শ করল না। চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা আর রক্তমাংসের পৃথিবীতে নেই। ফোর্টের গম্বুজে সে জালালি কবুতর উড়ছে দেখতে পাচ্ছে।

বড়বৌ ডাকল, শুনছ!

সে কিছুই শুনছে না। নদীর জলে সে শুনতে পাচ্ছে শুধু ঝমঝম শব্দ। জাহাজের প্রপেলার ঘুরছে। কিছু অপরিচিত পাখি মাস্তলে। রেলিঙে সেই সোনার হরিণ দাঁড়িয়ে। হাত দিলেই যে দূরে হারিয়ে যায়। কাছে যা কিছুতেই পাওয়া যায় না। পলিন রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বড়বৌ বলল, আমি সত্যি বলছি কিছু করব না। তোমার যা খুশি যেমন-ভাবে খুশি আমাকে নাও।

বড়বৌ বড় অবুঝ হয়ে গেছে। চোখ দেখলেই সব টের পাওয়া যায়। সে

কেন যে এমন করছে তবু, সে কেন বুঝতে পারছে না মানুষটা আর মানুষ নেই। মানুষটার ভিতর নদীর নীল জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

বড়বৌ এবার হাত ধরে খাটে নিয়ে যেতে চাইল তাকে। সে গেল না। সে জানালার একটা পাট বন্ধ করে দিল। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের বসন-ভূষণ সব আলগা করে ছুঁড়ে ফেলল খাটে। শেষে কি দেখল বড়বৌর মুখে। মুখ দেখে হাসল। দুষ্টু বালকের মতো হাসিতে মুখ ভরে গেল। যেন বলল, এস, আমরা সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে হেঁটে নদীর চরে চলে যাই। কেউ দেখবে না। আমরা চুপি চুপি সেখানে দু'জনে পালিয়ে বসে থাকব। আকাশের নিচে সাদা জ্যোৎস্নায় দু'জনে বসে থাকতে কি যে ভাল লাগবে না!

বড়বৌ কিছু বুঝতে পারল না। কেন এমন সরল বালকের মতো তিনি হাসছেন। সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তখনও হাসছেন। হাসতে হাসতে দরজা খুলে ফেলছেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল। মানুষটা উঠোনে নেমে যাচ্ছে। কি হবে এখন! বড়বৌ তাড়াতাড়ি সেই বেনারসী শাড়িটাকে কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে নিল। পাগল মানুষের কাপড়টা খাট থেকে তুলে নিল। এই মানুষ এমন এক অবয়বে বের হয়ে গেলে কবে ফের ঘরে উঠে আসবে কে জানে! লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাবে। অন্তত কাপড়টা পরিয়ে দিতে পারলে মানুষটাকে আর পাগল মানুষ মনে হবে না। নিরীহ মানুষ, অবলা জীবের মতো তার চোখ তখন। গ্রামের পর মাঠ, মাঠে মাঠে তিনি এক সন্ত পুরুষের মতো হেঁটে যাবেন।

বড়বৌ উঠোনে নেমে দেখল ধীরে ধীরে বাঁশতলা দিয়ে তিনি নেমে যাচ্ছেন। সে শেকল তুলে দিয়েছিল ঘরের। শেকল তুলে চারপাশে তাকাল। কোন ঘরে আলো জ্বলছে না। কোন সাড়াশব্দ নেই। একবার ভাবল শচীন্দ্রনাথকে ডাকে, উঠে দেখুন, কিভাবে বের হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু নিজের প্রসাধনের কথা ভেবে ডাকতে সংকোচ বোধ করল। বরং সে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে, দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালে আর তিনি নড়তে পারবেন না।

কুয়োতলায় এসে দেখল মণীন্দ্রনাথ দ্রুত মাঠে নেমে হাঁটছেন। সেও মাঠে নেমে এল। স্বামী তার এমন বেশে গ্রামে মাঠে ঘুরে বেড়াবে ভাবতেই কান্না পাচ্ছে। সে, যে করে হোক কাপড়টা পরিয়ে দেবে। তারপর যেমন খুশি, যেদিকে খুশি তিনি চলে যাবেন। সে মানুষটার সঙ্গে মাঠের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল।

বসন্তের মাঠ। ফসল নেই। শুধু কিছু জমিতে পেঁয়াজ রসুনের গাছ, লঙ্কা গাছ। চারপাশে জমির বেড়া। মাঠে নেমেই মনে হল মানুষটা কোথাও যেন তার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কেবল ছুটে নাগাল পাচ্ছে না। সে দেখল তখন তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বড়বৌকে মাঠে নেমে আসতে দেখে বুঝি সামান্য বিস্মিত হয়েছেন। বড়বৌ জমির ওপর দিয়ে ছুটছে। ছুটে ছুটে আর পারছে না। হাঁপিয়ে উঠছে। কাছে গিয়ে সে কথা বলতে পারছে না। তুমি এ-ভাবে বের হয়ে গেলে লোকে কি বলবে! এসব বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে যাচ্ছে।—লক্ষ্মী, কাপড়টা পরে নাও। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এমনও বলার ইচ্ছা। কাপড়টা বড়বৌ পরিয়ে দেবে, পরিয়ে দিলেই সোনার হরিণের খোঁজে অথবা নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে বের হয়ে যাবেন। এমন এক সুদৃশ্য শরীরে টান টান হয়ে দাঁড়ালে, বড়বৌর আর ভয় থাকবে না। ভাবল, কাপড়টা পরিয়ে দিয়েই বলবে, হ্যাঁ গো, আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে না। একা আমি যাব কি করে!

সে কি ভাবল আর কি হয়ে গেল! হতভম্ব সে। ভেবেছিল কাপড় পরিয়ে দিলেই মানুষটা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। তাকে এত বড় মাঠে একা ফেলে যাবেন না। কিন্তু মানুষটার চেহারা অন্যরকম। বড় বেশি হাসি হাসি মুখ। তিনি এক টানে বড়বৌর কাপড় খুলে ফেলেছেন। খুলে ফেলেই একেবারে বালক। বালকের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসছেন। কুয়াশার ভিতর মাঝে মাঝে মুখ তাঁর অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় একটু একটু কুয়াশার ভিতর এক রহস্যজনক ভাব তাঁর মুখে। বগলে কাপড় নিয়ে চিরদিনের তীর্থযাত্রীর মতো তার যেন ভ্রূক্ষেপহীন যাত্রা। বড়বৌকে এসব ভীষণ আড়ষ্ট করে দিল। কিছু সে বলতে পারল না। খেলাচ্ছলে তিনি যেন এমন সব করছেন। দূরে দূরে সব বন মাঠ, সাদা জ্যোৎস্না এবং হালকা কুয়াশা দেখে তিনি বড়বৌকে নিয়ে স্থির থাকতে পারছেন না। কেবল ছোটার ইচ্ছা তাঁর। কোথাও সেই যে তিনি একটা নীল বর্ণের লতা নিয়ে এসেছিলেন কলকাতা থেকে, যেখানে ঈশম নদীর চরে একা রাত যাপন করে, এবং এক নীল বর্ণের লতা থেকে কত হাজার নীলবর্ণ লতা ফুল ফল সৃষ্টি হচ্ছে এখন—তেমন জায়গায় তাঁর চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কিছু ভাল লাগছে না তাঁর। তিনি যখন কলকাতা থেকে শেষবারের মতো ফিরে এলেন, সঙ্গে সব নানারকমের গাছ ছিল তাঁর। এখন আর মনে

করতে পারছেন না কি গাছ সে-সব। কি লতা সে-সব। কেবল মনে পড়ছে, একটা নীলবর্ণের লতা ছিল। সবাই সেটা ফেলে এসেছিল গয়না নৌকায়। কেবল ঈশম তুলে এনে চরের জমিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। যখন কিছু ভাল লাগত না, তিনি তখন নদীর চরে নেমে লতার গোড়ায় সারা বিকেল জল ঢালতেন। এই মাঠে নেমে বড়বৌর আড়ষ্ট মুখ-চোখ দেখে তাঁর সে-সব মনে পড়ছিল।

বড়বৌ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সে বলল, দাও লক্ষ্মী। আমার কাপড়টা দাও।

আমরা কোথাও যাব বলে বের হয়েছি। সংসারে কোথাও যাব বলে বের হলে ফিরতে নেই।

—তুমি কি চাইছ বল! কি পেলে তুমি সুখী হবে বল, সব দিচ্ছি। আমি চলে যাব এ-দেশ ছেড়ে। আমি চলে গেলে সুখী হবে! বল তুমি। তুমি যা বলবে আমি তাই করব!

এ-ভাবে কিছু হয় না। আমরা শেষপর্যন্ত কিছু করতে পারি না। তবু হাঁটি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হই। মনে হয় সামনেই একটা সরাইখানা আছে। একটা অদৃশ্য সরাইখানার পিছনে সবাই আমরা ছুটছি।

—কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলতো! মান-সম্মান কোথায় থাকবে। তোমার বৌ আমি। কেউ দেখে ফেললে কত বড় অসম্মান হবে বলতো।

জীবনের নানারকমের খেলা আছে। লাল নীল বল নিয়ে তেমন একটা খেলা। কোনটা যে কি রকমভাবে চোখের ওপর ফেঁসে যাবে জানি না। তবু খেলি। মনে হয় খেলার মাঠে জয়-পরাজয় হবে। এবং খেলার মাঠ পার হয়ে এলে একটা সেতু দেখতে পাই। সেতুর ওপর একজন ফকির মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। যে বলটা ছিল আমাদের খেলার বস্তু, সেই বলটা ফকির সাহেবের প্রাণ মনে হয়।

—শোন, এ-ভাবে আমাকে কতদূর পিছু পিছু নিয়ে যাবে। তুমি কি ভেবেছ। আমরা টোডার বাগের কাছে চলে এসেছি। ছিঃ ছিঃ, কি বিপদে আমাকে ফেললে বলতো। সামনে নদী। নদীর চর। একটু দূরে তরমুজ খেত। তুমি আমার মান-সম্মান রাখলে না। দাও। কাপড়টা দাও। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। কি করে ফিরব! এত বড় মাঠ পার হয়ে যাব কি করে।

মাঠ কেউ পার হতে পারে না বড়বৌ। পার হব বলে সবাই বের হয়ে পড়ি। তারপর রাতদিন ক্রমান্বয় হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বিষণ্ণ। কোথাও কোন জলছত্রের কাছে তারপর নিরিবিলি বসে থাকা। কেউ আমাদের বলে দিতে পারে না কতদূর গেলে এই মাঠ শেষ হবে। শুধু জলছত্রের মানুষটি তোমাকে জলদান করবে আর বলবে, জল খেলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সামনে যে বন আছে, তার ওপারে একটা কদম ফুলের গাছ পাবে। সেখানে আমার মতো আর একজন মানুষ জলছত্র খুলে বসে রয়েছে। মাঠ পার করে দিতে কেউ পারে না বড়বৌ। আমরা সবাই ইচ্ছা করলে শুধু তেষ্টার সময় জলদান করতে পারি। আর কিছু পারি না।

—তুমি কি কিছু বলবে না। নদীর চরে তোমার কি আছে। তুমি ওদিকে হাঁটছ কেন! আমি তোমার সঙ্গে জোর করে কিছু ফিরে পাব না জানি। আমাকে এ-ভাবে কেউ দেখে ফেললে ঠিক আত্মহত্যা করব বলছি।

এবারে পাগল মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শাড়িটা বগল থেকে বের করে বড়বৌর হাতে দিলেন। তারপর হাঁটতে থাকলে সহসা কেন জানি বড়বৌর মনে হল, মানুষটার অভিমানে বুক ফেটে যাচ্ছে। এই সাদা জ্যোৎস্নায় তিনি তাকে নিয়ে হয়তো এমনি হাঁটতে চান। এবং কেন জানি ওর মনে হল—আর সে একা ফিরে যেতে পারবে না। এক অত্যাশ্চর্য মায়া এখন এই নিরিবিলি সাদা জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশার ভিতর। বড়বৌ মানুষটার পিছু পিছু হেঁটে গেল। নদীর চর, চরের পারে ছইয়ের ভিতর ঈশম ঘুমোচ্ছে। ওরা দু'জন চুপচাপ নদীর চরে বসে থাকলে কে আর টের পাবে। কুয়াশার ভিতর সবই অস্পষ্ট এবং মায়াজালে ঢাকা। বড়বৌ তার পাগল স্বামীকে নিয়ে নির্জনতায় ডুবে গেল। বলল, আমার কে আছে। তুমি বাদে আমার আর কি আছে!

ঈশম খকখক করে কাশছিল। কাশির জন্য সে ঘুমোতে পারছে না। খুব বেশি কাশি পেলে সে উঠে তামাক খায়। তার হুঁকা-কলকি এবং পাতিলে আগুন সব ঠিকঠাক। এখন রাত ক'প্রহর সে টের পাচ্ছে না। ছইয়ের বাইরে এলে সে আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে টের পেত—রাত ক'টা বাজে। অথবা সে চুপচাপ শুয়ে থাকলে টের পায়—ক' প্রহর রাত। প্রথম প্রহর ঠাকুরবাড়ির

আরতির ঘণ্টা বাজে, দক্ষিণের ঘরে আলো জ্বালা থাকে। যে-সব খরগোশ হাসান পীরের দরগা থেকে বের হয়েছে নদীর চরে আসবে বলে, তরমুজের পাতা ওদের বড় প্রিয়, তারা প্রথম প্রহর শেষে জমির আলে এসে পড়লে টের পায় ঈশম ওরা আসছে। সে কান পেতে রাখলে টের পায়—ওরা খরগোশ না সজারু। সে এখন খুব কাশছে বলে টের করতে পারছে না, সজারু কি খরগোশ, খাটাশ না শেয়াল—কারা এসে আলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাত গভীর হলেই ওরা চুপি চুপি ঢুকে পড়বে জমিতে, ঈশম ওদের তাড়ানোর জন্য টিনের ডঙ্কা বাজায়। প্রহর শেষ হলেই সে ডঙ্কা বাজায়। আর তখন যত এইসব খরগোশ, খাটাশ অথবা শিয়াল সজারু সব ছুটতে শুরু করে নদীর দিকে।

তখন ওর মনে হয় কে যেন হাঁকছে নদীর চরে—কে জাগে?

—আমি আল্লার বান্দা ঈশম জাগি। সে খালি মাঠে চিৎকার করে বলে।

এই নদীর চর, সাদা জ্যোৎস্না, বড় বড় তরমুজ এবং নদীর জল তার কাছে তখন এক বেহস্তের সামিল। সে হাতে তালি বাজায়। চুপচাপ এই নিশীথে ধরণী কি শান্ত। কেবল সব নিশীথের জীবেরা আহারের অন্বেষণে বের হয়েছে। সে টের পাচ্ছে না তারা কতদূর এসে গেছে। সে উঠে বসল। তামুক না খেলে তার কাশি কমবে না। সে ছইয়ের বাতা থেকে কলকি টেনে নিল। তামাক ভরে খড়কুটো জেলে সামান্য আগুন নিল কলকিতে। ওর কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে যেমন অন্যদিন তরমুজের জমিতে একা নিশীথে দাঁড়িয়ে তামুক খায়, পাখপাখালি অথবা বন্য জীব তাড়ায় তামুক খেতে খেতে, আজ তা পারছে না। কাশিটা ওকে বড় বেশি জব্দ করে ফেলেছে। সে তামুক খেতে খেতে টিনের ডঙ্কা বাজাল। ছইএর বাইরে কি সাদা জ্যোৎস্না! কালো কালো ঐ পাখির ডিম! চুপচাপ সেই ডিমের ওপর বসে-থাকা, তামুক খাওয়া, নদীর জল যেন কলকল করে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। সে-সব শব্দ শোনা বড় মনোরম। আর আকাশের অজস্র নক্ষত্র দেখতে দেখতে ঈশম যে বার বার কতবার এই জমিতে রাত কাবার করে দিয়েছে, একফোঁটা ঘুমায় না, এখন ঈশমকে দেখলে তা বোঝা যাবে না। আজ ঈশম এমন সাদা জ্যোৎস্না দেখেও ছইয়ের বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল না। সামান্য কুয়াশা নদীর পাড়ে পাড়ে। এই কুয়াশার ভিতর সে অস্পষ্ট এক ছবি দেখে চমকে উঠল।

সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে ভাবল, ওরা কারা এল! ওর তরমুজ খেতে এমন গভীর রাতে কারা আসতে পারে। তরমুজ চুরি করতে আসে যারা,

তাদের চাল-চলন অন্যরকম। সে দেখলেই টের পায়, মানুষেরা তরমুজ চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সে যে দেখছে তরমুজের ওপর ওরা নিবিষ্ট মনে বসে রয়েছে। দু'জন দু'মুখে। একজন পুবে, অন্যজন পশ্চিমে। ওরা যেন একটা তরমুজের উপর বসে পুব-পশ্চিম দেখছে। এবং ওরা যেন একেবারে শরীর নাঙ্গা করে রেখেছে—এই কুয়াশার ভিতরও যেন তা স্পষ্ট। কুয়াশা প্রবল নয়। হালকা। জমির ওপর নদীর পাড়ে কুয়াশা একটা পাতলা সিল্কের মতো বিছিয়ে আছে। সবুজ সব তরমুজের পাতায় শিশির জমেছে। আর দুই মানুষ, মনে হল একজন স্ত্রীলোক হবে, তা হউক, সংসারে কত জীব ঘুরে বেড়ায়, ওরা নিশীথে এই পৃথিবীর মায়ায় নেমে আসে, ওদের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা, অথবা বলা যায়, এমন নদীর পাড়ে তরমুজ খেতে নিশীথে নেমে আসতে না পারলে তাদের আত্মা বড় কষ্ট পায়।

তা তোমরা নেমে এসেছ জীবেরা, আত্মা তোমাদের কান্নাকাটি করছে, এই জমিতে সাদা জ্যোৎস্নায় বেড়াবার সখ তোমাদের, বেড়াও। আমি ঈশম আল্লার বান্দা চক্ষু বুইজা থাকি। দ্যাখি না কিছু। তোমাদের লীলাখেলা দেখতে নাই। সে এই ভেবে আর বের হল না ছইয়ের ভিতর থেকে। এমন মায়া এই গাছপালা পাখির, কেউ যেন তা ফেলে চলে যেতে চায় না। আবার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা। এবং তারা নিশীথে নেমে আসে।

ওর মনে হল সেও এই জমিতে আবার একদিন নেমে আসবে। তখন সে থাকবে না। তার আত্মা বিনষ্ট হবে কি হবে না সে তা জানে না। সে নিজ হাতে তৈরি করেছে এই মাটি, মাটির প্রতিটি খণ্ড অংশ। সে যেন মাটি হাতে নিলেই বলতে পারে চাষের সময় কত বাকি। কোন লতা এবারে জমিতে লাগালে বড় বড় তরমুজ হবে। সে তখন তার বড় বড় তরমুজ দেখতে নেমে আসবে। ঠিক মতো চাষাবাদ হচ্ছে কিনা, চাষাবাদ হলেও সে না এসে না দেখে থাকতে পারবে না।

অথবা তার মনে হল সংসারে কিছুই বিনষ্ট হয় না। কারণ যারা এই মাটিতে জন্মেছে, মরেছে এবং যারা এখন আকাশে বাতাসে ঘোরাফেরা করছে তারা এমন সুন্দর এক জগৎ দেখে স্থির থাকতে পারি নি। মানুষের অবয়বে এই তরমুজ খেতে নেমে এসেছে।

এবং এও সে ভেবেছে, দুই ফেরাস্তা, অথবা জীন পরী ঘোরাফেরা করছে এই জমিতে। সে ছইয়ের বাইরে বের হয়ে ওদের এমন লীলাখেলায় বাধার

সৃষ্টি করল না। এমন কি সে যে কাশছিল, তাও দম বন্ধ করে থামিয়ে রাখছে। ধীরে ধীরে তামাক টানছে। তামাক টানলেই বুকটা হালকা লাগে। কাশি কমে যায়। সে কাশি কমাবার জন্য তামাক খাঁচ্ছিল, আর দূরে ফেরাস্তার লীলাখেলা দেখছে। ঈশম নিশীথের মানুষ। দিনে তার ঘুম যাবার অভ্যাস। সে যৌবনে গয়না নৌকার মাঝি ছিল। তার মনে আছে, সে রাতে রাতে গয়না নৌকা চালাত। ওর গয়না নৌকা, বামন্দি, ফাওসার খালে খালে পরাপরদির নদীতে পড়ত। তারপর মহজমপুর হয়ে, আলিপুরার বাজার পার হয়ে মাঝের চর এবং পরে নাঙ্গলবন্দ, শেষে সকাল হতে না হতে নারাণগঞ্জের ইষ্টিমার ঘাটে নৌকা লাগিয়ে বসে থাকা। আবার সাঁজ নামলে মানুষ নিয়ে ফিরে আসা ঈশমের। সেই নিশীথের যাত্রা সুগম ছিল না। নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তি, ফাঁসির মানুষ ঝোলে কোথাও, পেঁচার আর্তনাদ বড় নিম গাছটার রাতে কি যে ভয়াবহ লাগে! একবার সে ফাওসার বিলে বড় শিমুল গাছের মাথায় আগুন জলতে দেখে পথ হারিয়ে ফেলেছিল—এই সবই এখন ঈশমকে নানা-ভাবে ভাবাচ্ছে। এই যে সে শিশু বয়স থেকে মাটির কাছাকাছি বড় হচ্ছে, সে পাইক খেলত, সামসুদ্দিনের বাপ ছিল তার শাগরেদ, ঠাকুরবাড়িতে তখন দুগ্‌গাঠাকুর আসত শরৎকালে। সামসুদ্দিনের হাত ধরে ওর বাপ আসত অষ্টমীর দিনে, আর পাইক খেলা, ছোট লাঠি হাতে ঈশম বুকের শক্ত পেশী তুলে দাঁড়ালে গ্রামের সব মানুষ ভেঙে পড়ত। ওর অসীম শক্তি ছিল তখন। লাঠি খেলায় সে সামসুদ্দিনের বাপকে কতদিন হারিয়ে দিয়েছে, দিয়েই ওরা দুই দোস্ত হাতে পায়ের কাদা যে যার মতো ধুয়ে ফেললে কে বলবে—কিছুক্ষণ আগে রক্তচক্ষু দুইজনের, দুইজনাতে লড়ালড়ি, কে মরে কে বাঁচে ঠিক থাকে না তখন।

আর ঠাকুর কর্তা পূজা বন্ধ করে দিলেন। সেই দিন, এক দুঃখের দিন বড়, বড় ছেলে পাগল হল, তিনি ঠাকুর নদীর জলে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন বারান্দায়, মা আমার তুমি তামাশা ছাখলা। পোলা আমার ভাল না হইলে তোমার পূজা কে দেয়। তিনি পূজা বন্ধ করে দিলেন। ঈশমের লাঠি খেলা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। সে মহরমের দিনে লাঠি খেলায় জুত পেত না। কি যেন সে দেবীর সামনে এত দিন দেখিয়েছে, পূজা বন্ধ বলে তার মনে ভয়, সে ভয়ে-ভয়ে আর হাওয়ায় লাঠি দোলাতে পারত না। কেবল যেন এক দেবী, মা জননী, ঈশমকে বলত, তুই আমাকে আর লাঠি খেলা দেখাবি না ঈশম। আমাকে নদীর জলে রেখে আসবি না!

দশমীর দিনে ওরা যখন নৌকা ভাসাত দুগ্‌গা প্রতিমা নিয়ে—কি যে বিজয়-উৎসব, সে তো তখন লাখের ভিতর এক। সে বড় নৌকোর বড় মাঝি। সে জানত প্রতিমা দুলবে কিনা, সে জানত স্রোতের মুখে নৌকা পড়ে গেলে দেবীর চালচিত্র উল্টে যাবে কিনা। সে হালে দাঁড়িয়ে হাঁকত, মার টান, দুই দিকে মাঠ, সামনে নদী, পানিতে শাপলা ফুল, মা জননী ভাইসা যায় জলে। এই ছিল ঈশম, সে কতবার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবীর তরবারি জল থেকে ডুবে-ডুবে তুলে এনেছে। তরবারি, শঙ্খ, গদা-পদ্ম, সব সে এক-এক করে তুলত। কারণ প্রতিমা জলে উপুড় হয়ে ভাসত। সে ডুবে-ডুবে মাছের মতো গিয়ে তুলে আনত। কারণ বাড়ি গেলে দোস্তের বেটা সামু জেগে বসে থাকবে। যতক্ষণ এই তরবারি সামুকে না দিতে পারবে, ততক্ষণ মনে তার শান্তি থাকে না। একবার কর্তা ঠাকুরের কোন আত্মীয় এসেছিল, সে বিসর্জনের আগেই সব খুলে নিতে চেয়েছিল। কারণ বাবুর সখ, ছেলেপুলের হাতে তরবারি, চক্র এবং সেই লম্বা টিনের পাতে তৈরি ত্রিশূল দিয়ে দেবেন। নদীর জলে ডুবে গেলে তুলে-আনা যাবে না।

কিন্তু ঈশম হেসে বলেছিল—কি কইরা হয়। জননীর গায়ে হাত দিতে নাই। পানিতে জননীরে না ভাসাইলে কার হিম্মত দেবীর গায়ে হাত দেয়।

সেই আত্মীয়, এমন এক চাকর মানুষের মুখে এত বড় কথা শুনে হেঁকে উঠেছিল, কেরে বেটা তুই। দুই দিনের মানুষ, ভাতেরে কস অন্ন।

ঈশম বলেছিল, কর্তা, অত সোজা না। আমার নাম ঈশম। দেবীর গায়ে হাত ছান ত ছাখি।

লাগে মারামারি আর কি! ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ ওরা কত ছোট তখন। মণীন্দ্রনাথ মাত্র শৈশবের মানুষ। মণীন্দ্রনাথ বলেছিল, মামা, তা হয় না। সংসারে এমন নিয়ম ছিল তখন। ঈশম পূজার ক'দিন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ রাখত। পূজার ক'দিন তার নানাভাবে কেটে যাবে। সে-সব দিনে সে ভাবতেও পারে নি, ঠাকুরবাড়ির এই উড়াট জমিতে কখনও বড়-বড় তরমুজ ফলবে। সে যদি তখন থেকে এই জমিতে এসে নামতে পারত, জমির চেহারা কত পাল্টে যেত আরও। বড় সে দেরি করে ফেলেছে। কত সে আত্মার বিচিত্র লীলা দেখতে পেত। অথবা তার সেই সব ফেরাস্তারা, কে যে নেমে এসেছে এখন সে টের পাচ্ছে না। সে চুপচাপ ছইয়ের নিচে বসে দেখতে পাচ্ছে ওরা এখন বালিয়াড়িতে কি একটা বিছিয়ে দিল। প্রায় মন্ত্র পাঠের মতো জোরে-জোরে কি

সব বলছে। যেন প্রায় কেউ নদীর জলে দাঁড়িয়ে কোরান শরিফ পাঠ করছে। অথবা মনে হয় নদীর জলে কেউ তর্পণ করছে। গুরুগম্ভীর আওয়াজ, আকাশ বাতাস মথিত করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। বৃদ্ধ ঈশম চুপচাপ দেখতে-দেখতে এমন ভাবছে। সে আরও ভাবছে কিছু, সে মনে করতে পারছে না, সেটা কোন সাল, কোন সালে বড়কর্তার বিয়ে হল। বিয়ের বছরই তিনি পাগল হলেন, না পরে! বিয়ের পর তিনি সাত-আট মাস এখানে ছিলেন না। চাকরিতে গিয়ে সাত-আট মাস নিজের এই পাগলামি রোখার চেষ্টা করেছিলেন। সরকারী চাকরি, কত দিন আর পাগলামি করে রাখা যায়। সেবারেই তিনি ঘরে ফিরে আসেন, নানা রকমের লতাপাতার ডাল এবং মূল নিয়ে আসেন। অদ্ভুত মানুষের ইচ্ছা। সবাই ওকে আনতে গেল, ফাওসার খালে গয়না নৌকা লেগে আছে। ঈশম নৌকা বেঁধে বসে রয়েছে। এত গাছপালা, বিচিত্র সব গাছ, সে জানেও না কোনটা কি গাছ। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে লোক আনিয়েছে সে। যারা এসেছিল তারা দেখল মণীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সব বিদেশী লতা এবং মূল নিয়ে এসেছেন। তার ভিতর ছোট একটা পাইন গাছ, কিছু ঝাউ জাতীয় গাছ, এবং একটা তরমুজের লতা। বুড়োকর্তা নিজে এসে যখন এমন দেখলেন, চোখ ফেটে তার তখন জল আসছিল। একেবারে মাথাটি গেছে। কিছু নেই সঙ্গে। শুধু কিছু গাছপালা এবং কীট-পতঙ্গ নিয়ে ফিরেছেন।

নৌকা খালি করে সব তুলে নিয়ে যেতে হল। না নিলে মানুষটা ঘরে ফিরবে না, কেবল অলক্ষ্যে যা-কিছু ফেলে দেওয়া যায়। ওরা অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচি সব কীট-পতঙ্গ মাঠে ছেড়ে দিয়েছিল। কিছু ফুলের ডাল, যেমন বোগেনভেলিয়ার ডাল, ম্যাগনোলিয়ার শাখা এবং নানা জাতীয় ঝাউ গাছের চারা টবে ওরা বাড়ি এনে হাজির করেছিল। ঈশম নৌকা সাফ করতে গিয়ে দেখল একটা লতা, এ অঞ্চলে তরমুজ হয় না, ক্ষিরাই হয়, ওর মনে হয়েছিল ওটা ক্ষিরাই-লতা। কিন্তু নীল-নীল আভা, এবং পাতাগুলো বিচিত্র রঙের। সে ওটা নিয়ে গয়না নৌকার গোরাফি ফেলে উঠে এসেছিল। এসে বলল, ঠাইনদি এডা রাখেন। এডা একডা লতা। কি লতা ছাখেন।

সবাই দেখল। বড়বৌ কেবল দেখল না। সে বিছানায় পড়ে তখন নাবালিকার মতো কাঁদছে। শিয়রে শচীন্দ্রনাথ বসে ছিল। দক্ষিণের ঘরে মানুষজনের ভিড়। ভূপেন্দ্রনাথ সবাইকে ভিড় করতে বারণ করছে। তরমুজের লতাটা কেউ ভালভাবে দেখল না। একটা বিষাদ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে।

কেউ এ-নিয়ে কিছু বলছে না। সে লতাটা ফেলে দিতেও পারছিল না। কি যে করে এখন—সে ভাবল যেখানে নদীতে চর জেগে উঠেছে, এবং উড়াট জমি, কিছুই ফলছে না, বালি জমিতে কোন চাষাবাদ হয় না, সেখানে এই লতা রোপণ করে রাখলে হয়। যদি ক্ষিরাই হয়, তবে মাস না ঘুরতেই ফুল ফুটবে। হেমন্তকালেই লতা লাগানো হয়। সে বড় নৌকার মাঝি, এবং দায়ে-আদায়ে সে বাড়ির মানুষের সামিল, তার কিছুতেই লতাটা ফেলে দিতে ইচ্ছা করল না। সে নদীর চরে নেমে খুব যত্ন করে গাছটা রোপণ করল। চারপাশে মাঁদারের ডাল দিয়ে বেড়া দিল। এবং প্রতি সন্ধ্যায় সে এসে দেখতে পেত, গাছটা ক্রমে বড় হচ্ছে—কি গাছ অর্থাৎ কি লতা এটা, কি ফল দেয়, কোন মাসে ফল ধরে, নাকি কোন বন্য লতা, এসব দেখার এক অতীব বাসনা ঈশমের। সে গয়না নৌকা নিয়ে এলেই, ফাওসার খালে গোরাফি ফেলে উঠে আসত। সে বিবির কাছে প্রথম উঠে না গিয়ে এই গাছটার পাশে দাঁড়াত। বড় বেশি সজীব এই গাছ। সে দেখল কি সুন্দর লতা ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে। সে একদিন এসে দেখেছিল গাছটায় পাগল ঠাকুর নদী থেকে জল এনে দিচ্ছে। এবং হলুদ রঙের ফুল ফুটলে সে দেখল গোড়ায় তার কালো রঙের ফল। কুমড়ো নয়তো আবার! না তা হবে কেন। সে সব জানে, গাছ চেনে, শুধু এ-গাছটা চেনে না। বিবি তার মাঝে-মাঝে বিরক্ত হত। কি এত আকর্ষণ সেই গাছে। সারাক্ষণ একটা লতা নিয়ে উড়াট জমিতে সে ডুবে আছে।

আর কিনা সেই বৎসরই দুটো বড় তরমুজ হল। তরমুজের লতা তবে এটা। ভিতরটা কি লাল! যেন চিনির রসে ভেসে যাচ্ছে ভিতরে। সে তরমুজ তুলে সব লতা কেটে-কেটে জাগ দিয়ে রাখল। এবং যখন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, দুই গরু নিয়ে সে হাল চাষে নেমে পড়ল। বুড়োকর্তা বললেন, তুই কি পাগল! জমিতে কিছু হয় না। উড়াট জমি। তর এই প্রাণপাতে কি কাজ। বলে তিনি বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন, অভাব-অনটনে ঈশম এবার কাজ চায়। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর মুরদ নাই শরীরে গয়না নৌকার দাঁড় বাইবার। সে এবার কাছে-পিঠে বিবির কাছে থাকার জন্য একটা কাজ চায়।

তিনি বললেন, তুই তবে বাড়িতে থাক। কাজ-কাম কর। তর বৌ-টার অসুখ। তারিণী কবিরাজের কাছ থাইকা অষুধ নিয়া আয়।

সেই থেকে সে বুঝি থেকে গিয়েছিল। না, ঠিক সেই থেকে নয়। ওরা যা বুঝেছিল তা নয়। জমি বন্ধ্যা, চাষ-বাস হবে না, এমন নদীর পাড়ের জমি,

জমিতে তরমুজ ফলবে, জমিতে সব ফসল হয় না—যার যা, তার তা। সে প্রাণপাত করে এই মাটির সঙ্গে প্রায় সেদিন লড়াইয়ে নেমেছিল।

সেই এক লড়াই। মাটির সঙ্গে মানুষের লড়াই। পুরাকালে যেমন মানুষ আগুন জ্বালতে জানত না, পশুপাখি মেরে কাঁচা খেত, ফলমূল আহার করত, ঈশমের মুখ দেখল তখন এমনই মনে হত। সবাই কি হাসাহাসি করত ঈশমকে নিয়ে। সবাই বলত, ঈশমটাও পাগল হয়ে গেছে। দু'তিন বিঘার মতো শুধু বালির চড়। এ-অঞ্চলে এমন জমিতে কে আবার চাষাবাদ করে! কিন্তু ঈশম সূর্যের মতো লাল রঙ নিয়ে এল মাঠে। চৈত্র মাসে মানুষের চোখে বিস্ময়। ঈশম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে খেতের তরমুজ কেটে খাওয়াচ্ছে। ভিতরটা তরমুজের কি লাল! কি লাল! সে সবাইকে বলত, ক্যামন লাগে। মিসরির শরবত কইরা দিছি। চৈত মাসের আগুন জ্বলছে চারপাশে। খরা দাবদাহে সূর্য পর্যন্ত আকাশ ছেড়ে পালাচ্ছে আর তখন কিনা ঈশম বলছে, কি লাল দ্যাখেন ভিতরটা। খান। য্যান মিসরির দানা।

সেই ঈশম এখন কাশছে। সে তরমুজের সব লতার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছে—ওরা নদীর পাড়ে-পাড়ে এবং তরমুজ খেতের ভিতর হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও ছুটছে স্ত্রীলোকটি। পুরুষটি পিছনে তাড়া করছে। কখনও ওরা চুপচাপ একটা তরমুজের ওপর পাশাপাশি বসে থাকছে। কিছু বলছে না। আকাশে কি সব দেখছে। আবার কখনও ধীরে-ধীরে ওরা ঘন হচ্ছে, সংলগ্ন হয়ে আলিঙ্গনে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকছে। ঈশম বলল, হ্যাঁ, মনুষ্যকুলের তুমি, দেব-দেবীর সুধা পান কর।

সে ভেবেছিল কিছু দেখবে না। কিন্তু এমন খেলা না দেখে থাকা যায়! নতুন কিংবদন্তি ফের ধর্মের মতো একদিন ঢাক-ঢোল বাজাবে। এই নদীর চরে, তরমুজ খেতে মনুষ্যকুলের কেউ হবে। ইহলীলা সাঙ্গ হলে ওরা সবাই আবার নেমে আসে। পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর দৃশ্য এখন এই জমিতে। সে কিছুতেই কাশছে না। দম বন্ধ করে পড়ে আছে। এখানে একজন মনুষ্য জাগে, টের পেলেই ওরা অন্তর্ধান করবে।

আহা, কি সুন্দর সুদৃশ্য এই জগৎ। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কি সুখ! অনন্তকাল এই পৃথিবী এবং সৌরজগৎ আপন মহিমায় আবর্তন করছে। মানুষ কীটপতঙ্গ পশুপাখি দলে-দলে মিছিলের মতো, ঘুরছে-ফিরছে। হাজার লক্ষ অথবা কোটি-কোটি বছর ধরে ঘুরছে-ফিরছে। এই যে এক তরমুজের জমি,

এখানে এবার নেমে এস তোমরা। এলেই দেখতে পাবে—প্রায় সাদা মোমের মতো এক নারী-মূর্তি, এবং হাতির মতো শক্ত অবয়বে এক পুরুষের আশ্চর্য লীলা। কেউ টের পেল না। একমাত্র ঈশম চুরি করে সব দেখে ফেলেছে। সে বলল, আমি ঈশম, বড় ভাগ্যবান মানুষ। যেন বলার ইচ্ছা, আমার আর কষ্ট কি। আমার জমিতে ঈশ্বরের আবাস। সুখের আমার অন্ত নাই।

ঘুম ভাঙতে ঈশমের বেশ বেলা হল। খুব সকালে ঘুম ভাঙার অভ্যাস। আজ বেলা হওয়ায় সে নিজের কাছেই কেমন ছোট হয়ে গেল। খুব সকাল সকাল সে ঠাকুরবাড়ি উঠে যায়। গোয়াল থেকে গরু বের করতে হবে। মাঠে গরু দিয়ে আসতে হবে। গরুর ঘর পরিষ্কার করা, তারপর বাজারে যেতে হতে পারে। তাকে এত বেলা পর্যন্ত না দেখে ছোটকর্তা আবার এদিকে নেমে আসতে পারে। সে ছইয়ের ভিতর থেকে উঁকি দিল। না, আসছে না। একটু তামাক খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা ভাবটা থাকে। ক'দিন থেকে কুয়াশা পড়ায় সকালের দিকে ঠাণ্ডা ভাবটা কিছুতেই যেতে চায় না।

ঘুম ভাঙার পর আর একটা চিন্তা বেশ ওকে পেয়ে বসেছে। গত রাতে সে কিছু যক্ষ রক্ষ অথবা জিন পরী কিংবা ফেরাস্তা হতে পারে—নাকি প্রথম মানব-মানবী সেই আদম-ইভ! কারা যে সারারাত জমিতে বিহার করে গেল! সে যে এখন কাকে কিভাবে এর ব্যাখ্যা করবে বুঝতে পারছে না। সে স্বপ্ন দেখেছে। না, তা' কি করে হয়! সে তখন তামাক খাচ্ছিল, খুব কাশি পাচ্ছে বলে তামাক খাচ্ছিল এবং যতক্ষণ ওরা বিহার করেছে ততক্ষণ সে দম বন্ধ করে বসেছিল—তবে সে কি করে স্বপ্ন দেখবে! সে স্পষ্ট মনে করতে পারছে, ভোর রাতের দিকে ওরা নদীর পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্তর্ধান করেছে। ছইয়ের ভিতর মানুষ আছে বলেই খুব তার কাছাকাছি ওরা আসে নি।

সে গ্রামে উঠে যাবার সময় দেখল শশীমাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। বাড়ির ছেলেরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। ছুটির দিন। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। দাঁত মটকিলা ডালে ঘষে ঘষে ফেনা তুলে ফেলেছে। সে ওদের দেখেই বলল, বুঝলেন নি, মাস্টারমশয়, এক তাজ্জব ঘটনা খেতের ভিতর।

—কি তাজ্জব ঘটনা? মুখের ভিতর বোধ হয় ডালের দুটো একটা আঁশ ঢুকে গেছিল। সেগুলো থুথু ফেলার মতো ফেলে দিতে দিতে কথাটা বলল শশীমাস্টার।

—কি যে কমু আপনেরে! ওডা যে কার দেবতা, আপনেগ না আমাগ ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না!

—কি হয়েছে বল না!

—দুই ফেরাস্তা মাস্টারমশয়।

—ফেরাস্তা!

—ফেরাস্তা না হইলে মনে লয় আপনেগ দুই দেবদেবী। রাইতের জ্যোৎস্নায় একেবারে পাগল হইয়া গ্যাছে। তরমুজ খেতে সারা রাইত ঘুইরা ফিরা বেড়াইছে।

শশিভূষণ হা হা করে হেসে উঠল।—খুব আজগুবি গপপো তুমি যা হোক বললে একটা।

—কি কাণ্ড! আপনের বিশ্বাস হয় না!

—তুমি কি মিঞা বুড়ো বয়সে আফিং ধরেছ!

—কি যে কন! সে কেমন ছোট হয়ে গেল মাস্টারমশাইর কাছে। সে আর দাঁড়াল না। ভিতরে ভিতরে সে চটে গেছে।—তা আপনেরা লেখাপড়া জানেন! আপনেগ কাছে এডা আফিংখোর মানুষের গল্প। তারপর সে হাঁটতে আরম্ভ করল। এ-সব মানুষেরা আল্লা যে কত মহান, কি তার বিচিত্র লীলা কিছু বোঝে না। সামান্য মনুষ্য জাতির কি সাধ্য তারে বোঝে—সে খুবই অকিঞ্চিৎকর মানুষকে লীলারহস্য বলতে গিয়েছে। যাকে বললে চোখ বড় বড় করে শুনবে তিনি বড়মামী। এ-সংসারের বড়বৌ। সে দেখল বড়মামী স্নান করে তারে কাপড় মেলছে। চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে বড়-মামীর। কাপড় রোদে মেলে দিয়েই চুলে শুকনো গামছা পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধবেন। খোঁপা বাঁধার অপেক্ষাতে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

বড়বৌ দেখল আতা বেড়ার পাশে ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলবে, কিছু বলার সময়ই সে চুপচাপ এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।—কিছু বলবে আমাকে?

—বড়মামী. কাণ্ড একখানা!

—কী কাণ্ড ঈশম!

ঈশম সব বললে, বড়বৌ বলল, তা হবে। এমন নদী আর তার বালুচর, তরমুজের খেত আর ঈশমের মতো মানুষ যেখানে আছে—সেখানে ওনারা নামবে না তো কারা নেমে আসবে!

—তবে তাই কন। শশীমাস্টার মনে করে বইয়ের ভিতরই সব লেখা থাকে।

—তা কি থাকে! কত কিছু আছে এ জগতে, যার মানে সামান্য মানুষ কি করে বুঝবে। বইয়ে সব লেখা থাকে না ঈশম। তুমি ঠিকই বলেছ।

—আমি নাকি আফিং খাই বইলা এমন গ্যাখছি।

—তোমাকে ঠাট্টা করেছে।

—না মামী, এ-সকল আউল-বাউল নিয়া আমার ঠাট্টা-তামাশা খারাপ লাগে। ওনারা লীলাখেলা করে। আমি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বইসা থাকি। কাছে যাই না। কাছে গ্যালে ওনারা রুষ্ট হয়। কি, হয় কিনা কন!

—তা হয়। এ ছাড়া বড়বৌর আর কিছু বলার ছিল না। সাদা জ্যোৎস্নায় কুয়াশার ভিতর সে বোধ হয় অন্য এক জগতে যথার্থই চলে গেছিল গত রাতে। তাকে আবার নেমে যেতে হবে। জানালা খুলে রাখলে সাদা জ্যোৎস্নায় তার আবার কোন না কোনদিন তরমুজের জমিতে নেমে যাবার ইচ্ছা হবে। সে দেখেছে গত রাতে মানুষটা তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছিল। আত্মনিগ্রহে আর নিজেকে কোন কষ্ট দেয় নি। এই আত্মনিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য বড়বৌ সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষায় থাকে। মধ্যযৌবনে তারা বালির চরে আদম-ইভের মতো ঘোরাফেরা করে। ঈশম ছইয়ের ভিতর তেমনি বসে থাকে। কোন কোন দিন ঘুমিয়ে থাকে। কখনও ডঙ্কা বাজায়। কখনও সে আর এক নূতন কিংবদন্তি সৃষ্টির জন্য তামুক খেতে খেতে এই ভিটা জমিতে বড় একটা অশ্বত্থ লাগিয়ে দেবে ভাবে এবং একদিন সে সিন্নি দেবে গাছের নিচে এমন ভাবল। মনে হয় তার তখন, হাসানপীর অবস্থা অন্য আউলেরা আসবে গাছের নিচে। ওরা সবাই বলবে আল্লার নামে সিন্নি দে ঈশম। আমরা দুইটা খাই। কারণে অকারণে ঈশম ছইয়ের নিচে শুয়ে থাকলে মধ্য যামিনীতে এমন সব আদিভৌতিক রহস্যের ভিতর ডুবে যায়।

কিন্তু একবার বড়বৌ ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ওরা দু'জন বালির চরে চুপচাপ বসে গল্প করছে। ওর সেই শৈশবের গল্প। মানুষটা তার শুনছে কি শুনছে না সে বুঝতে পারত না। কেবল দুটো একটা কথা সংগোপনে বলতেন। সেও খুব সহসা সহসা। বলতেন যেমন, বড়বৌ, আমাকে কি দরকার ছিল বাবার মিথ্যা তার করার।

তিনি বলতেন, দেখা হলে আমি কি বলব তাকে। সে তো আবার ফিরে আসবে।

বড়বৌ মনে মনে হাসত। মানুষটার বিশ্বাস এখনও সে কোথাও না কোথাও তার অপেক্ষায় আছে। বড়বৌ তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলত—তুমি যাবে! আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব! কিন্তু কথা দিতে হবে

অকারণে তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে না। গ্যাৎচোরতশালা বলতে পারবে না! কথা দাও আমাকে, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি ভাল হয়ে গেলেই, আমি যে-ভাবে পারি তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

তিনি আর তখন কথা বলতে পারতেন না। সারাক্ষণ বড়বৌর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর বুঝি কখনও কখনও ঘুম এসে যেত। নদীর চরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড়বৌ জেগে থাকত শিয়রে। মানুষটা এ-ভাবে ঘুমাতে পারলেই ভাল হয়ে যাবেন। সে এক রাতে শিয়রে পাহারা দেবার সময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালির চরে পাতলা সিল্কের ওপর ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে ছিল। খুব সকালে মসজিদের আজানে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। সে উঠে দেখল, মানুষটার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসে আছেন। সকাল হয়ে যাচ্ছে তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বড়বৌর খোঁপা খুলে গেছে। উঠেই সে তার খোঁপা বেঁধে মানুষটাকে বলল, তাড়াতাড়ি এস। ভোর হতে বাকি নেই। বড়বৌ মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে ভোর রাতের অন্ধকারে ছুটছিল। কারণ আর একটু হলেই ঈশমের কাছে ধরা পড়ে যেত।

পথে মঞ্জুরের সঙ্গে দেখা।—ঠাইরেন এই সাতসকালে মাঠে!

বড়বৌ বলল, আপনার দাদার কাণ্ড। ভোর রাতে বের হয়ে যাচ্ছে। ধরে আনলাম নদীর চর থেকে।

সেই থেকে বড়বৌ আর সাহস পায় না। মানুষটা মাঝে মাঝে ঘুমাতে পারলে ভাল হয়ে যাবেন—সেই আশায় মরিয়া বড়বৌ একা একা স্বামীর হাত ধরে অন্ধকারে অথবা ম্লান জ্যোৎস্নায় নেমে যেত। কলঙ্ক রটতে কতক্ষণ। স্বামীর জন্য সে কিছুই ভ্রূক্ষেপ করত না। কিন্তু এখন আর পারে না। কারণ ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই নেই তার। জানালা খোলা থাকলে সে তেমনি দূরের মাঠ দেখতে পায়। কোনোদিন সেই মাঠে তার প্রিয় মানুষ পাগল ঠাকুরকে দেখতে পায়। একা একা মানুষটা আত্মনিগ্রহে চলে যাচ্ছে। যেন পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত এই আত্মনিগ্রহ। সে জানে, যদি এই মানুষের সঙ্গে নদীর চরে নেমে যাওয়া যেত তবে আর তিনি দূরে যেতেন না। সকাল না হতেই সে তার ঘরের মানুষ ঘরে নিয়ে ফিরতে পারত।

মানুষটার জন্য আর যা হয়, যখন তখন অবোধ মন তার ভার হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাতে এই মানুষ ফিরে না এলে সে জানালা থেকে

কিছুতেই নড়তে চায় না। মনে হয় তার মানুষটা তখন কোন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ-ভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন রাতে বড়বৌ দেখল মাঠের ও-পাশে কিছু মশাল জ্বলে উঠছে। একটা দুটো করে অনেক ক'টা মশাল। মশালগুলো নদীর পাড়ে পাড়ে অদৃশ্য হতে থাকল। ওরা ধ্বনি দিচ্ছিল আল্লা-হু-আকবর।

তখন সকলে যে যার মতো ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এ-সব হিন্দুগ্রামে আগুন দেবে বলে উঠে আসতে পারে। বড়বৌ এবং ছোট ছোট শিশুরা, ধনবৌ, গ্রামের নারী এবং শিশুরা যে যার মতো ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিত। বাসনপত্র সব কুয়োতে ফেলে দেওয়া হত। ছাই-গাদার নিচে গয়নার বাক্স। আর হিন্দু যুবকেরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোপাটে ধ্বনি তুলত, বন্দে মাতরম্!

হাজিসাহেবের ছোট ছেলে আকালুর কাণ্ড এসব, সেই এখন এসব করাচ্ছে। পাশের গ্রামে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সে দশ-বিশ ক্রোশ দূরে-দূরে কোন-কোন হিন্দু গ্রামে আগুন দিয়ে ফিরছে। তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে আছে বেশ তার মতো। কারণ ওরা দলে ভারি। শহর থেকে মানুষ আসে। কেউ বলছে ওরা ঢাকা শহরের মানুষ না, ওরা এসেছে কলকাতা থেকে। কেউ কেউ বলছে আকালুর এতে হাত নেই। আরও বড় গোছের নেতা এসব করাচ্ছে।

কি যে হয়ে গেল দেশটাতে!

ঈশম নদীর চরে বসে তামাক খায় আর আবোল তাবোল বকে। মিঞারা খুব যে খোয়াব ছ্যাখতাছ। অগ খেদাইবা কোন ছ্যাশে। নিজের ছ্যাশ ছাইড়া কবে কেডা কোনখানে যায়!

তখন সে শুনতে পায় নিশীথে কারা সব চিৎকার করছে নদীর ও-পাড়ে। আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি দিচ্ছে। নারায়ে তকদির ধ্বনি উঠছে। এ-পাশের হিন্দু গ্রামে ধ্বনি উঠছে—বন্দে মাতরম্। ভারত মাতা কী জয়! ওপাশে ধ্বনি উঠছে—পাকিস্তান জিন্দাবাদ। তখন ঈশম মাঝখানে বসে হা-হা করে হাসে। কার ছ্যাশ, কে বা দিবে, কে বা নিবে!

এ দুটো সাল বড় দুঃসময়ের ভিতর কাটছে। যে যার মতো সুপারির শলা

শানাচ্ছে। যেন দুঃসময়ের শেষ নেই। আগে পলটু ওর ছোটকাকার সঙ্গে শুত, কিন্তু এখন শোয় সে তার মার সঙ্গে। রাতে মা আজকাল একা শুতে ঘরে ভয় পান। বাবা থাকেন না রাতে। ওর এক ভয়। যখন মুসলমান গ্রামগুলোতে ক্রমে ধ্বনি উঠতে থাকে—নদীর পাড়ে-পাড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সেই ধ্বনি বড় ভয়াবহ। বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সবাই কেমন ঘোলা-ঘোলা চোখ-মুখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। দূর দেশের নানা রকম দাঙ্গার খবর আসে। নৃশংস সব ঘটনা ঘটছে কোথাও। কিভাবে যে এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। কেবল সামসুদ্দিন জানে—ডাইরেকট একশানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সুরাবর্দি সাহেব পরের হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে। নদীর জলে মরা গরু-বাছুর ভেসে যায়। গরু-বাছুর না মানুষ কেউ ইচ্ছা করে আর দেখতে যায় না।

ঘোর দুঃসময়ে বড়বৌ যত ভাবে এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সব ঘোর কেটে যাবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তরমুজ খেতে শাদা জ্যোৎস্না উঠবে—তত নিশীথে তার প্রাণে ভয়। সে এখন একা আর ঘুম যেতে পারে না। কারণ আজকাল কি যে হয়েছে তার! সেই যে আছে না এক ষণ্ড, অতিকায় ষণ্ড, নদীর পাড়ে, তরমুজ খেতে, ভিটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, এক চোখ যে ষণ্ডের, কালো রঙ, গলকম্বল তার ধরণীতে লুটায়—চার পা যেন তার কাঠের আর এত শক্ত এবং এমন বলশালী যে মনে হয় এত দিনের এক সঙ্গে বসবাস মুহূর্তে বিদীর্ণ করে দেবে। সেই ষণ্ডের দিকে ভয়ে আর তাকান যাচ্ছে না। সেই দিনের মতো ষণ্ড আবার ক্ষেপে গেছে। সেই যে একদিন আন্নু, মরি-মরি করে প্রাণ বাঁচানো দায়, শিংয়ের গুঁতো মারলে পেট এফোঁড়-ওফোঁড়—কে আর তখন কাকে রক্ষা করে! প্রাণভয়ে আন্নু সে যাত্রা গরম ফ্যান ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

রক্ষা পেল আন্নু আর চোখ গেল ষণ্ডের। গরম ফ্যান মুখে ঢেলে দিতেই একটা দিক সাফ হয়ে গেল। দগদগে ঘা। ঘায়ের জ্বালায় কি বড়-বড় ডাঁসের (প্রকাণ্ড মাছি) জ্বালায় ছুটত বোঝা যেত না। অনবরত মাঠে নিশিদিন লেজ তুলে ছুটছে। বড়-বড় ডাঁস কামড়ে খোদল করে ফেলছে ঘা। ঘায়ের জ্বালায় ষণ্ড মরে। রাতদুপুরে দিনদুপুরে ষণ্ড দৌড়ায়। ঘায়ের জ্বালায়, সেই যে বলে না জ্বালা মরে না জলে, জ্বালা সহে না প্রাণে, জ্বালায় মাসাধিককাল মাঠে-মাঠে একবার পূবে আবার পশ্চিম ছুটেছে ষণ্ড।

আন্নু যে যণ্ডের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল, কখনও সে কাউকে ভুলেও বলে নি। কারণ ষণ্ড, ধর্মের ষণ্ড, হাজিসাহেবের পেয়ারের ধন। ছোট পোলার মোতাবেক মানুষ। সে গোপন রেখেছে। না রেখে তার উপায় ছিল না। সে এই ষণ্ডের মুখ না পোড়ালে প্রাণে বাঁচত না, ফেলু মরত, বাছুরটা হাওয়া হয়ে যেত। সে এমন এক বেতমিজ কামকাজ করেই দেখল ষাঁড়টা সুড়-সুড় করে পোষ-মানা জীবের মতো মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপরই যন্ত্রণায় এবং জ্বালায় মাঠের ওপর দিয়ে সেই যে লেজ তুলে ছুটতে থাকল, ছোটার আর বিরাম নেই। তবু ষণ্ড আগে দু' চোখে দেখতে পেত। এখন এই দুঃসময়ে ষণ্ডের এক চোখ গিয়ে এক চোখে ঠেকেছে। শালা এক চোখে আর কত দেখতে পারে। ফলে তার ভয় ফেলুকে, ফেলুর বিবিকে। কেবল ফুঁসে-ফুঁসে মরছে ষণ্ড। কবে সে বাগে পাবে ফেলুকে আর তার সেই আদরের বাগি গরুটাকে। পেলেই লম্বা শিঙে পেটে শূল বসাবে।

ঠিক এই ষণ্ডের মতো এক অতিকায় ভয় এই দুঃসময়। বড়বৌ এবং তার পরিবার অর্থাৎ এই হিন্দু পল্লীতে-পল্লীতে অতিকায় এক একচক্ষু দানব ক্রমে বড় হচ্ছে। ক্রমে নিশীথে ঘোরাফেরা করছে তারা। হাত-পা তার নিকষ কালো। এবং ঘন-ঘন উষ্ণ নিশ্বাসে যেন সব নিঃশেষ করে দেবে এবারে। সে নিশীথে শুয়ে থাকলে টের পায় হাজার-হাজার মশালের আলোতেও কেউ সেই দানবকে পুড়িয়ে মারতে পারছে না। একচক্ষু দানবের ভয়ে গোটা দেশ রসাতলে যাচ্ছে।

আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শোনার সঙ্গে-সঙ্গে শশী মাস্টার শচী আর যুবা পুরুষেরা উঠে পড়ে বিছানা থেকে। কখনও-কখনও ওরা সারা রাত ঘুম যায় না। গ্রাম পাহারা দেয়। আবার কোন রাতে ওরা অন্ধকারে দরজা খুলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। আলো জ্বালে না কেউ। ভয়ে গুটি-গুটি বের হয়ে ডাকে, আপনারা কেউ কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। একটা গুম-গুম আওয়াজ উঠছে! মনে হয় না হাজার-হাজার মানুষ অন্ধকারে চুপি-চুপি আপনাদের পুড়িয়ে মারার জন্য ছুটে আসছে! সবাই আর ঘুম যেতে পারে না তখন। জেগে বসে থাকে—কখন আক্রমণ ঘটবে এই আশংকায়।

কি যে হল এই দেশে! মুড়াপাড়ার সেই গণ্ডগোলের পর থেকেই এমন হল! সেদিন যে কি তারিখ ছিল, মনে করতে পারছে না বড়বৌ। সব এখন ভুল হয়ে যাচ্ছে! সকালে উঠেই বড়বৌ পুকুর পাড়ে দেখেছে কারা যায়। সার বেঁধে যায়। লুঙ্গি পরে, মাথায় কালো রংয়ের ফেজ এবং হাতে সবুজ

রংয়ের নিশান। ওরা ধ্বনি দিতে-দিতে যাচ্ছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। ওদের ভিতর কোন চেনা মুখ পড়ে নি। কেবল সে ফেলুকে দেখেছে। ফেলু ভাঙ্গা হাত নিয়ে যাচ্ছে। একটা দড়ি ডান হাতে। কোমরে কোরবানীর চাকু গোঁজা। আর ওর সাধের বাগি গরুটাকে সে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—সে মাঝে-মাঝে লেজ মুচড়ে দিচ্ছে। নয়তো যেন একসঙ্গে যাওয়া যাবে না। মিছিলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে না পারলে নামাজ পড়া হবে না।

তার ক'দিন আগে একটা ঢোল বাজছিল নিশিদিন। শচী এসে বাড়িতে খবর দিয়েছে—হাটে-হাটে একটা লোক ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলছিল, তার নাম মহম্মদ, ধর্মের নাম পবিত্র ইসলাম। ধর্মকর্ম সব ভুইলা নিজেরা কাফের বইনা যাচ্ছেন! এমন বলছিল। বলছিল, যান হ্যাখেন গিয়া কালী বাড়ি পার হয়ে, মসজিদে তিনি যে আছেন, থাকেন, কত-কাল আছেন টের পান না, খান দান ঘুমান আর কাফের তার কালীবাড়ির পাশে নামাজ পড়তে দিব না কয়। নামাজ না পড়লে গোনাগার হইতে হয়! তারপর সে ড ড ড করে ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলে, দীন এলাহি ভরসা। এই সব বলে, কি যে বলতে হয় সঠিক সে জানে না, তাকে লিখে দিয়ে গেছে লীগের পাণ্ডা আলি সাহেব। তিনি ভাল ভাল ভাষায় লিখে গেছেন। ঢুলি মুখস্ত করে ব্যাকরণের ধর্ম মানছে না। নিজের মতো করে বলে যাচ্ছে, আর ঢোল বাজাচ্ছে। বলছে, সেই এক গাঁ জমিদারবাবুদের। ফ্লুট বাজে দশমীর দিনে। বাবুদের বাড়ি-বাড়ি হাতি বাঁধা। কিবা বাহার হ্যাখ রে হাতির। হাতি যায় যুদ্ধে। তারপরই সে ফের ঢোলের কাঠি পাল্টাল। বলল, মানুষ যায় যুদ্ধে। ধর্মযুদ্ধে। হাজার-হাজার মানুষ শীতলক্ষ্যার চরে দাঁড়িয়ে ধর্ম-যুদ্ধের জিগির দিচ্ছিল সেদিন।

হাতিটা এখন আর পীলখানার মাঠে বাঁধা নেই। যুদ্ধের সময় হাতিটাকে সেই যে নিয়ে গিয়েছিল কর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আর ফিরিয়ে আনতে পারে নি। হাতি যুদ্ধে গিয়ে পাগল হয়ে গেছিল এবং হাতির প্রাণনাশ হতেই জসীম একা-একা ফিরে এসেছিল। সেই জসীম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে একা-একা বক-বক করেছে।

জসীম সকাল থেকেই গাছটার নিচে বসে বসে দেখছে। সেই সকাল থেকে পায়ে হেঁটে নৌকায় করে হাজার-হাজার মানুষ জড় হচ্ছে চরে। ওরা সেই ভাঙ্গা মতো শ্যাওলা-ধরা, ভগ্নস্তূপের পাশে হাঁটু মুড়ে নামাজ পড়বে। মিনার

অথবা গম্বুজের কোন চিহ্ন নেই। ভাঙ্গা ইটের সারি-সারি কঙ্কাল। আর অজস্র ঝোপঝাড়। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। দু'জন সিপাই কালীবাড়ি ঢোকার রাস্তায় বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা লুটপাট আরম্ভ করতে পারে। নামাজ পড়া শেষ হলেই ওরা মশাল জ্বালিয়ে বাজারের সব হিন্দু দোকানগুলিতে আগুন দিতে পারে, বাবুদের বাড়ি-বাড়ি মশাল নিয়ে আক্রমণ করতে পারে। বাড়ির ছাদে-ছাদে এখন সব মানুষ। লোহার সব দরজা নিচে বন্ধ। একটা পাখি পর্যন্ত উড়ছে না ভয়ে। কেমন নদী মাঠ চর চারপাশটা থমথম করছে। সে ভূপেন্দ্রনাথকে গতকাল স্টিমারে নারাণগঞ্জে যেতে দেখেছে। আজ সকালে স্টিমারে তিনি ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে পুলিশ সাহেব নিজে। এবং এক কুড়ি হবে বন্দুকধারী সিপাই। রূপগঞ্জের দারোগাবাবু বাবুদের কাছারি-বাড়িতে দু'দিন থেকে পাহারা দিচ্ছেন। বাবুদের বৌরা-মেয়েরা শহরে চলে গেছে। ওঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। যারা জোয়ান, যারা বন্দুক চালাতে জানে এবং লাঠিখেলায় ওস্তাদ সেইসব মানুষ আছে কেবল। ওরা এখন গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কালীবাড়ি, আর সেই ভাঙ্গা ইঁট-কাঠের জঙ্গলের চারপাশটায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে। কোন্ মানুষের সাধ্য সেদিকে এগুবে। এ-পারে বন্দুক হাতে সিপাই। লক্ষ্যার চরে হাজার-হাজার মানুষ। মাঝখানে সড়ক। ওরা সড়ক অতিক্রম করে নামাজ পড়ার জন্য উঠে আসতে পারে। ভয়ে সিপাইরা বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে। একটা গরু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে চরে। কোরবানীর জন্য গরুটাকে বোধ হয় কেউ নিয়ে এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত নিশ্বাস নিতে পারছে না। এত বড় একটা ধর্মযুদ্ধের মোকাবিলা প্রায় বলতে গেলে তাকেই সবটা করতে হয়েছে। সাধারণ মনুষ্য তোমরা। তোমাদের ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে দিয়ে পিছনে মাতব্বর মানুষেরা তামাশা দেখছে। আমাদের রক্ত সনাতন। মা করুণাময়ী মায়ের আশ্রয়ে আমরা, আমাদের আবার ভয় কি। তবু এত সব যে আয়োজন সবই মার অশেষ কৃপায়। তাঁর ইচ্ছা না হলে সাধ্য কি সে এত বড় একটা উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে লড়ে। সে বড়বাবুর জন্য একটা দূরবীন কিনেছিল। বড়বাবুর ঘোড়ার মাঠে যাবার অভ্যাস ছিল। তার সেই দূরবীনটা এখন বড় কাজে লাগছে। সে এবং বাবুদের যুবক ছেলেরা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে বন্দুক হাতে সুন্দর আলি। ওপরে ওরা ওদের গুপ্ত স্থান বেছে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ

গুপ্তপথে সব বাবুদের বাড়ি হেঁটে-হেঁটে আক্রমণের মোকাবিলা করার সব রকমের ফন্দি-ফিকির করে এইমাত্র ছাদে উঠে চরের দিকে তাকাতেই দেখল, হাজার হাজার মানুষ চরে গিজ-গিজ করছে। ও-পাশে তারকবাবুর বৈঠকখানার নিচে সবুজ যে মাঠ, মাঠের পাশে সিপাইরা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পুতুলের মতো। সে চরে ফের দূরবীনে দেখতেই তাজ্জব বনে গেল। ফেলু এসেছে এই চরে। আর তার হাতের কাছে ওর সেই বাগি গরুটা। গরুটাকে সে এত দূরে টেনে নিয়ে এসেছে। এই গরুর জন্য ফেলুর প্রাণপাত। সে এই গরুটাকে শেষে কোরবানী দিতে নিয়ে এসেছে! তার বড় প্রিয় এই জীব। জীবের জন্য সারাটা শীতকাল এবং হেমন্তে অথবা বর্ষায় কি না কষ্টে ঘাস সংগ্রহ করে এনেছে!

দূরবীনে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে গরুটার। নীল চোখ। অবলা জীব এমন মানুষের ভিড়ে পাগলা হয়ে গেছে। সেই হাতিটার মতো। ক'জন সিপাই এসেছিল কর্মিটোলা ক্যান্টনমেণ্ট থেকে। হাতিটাকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন এ-অঞ্চলে যত নৌকা ছিল যুদ্ধের জন্য সব ইজারা নিচ্ছে সরকার। হাতিটাকেও ওরা ইজারা নিয়ে নিল। হাতি কেন এসব মানবে। হাতিটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। জসীমের ওপর ভার তাকে ঘাটিতে দিয়ে আসার। জসীমের স্ত্রী বেঁচে ছিল না। মাতৃহীন এক শিশুকে সে বড় করছে। আর বড় করছিল যেন এই হাতিকে। সে সারক্ষণ হাতির সুখদুঃখে নিমজ্জিত। নিজের বলতে সে কিছু জানত না। সে হাতি নিয়ে আর পুত্র ওসমানকে নিয়ে হেমন্তের মাঠে আকাশের নিচে হেঁটে হেঁটে কত দূরদেশে চলে যেত। সেই হাতী ঘাঁটিতে যেতে না যেতেই কেমন পাগলের মতো করতে থাকল। জসীম কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছিল না হাতিটাকে। জসীমকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। নেমে গেলে, ফের শুঁড়ে ওকে তুলে পিঠে বসিয়ে দিয়েছে হাতি।

এই গরু নিয়ে এমনি কতদিন দেখেছে ভূপেন্দ্রনাথ, ফেলু ঝোপঝাড়ের ভিতর বসে রয়েছে। সে চুরি করে কতদিন অন্যের ফসল খাওয়াচ্ছে। মেরে ওর হাড় ভেঙ্গে দিতে পারে প্রতাপ চন্দ্রের মেঝ ছেলে অথবা গৌর সরকারের চাকরটা, সে সব ভয় তুচ্ছ করে জীবনপাতে বাগি বাছুরটাকে বড় করে তুলে এখন তাকেই নিয়ে এসেছে কোরবানী দেবে বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ছাদের আলসেতে ভর দিল।

চরের মানুষেরা সহসা সহসা ধ্বনি দিচ্ছে। পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে দীঘির পাড়ে যারা দাঁড়িয়েছিল। তারা সব গ্রামের মানুষ, সবাই এসে দীঘির পাড়ে জড় হয়েছে। রেলিঙের পাশে পাশে গরম জল ফুটছে, ভাঙ্গা ইঁট জমা করছে এবং বল্লম সড়কি নিয়ে পাহারা। মেয়ে-বৌদের ঠেলে সব মণ্ডপের দালানে, ভিতর বাড়িতে রান্নাবাড়ির পাশে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি ওদের ছাদে পর্যন্ত উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে-বৌরা পর্যন্ত আলাদা আলাদা ফ্রন্ট করে দাঙ্গার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এতক্ষণ পর কেমন ভূপেন্দ্রনাথ সব দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওরা নামাজ পড়তে না পারলে অন্যদিকে হল্লা করবে। লুটপাট করবে। সুতরাং সবদিক থেকেই যাতে মোকাবেলা করা যায়, করতে না পারলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটবে। ঠিক যেমন কোরবানীর পশু দু'চোখ উল্টে থাকে তেমনি সনাতন ধর্ম চোখ উল্টে থাকবে—যা সব আয়োজন, চোখ উল্টে থাকার আর ভয় নেই। যেদিক থেকেই আক্রমণ আসুক তাকে প্রতিহত করার সব সুবন্দোবস্ত আছে ভেবে সে রুমালে নিশ্চিন্তে মুখ মুছল। আর মনে হল তখনই নদীর চরে একটা অবলা জীব হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। ভূপেন্দ্রনাথের শরীরের ভিতর সব রক্ত এক সঙ্গে টগবগ করে ফুটতে থাকল।

এই নামাজে ফেলু পর্যন্ত এসেছে দশ ক্রোশ পথ হেঁটে। সূর্য এখন নদীর ওপারে অস্ত যাবে। ওরা কি তবে রাতে রাতে উঠে আসবে গ্রামে। দুশ্চিন্তায় ফের ভূপেন্দ্রনাথের মুখটা নীল হয়ে গেল। বাবুরা সব এখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন। মাঝে মাঝে সব খবর পাঠাতে হচ্ছে। বড়বাবু একবার ছাদে উঠে দূরবীনে সব দেখে গেছেন। এবং কিভাবে ভূপেন্দ্রনাথ এই আক্রমণের মোকা-বেলা করছে দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছেন তার ওপর।

দূরবীনে নদীর চর বড় দেখাচ্ছে। নদীর জল শান্ত। কাশবনে কোন ফুল নেই। জল খুব নিচে নেমে গেছে। নদীতে একটা নৌকা নেই। যারা নৌকায় এসেছে, তারা নৌকা চরে টেনে তুলে রেখেছে। কালো রঙের সব নৌকা, আর মাথা গিজগিজ করছে। মাথার ওপর নিশান উড়ছে এবং হাতের সব সড়কি আসমানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলছে তারা, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। তখন শঙ্কায় ভূপেন্দ্রনাথের বুকটা কাঁপছে।

ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীনেই দেখল ফেলু এক হাত সম্বল করেই চলে এসেছে। আর সম্বল তার এক চোখ।

আর ঠিক সেই প্রকাণ্ড ষণ্ডের মতো এক চোখ নিয়ে দুই পাড়ে দুই জনতা মোকাবেলায় প্রস্তুত। জসীম গাছের নিচে দুই চোখ খুলে রেখেছে। আর দুই চোখ আছে বলেই বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। যেমন সে বিমর্ষ ছিল, হাতিটাকে ছেড়ে আসার দিন। সে বার বার হাতিটার পিঠ থেকে নেমে এলে হাতিটা তাকে পিঠে বসিয়ে দিতে থাকল। প্ল্যাটুন কমাণ্ডার বললেন, জসীম, তুমি এবার নেমেই ছুটে চলে যাবে। হাতির পায়ে শেকল, শেকলে বাঁধা বলে হাতি ছুটতে পারবে না।

সে নেমে যেতে পারছিল না। শুঁড় দিয়ে ওকে পিঠে তুলে নিচ্ছিল ফের। সে কত অবলা জীব, জসীম কাছে না থাকলে সে বাঁচবে না এমন আকুল চোখ হাতির। হাতির কষ্ট কমাণ্ডার সাব কি জানবেন! সে এই হাতির জন্য নিজের বিবির কথা ভুলে গেছিল। সে যেদিন তার সন্তানের হাত ধরে বিবিকে মাঠে কবর দিয়ে ফিরছিল, কি তখন অন্ধকার চোখে! কার কাছে রেখে যাবে এই ওসমানকে। ওসমান এখন থেকে কার কাছে থাকবে! ওসমানকে নিয়ে বাবুদের বাড়িতে এসে হাতির পিঠে চড়ে বসলে তার আর বিবির দুঃখ থাকল না। উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাতি, সে এবং তার পুত্র ওসমান। ঘাস কাটতে নদীর চরে নেমে গেলে ওসমান থাকত হাতিটার কাছে। সে বলত, লক্ষ্মী, তর কাছে থাকল ওসমান। আমি ঘাস কাটতে যাইতাছি।

তখন যত খেলা হাতির এই ওসমানের সঙ্গে। ওসমান হাতিকে ছোট ছোট ডাল এগিয়ে দিত, সে হাতির পায়ে শেকলে প্যাঁচ লেগে গেলে খুলে দিত। অঙ্কুশ চালিয়ে যেখানে ঘাড়ে সামান্য ঘা, সেখানে বড় বড় মাছি উড়ে এসে বসলে খুব কষ্ট হাতির। ওসমান হাতির পিঠে বসে মাছি তাড়াত। বাপ যে মালিশ এনে দিত, সে সারাক্ষণ ঘায়ে মালিশ মেখে দিত। কোন কোনদিন সে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়ত শানে। অথবা হাতির পেটে পিঠ রেখে শুয়ে থাকত। হাতি অবলা জীব. লক্ষ্মী এবং পয়মন্ত বলে জসীম এসে দেখতে পেত ওসমান হাতির পেটে পিঠ দিয়ে দুপুরে আমগাছের ছায়ায় ঘুম যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডেকে তুলত। হাতি এবং ওসমান উভয়কে সে নদীর জলে স্নান করিয়ে এনে খেতে দিত দু'জনকে। ওসমানের জন্য চিড়া-গুড়, আর হাতির জন্য কলাগাছ। বিবি মরে গেলে এই হাতিই ছিল প্রায় বিবির মতো। সে সময়ে-অসময়ে ডাকত, লক্ষ্মী! অ লক্ষ্মী তরে দিমু ধান্যদূর্বা, তুই বাঙলাদেশের

নদী পার হইয়া আর কোনখানে যাইবি! তুই থাইকা যা আমার লগে। হাতি বুঝি জসীমের বুকের ভিতর যে একটা কোড়াপাখি ডাকছে, শুনতে পেত। শহরে গঞ্জে কত দূরদেশে গিয়েও হাতি কখনও পথ ভুল করত না। একবার জসীমের কি জর। বাবুরা গিয়েছিল বাঘ শিকারে। শিকার শেষে ওরা জয়দেবপুর থেকে ট্রেনে আর জসীম মৃত বাঘ নিয়ে একা। হাতির পিঠে বাঘ, জসীম। জসীমের এমন প্রবল জর যে সে খর রোদে চোখ মেলতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে জলতেষ্টা পাচ্ছে। বেহুঁস জসীম। হাতি যেন সব বুঝতে পেরে নদী থেকে জল তুলে দিয়েছিল শুঁড়ে। পয়মন্ত হাতি নদীর পারে জসীমকে নামিয়ে শুঁড়ে জল তুলে এনে মাথায় ঢাললে জসীম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কোথায় যে যাচ্ছে লক্ষ্মী, সে টের পাচ্ছে না। সে পিঠের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অথচ লক্ষ্মীর যেন জানা, সে দ্রুত পা চালিয়ে সোজা পথ চিনে চলে এসেছিল। পথ সে এতটুকু ভুল করে নি।

সেই লক্ষ্মীকে ওরা মেরে ফেলল। জসীম চলে যাচ্ছে আর আসছে না, বুঝি টের পেয়ে গিয়েছিল হাতি। তাকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। সে সোজা নিচে নেমে এসে শুঁড়ে হাত বুলাতে থাকল। আবার সে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই নিতে আসবে এমন বলল। পাগলামি করলে চলবে কেন। বাবুরা যারা আছে এখানে সবাই ভালবাসবে তাকে। কেউ কোন কষ্ট দেবে না। এত সব বলেও জসীম পার পেল না। সে একটু দূরে গেলেই হাতি প্রথম শুঁড় তুলে কি দেখল! তারপর জসীম ক্রমে দূরে চলে যেতে থাকলে হাতি শুঁড় তুলে চিৎকার করতে থাকল। যখন আর জসীমকে দেখা গেল না, হাতি শেকল ছিঁড়ে ছুটতে থাকল। সামনে সেই প্ল্যাটুন কমাণ্ডার—সে রোখ্‌কে রোখ্‌কে বলে এগিয়ে গিয়েছিল। আর ছাখে কে, একেবারে হাতির পায়ের তলায়। তখন সোরগোল চারপাশে। সামনে যেসব তাঁবু পড়ছে সব ভেঙে দিচ্ছে। জসীমের কাছে যাবার জন্য সে সব বাধা লোপাট করে এগুচ্ছে। জসীম দূর থেকে দেখল হাতিটা ছুটে আসছে। আর সোরগোল। হাতি পাগল হয়ে গেছে। পর পর তিনজন মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করেছে। সুতরাং ডুম্‌ ডুম্‌। হাতির সামনে কাপ্তান দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। জসীমও তখন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল—হা আল্লা! সে দেখল তার লক্ষ্মী গুলি খেয়েও পড়ে যায় নি। টলতে টলতে জসীমের পায়ের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ল। কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখটা চেনা যাচ্ছে না লক্ষ্মীর। রক্তে সমস্ত মাথা

লাল হয়ে গেছে। মরতে মরতেও লক্ষ্মী, কি যে ভালবাসা তার, মাঠের মতো অথবা আকাশে পাখি ওড়ার মতো ভালবাসা। লক্ষ্মী অতিকষ্টে শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল। যেন এই শুঁড় বেয়ে জসীম তার পিঠে উঠে বসে। এবং তাকে নিয়ে সেই নদীর পাড়ে সে চলে যায়।

জসীম লক্ষ্মীর মাথার কাছে সেদিন চুপচাপ বসেছিল। কত মানুষ চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় সাহেবসুবা এল, তাকে নানারকম প্রশ্ন করল, সে কোন জবাব দিতে পারছিল না। ডিভিশনের তাবৎ মানুষ এসে ওকে দেখে গেছে—এক হাতি আর তার মাহুত, সারাজীবনের সঙ্গী। কবর খোঁড়ার সময় সে শুধু উঠে কবরে নেমে গিয়ে লক্ষ্মীর ঠাঁই হবে কিনা, এই মাটির নিচে না অন্য কোথাও সে তাকে নিয়ে যাবে, কোথায় আর যাবে, পারলে সে তাবৎ এই মনুষ্যকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বলে আমি তরে নিয়া যামু নদীর পারে। এখানে তরে কবর দিমু না। কিন্তু সে জানে তার ক্ষমতা সামান্য, সে কি আর করতে পারে! সারাদিন সে হাতির মাথার কাছে বসেছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ উঠছে। বুকে এসে শব্দটা ভীষণ তার ধাক্কা মারছে। এই ঝোপের ভিতর বসে জসীম এখন আর এক ধাক্কার ভিতর পড়ে গেল। সে যাবে কার দলে! সে চরে নেমে যাবে, না বাবুদের রক্ষার্থে তাদের বাড়ি উঠে যাবে। পিলখানার ও-পাশের রাস্তায় সে সেই শক্ত মানুষটিকে দেখতে পেল। তিনি যাচ্ছেন মা আনন্দময়ীর বাড়ি। মুণ্ডমালা গলায় মা হাত তুলে আজ অসুরনাশিনী। জসীম বলতে চাইল—ক্যাডা অসুর মা জননী। তখনই সে দেখল কোমর থেকে কোরবানের চাকুটা ফেলু শাঁ করে বের করে ধরেছে রোদে। রোদ ইস্পাতের ওপর সহসা এক ঝিলিক খেয়ে গেল। ফেলু কোরবানের চাকুতে সূর্যের আলোকে ধরে নানা বর্ণের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। কি ভয়াবহ! চাকুটা দেখেই বাগি গরুটা লাফ মারছে। গরুটা লাফ মারছে, কি মরণ নাচন নাচছে বোঝা যাচ্ছে না। চারপাশে মানুষের বড্ড ভিড়। সে এখন ইস্পাতের ওপর সূর্যের আলো ধরে রাখতে চাইছে।

ফেলু দেখল, তখনই আকালুদ্দিন ছিক করে পানের পিক ফেলছে। চালে-ডালে এখন খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। বড় বড় মেটে হাঁড়িতে ডাল-চাল সেদ্ধ। যে যার মতো গলা পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছে। নামাজ পড়ার আগে অভুক্ত থাকতে নেই। আকালুদ্দিন কোথা থেকে একটা পান পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছে। ফেলু বলল, হালার কাওয়া! পান খাইয়া ঠোঁট লাল করছে। হালার কাওয়া। সে এবার

লক্ষ্য রাখল ভিড়ের ভিতর আকালুদ্দিন কোনদিকে যায়। যেন আকালুদ্দিন না এলে এই ধর্মযুদ্ধে সে আসত না। সে সব সময় আকালুর ওপর কড়া নজর রেখেছে। ধর্মগত প্রাণ তার, নতুবা সে আসত না। পবিত্র ইসলামের জন্য কিছু করা চাই। সে প্রায়ই খোয়াব দেখেছে, এক নির্জন মাঠে, ভাঙা ইট-কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে সে নামাজ পড়ছে। ভাঙা ইট-কাঠ এবং গম্বুজ কাবা মসজিদের সামিল। মসজিদের পাশে হিন্দুদের দেবদেবীরা পাথর হয়ে আছে। ভাঙা হাত-পা নিয়ে ওরা পড়ে আছে। এমনিতেই ঘুম আসে না। কখন আন্নু রাতে চুরি করে মাঠে নেমে যায় এই এক ভয় তার, আর যখনই ঘুম আসে তখন শুধু একটা দৃশ্য চোখে ভাসে—সে একটা জঙ্গলের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর বসে নামাজ পড়ছে। বাবুরা ভাঙা মসজিদের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে। সাতটা মসজিদের খরচ চালায়। তবু তোমরা মিঞা মানুষেরা মা আনন্দময়ীর পাশে এই বনজঙ্গলে নামাজ পড়তে পাবে না।

এ-ভাবেই জিদ বেড়ে গেছে ফেলুর। সে চলে এসেছে। আসার সময় সারাটা পথ সে নজর রেখেছে আকালুর ওপর। হালার কাওয়া—সে আবার সবাইকে ধর্ম যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজে একা গাঁয়েথেকে যেতে পারে। আন্নুর সাথে বড় তার পিরিত পিরিতের ভয়ে সে সারাটা পথ, এমনকি এখনও সব সময় আকালুকে চোখের ওপর রেখেছে। চোখের ওপর থেকে আকালু হারিয়ে গেলেই সর্ষে ফুল দেখছে সে। কিন্তু এখন মুখ দেখে মনেই হয় না আকালুর, সে আন্নুর কথা ভাবছে। ফেলু ভীষণ উত্তেজিত, যেমন সবাই উত্তেজনা নিয়ে এই চরে ঘোরাফেরা করছে এবং নির্দেশের অপেক্ষায় আছে—কখন ওরা সব ভেঙে তছনছ করে দেবে।

অথচ এই চরে ফেলুর কোরবানের চাকুটা রোদে ঝলসে উঠলে সে দেখতে পেয়েছিল—পিলখানার মাঠ পার হলে একদল পুলিশ সঙ্গিন উঁচিয়ে আছে। ওর কেন জানি প্রাণের জন্য মায়া হতে লাগল। তবু রক্তে উত্তেজনা। আল্লা সব দেখতে পাচ্ছেন। মাথার ওপর এত বড় ফকির মানুষটা যখন রয়েছে, তখন আর ডর কিসের! সব বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বের হবে, কোনদিন আর গুলি বের হবে না। কারবালা প্রান্তরে হাসান-হোসেনের যুদ্ধ, অথবা এজিদ, কারা যে কি করে! ধর্ম সার জেনে সে তার মন শক্ত করে রাখল এবং এক হাতে বাগি গরুটাকে টেনে রাখল। হালার কাওয়া! গরুটা ভয়ে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। অবলা জীব সে এ সবের কোন মানে বুঝতে পারছে না। ফেলু এবার প্রাণের দায়ে হা-হা করে হাসছিল।

তখন দু'পক্ষ থেকেই ধ্বনি উঠছে। এক পক্ষ এই যে দেবী আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতীক, গলায় মুণ্ডমালা মা জননীর, হাতে খাঁড়া, চোখে বিদ্যুৎ খেলছে—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের দেবী মন্দিরে আছেন, থাকেন, কার সাধ্য তারে অপবিত্র করে! তার পাশে এক দল মানুষ নামাজ পড়ে কোরবানী দিয়ে যাবে সে হয় না। রক্তের ভিতর হিন্দু মানুষের হাজার লক্ষ অসুর। ওরা নাচছে টগবগ করে। রক্ত ফুটছে। ওরা চরে একটা গাইগরুর হাম্বা ডাক শুনে স্থির থাকতে পারছে না। হাত তুলে বর্শা নিক্ষেপ করে চিৎকার করে উঠল, বন্দে মাতরম্। মা আনন্দময়ী কি জয়!

এভাবে জয়ধ্বনি চরের দু'পাশে। চরে আর পিলখানার মাঠে। দুই দল যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। কালিবাড়ির চারপাশটায় যুবকেরা দাঁড়িয়ে সৈনিকের মতো পাহারা দিচ্ছে। পাশের বনটা শুধু একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর যা আছে নিজেরা রক্ষা করো—কিংবা সবটাই আছে, সীমানা কেউ জানে না। কতদূর পর্যন্ত এর বিস্তার। যেমন কেউ জানে না বস্তুত এই ঝোপে জঙ্গলে আদতে এটা কি, মসজিদ, মন্দির না কোন বোম্বেটেদের দুর্গ, কি হাজার রূপসী এখানে নেচে গেয়ে গেছে। কেউ সঠিক জানে না অথচ যে যার মতো একে মসজিদ মন্দির বানিয়ে নিচ্ছে। ভিতরে কেউ যেতে পারে না। রাজ্যের শেয়াল খটাশ এখানে বসবাস করে। রাত্রিবেলা আরতির ঘণ্টা বাজলে গণ্ডায় গণ্ডায় শিয়ালের হুক্কা হুয়া। নিশীথে শিবা ভোগ হলে অন্ধকারে একশোটা নীল চোখ জীবের, বনের ভিতর উঁকি দিয়ে থাকে। সুতরাং এই সব মাংসাশী প্রাণীরা এখন ঝোপের ভিতর থেকে এত মানুষ দেখে বড় তাজ্জব বনে গেছে।

শেয়াল খটাশের বাস। দিনের বেলা ঢুকতে ভয়। কত সব বিষাক্ত সাপখোপের বসবাস। সূর্যের আলো পর্যন্ত বনের ভিতর ঢুকতে পায় না। এমন সব নিবিড় জঙ্গল। কি যে ছিল এটা! গম্বুজ দেখে মুসলমানেরা ভেবেছে এটা মসজিদ, খিলান দেখে বাবুরা ভেবেছে এটা মন্দির এবং ঐতিহাসিকদের মতে—কারণ তারা মিনারে নানারকম হলুদ-নীল কাচের সন্ধান পেয়েছিল, স্থাপত্যশিল্পে পর্তুগীজদের কাছাকাছি—সুতরাং জলদস্যুদের আখড়া না হয়ে যায় না। এই হাস্যকর অবস্থায় মানুষেরা এখানে এসে ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষ, না কোরবানীর জন্য মানুষ বোঝা যাচ্ছে না। কারণ ভাবলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই এক হাস্যকর ব্যাপারে এ-দেশে, গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। পারে না হয়তো, কোনদিনই পারে কিনা তাও ভাবা যায়

না—যদি না এর ভিতর আলি সাহেবের হাস্য জেগে উঠত। এই দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ জাগিয়ে দাও। অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা এখন বলা যাবে না। শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলা যেত, কিন্তু কিছু উপরতলার মানুষ রয়ে গেছি আমরা, আমাদের তবে কি হবে! তার চেয়ে ভাল ধর্ম জাগরণ। ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আখের গুছিয়ে নাও।

স্বতরাং ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আপাতত আখের গোছানো হচ্ছে। জসীম বসে আছে মাঝখানে। পিলখানার মাঠে। সে হাতির স্নানের সময় হলেই পিলখানার কাটা গাছের গুঁড়িতে এসে বসে থাকে। তার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সে যে বসে রয়েছে পথ থেকে টের পাওয়া যায় না। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ সে সব দেখতে পাচ্ছে। সে আছে মাঝখানে। সে বসে দুদিকে দু-দল মানুষের লম্ফঝম্ফ দেখছে।

আর দেখছে ঈশম। সে দেখছে সকাল থেকেই হাটুরে মানুষের মতো লোক যাচ্ছে সেই ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়বে বলে। সে যায় নি। সে তরমুজ খেতে বসেই নামাজ পড়ছে। নামাজ পড়ছে না চুপচাপ বসে আছে হাঁটু মুড়ে বোঝা দায়। দু'হাত সামনে প্রসারিত। পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে থাকা শান্ত মূর্তি এবং লম্বা শাদা দাঁড়ি, নীল রঙের তফন, বিস্তীর্ণ বালুবেলা, সোনালি বালির নদী আর এক পাগল মানুষ কেবল নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে হেঁটে যায়—কোথায় যে যায়, কি যে চায় মানুষটা! অথচ তিনি না হেঁটে গেলে কেমন খালি খালি লাগে এই মাঠ এবং নদী। এদেশে তিনি এমন হয়ে গেছেন—তিনি না হেঁটে গেলে যেন সূর্য উঠবে না, পাখি ডাকবে না এবং গাছে গাছে ফল ধরবে না, ফুল ফুটবে না। এই পাগল মানুষ আছেন, নিশিদিন তিনি মাঠে মাঠে বনে বনে অথবা বালুবেলাতে পায়ের ছাপ রেখে যান; যেন নিত্য বেড়ে-ওঠা ঘাস ফুল পাখির মতো তিনিও এই জন্মভূমির খণ্ড অংশ হয়ে গেছেন। তাঁর এই ক্রমান্বয় হাঁটা, কবিতা আবৃত্তি, বড় বড় চোখে তাকানো, সরল শিশুর মতো ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকো তোমরা, এমন মুখ ঈশমকে কখনও কখনও বড় অভিভূত করে রাখে। সে বলল, কর্তা, বাড়ি যান, আসমানের অবস্থা ভাল না।

অথচ ছাখো, আকাশ কি নির্মল। অথচ ঈশম এমন কথা কেন যে বলল! ঈশম কি টের পেয়ে গেছে এখানে এবার দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। এই নিষ্পাপ মানুষটাকে কেউ হত্যা করতে পারে! সে তার এমন নির্মল আকাশের নিচে

বসে পাগল মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছে কেন। আসমানের অবস্থা ভাল না বলছে কেন। ওর ভিতরে কি একটা ভয়ঙ্কর আদিম অন্ধ বিবেক বুঝতে পারছে অদৃশ্য এক আকাশের নিচে ভয়ঙ্কর কালো একটা মোষ দিনরাত ফুঁসছে। সুযোগ পেলেই পাগল মানুষকে ফালা ফালা করে দেবে!

তখন কোরবানের পশুটা ভয়ে হাম্বা হাম্বা-ডাকছে। যেন সে তার বাছুর হারিয়ে এই মানুষের মেলায় চলে এসেছে। সে তার অবলা চোখে সব দেখছিল। ভিড় ক্রমে বাড়ছে। ফেলুর একটা হাতে এত শক্তি! অন্য হাতটা তো ওর মরা। শুকনো লতার মতো শুধু গায়ে লেগে আছে। যে কোন সময় ফেলুর ইচ্ছা হয় ওকে টেনে ছিঁড়ে শরীর থেকে ফেলে দিতে।

ফেলু জীবটাকে এক হাতেই মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক হাতেই সে ধর্মের নামে কত কিছু করতে পারে মানুষেরা দেখুক। অঞ্চলের মানুষেরা দেখুক, ফেলু, যে ফেলুর হাত গেছে বলে সবাই পঙ্গু ভেবেছিল, যার বিবি আতরের গন্ধে পাগল বনে যায়, দিকবিদিক ফাঁক পেলেই ছোটে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, সেই ফেলুর কি সাহস! সে আজ এক হাতে এমন পুষে বড় করা জীবকে, জীব থেকে সে কত বেশি অনুদান পাবে আশা করেছিল, দিন নেই রাত নেই ঘাস চুরি করে এনে খাইয়েছে, দুবেলা বাছুরটাকে সে কি আশ্চর্যভাবে সবল করে তুলেছে, সেই বাছুরকে সে এখন বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে ধর্মের নামে কোরবানী দেবে। কত বড় ফেলু এই যেন দেখানোর ইচ্ছা। যেমন সে হা ডু ডু ডু ডু বলে প্রতিপক্ষের ওপর চেপে বসত তেমনি সে এখন ধর্মের নামে শরীরে জুস পাচ্ছে। এক হাত গেছে বলে তার কোন সরম নেই। বরং অন্য হাতটা এত বেশি শক্ত, এবং এত বেশি সাহস তার প্রাণে যে ধর্মের নামে এক-কোপে দশটা কাফেরের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্বালা এই কোরবানের পশু নিয়ে। এতটা পথ সে বেশ টেনে এনেছে। শিঙে ছুটো প্যাচ দিয়ে রেখেছে বলে খুব বেশি একটা ছুটতে পারে নি। এখন কি বুঝতে পেরে চার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে গেছে। নড়ছে না। এতবড় মেলার ভিতর তাকে ছোট করে দিচ্ছে। সে যে ফেলু এটা কেন হালার গরু বোঝে না।

এই দশ ক্রোসের মতো পথ মোটামুটি ভালোয় ভালোয় চলে এসেছে। কোন গোঁয়াতুর্মি ছিল না। কিন্তু মজজিদে নিয়ে যেতে যত গোঁয়াতুর্মি। তা তুমি এক বাগি গরু আর আমি এক একচক্ষু ফেলা। কে কারে খায় দেখা যাক। বলেই সে শক্ত হাতে আবার লেজ মুচড়ে দিল। পাশের লোকেরা

বলছে, আরে দ্যাখো মিঞা সিপাইগ কাণ্ড! নলে গুলি নাই। ফাঁকা আওয়াজ করে। তোমাগ ডর দেখায়।

ফেলু তাচ্ছিল্য করে সব। তার তো সব জানা। জানা বলেই সে ভোররাতে আজান দিয়েছে। লোক জড় করেছে মিছিলের জন্য। মশাল জ্বালিয়ে সে সারারাত এ গাঁ ও গাঁ ঘুরেছে। সে মিছিলের শেষে। মিছিল যায়, ধর্মের মিছিল। মিছিলে হাজার সবুজ পতাকা, লাঠি, সড়কি এবং ধুলো উড়ছে। ওরা যায় আর যায়। যারা আরও দূরের মানুষ রাতে রাতে ওরা মশাল জেলে বের হয়েছে। ওরা এসে গোলাকান্দালের বড় বটগাছটার নিচে সবাই থামবে। সেখান থেকে আবার লম্বা মিছিল। বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়া, লতব্দি, বলব্দি এবং দন্দির মাঠ থেকে যারা মিছিল বের করেছে ওরা হাসান পীরের দরগায় এসে থেমেছে। ওরা দেখেছিল হাসান পীরের দরগাতে তখন পাগল ঠাকুর। এতবড় মিছিল দেখেই তিনি বের হয়ে এসেছেন। তিনি বুঝি পীরের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন। আর কোরবানের পশুটার কথা ছিল হাসান পীরের দরগা পর্যন্ত জোড়ে কদম দেবে—কারণ তখনও মিছিলটা পুরো মিছিল নয়, এদের আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শুনে আরও মানুষ এই মিছিলে যোগ দেবে, যারা দেবে না, কাফের তারা, তারা পবিত্র ইসলাম নয়, এমন সব লেখা আছে বড় বড় ইস্তাহারে। দরমাতে সব বড় বড় ইস্তাহার এঁটে নিয়েছে। মাথার ওপর সেই সব ইস্তাহার। আর ক্রমে ওরা এগুচ্ছিল। হিন্দু গ্রামের পাশে এলেই ভবাবহ ধ্বনি। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থরা ভয়ে বের হচ্ছে না মাঠে। কেবল পাগল ঠাকুর হাসান পীরের দরগায় মরা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার ওপর অজস্র শকুন। ওরাও দেখছে একটা ধর্মের মিছিল যায়। কেউ কেউ উড়ে গেল। কতদূর যাচ্ছে মিছিলটা দেখতে।

কোরবানের পশুটা পথে বেশ হাঁটছিল। আর এখন শক্ত হয়ে আছে! ফেলু কিছুতেই নড়াতে পারছে না; ঠিক যেমন হাসান পীরের দরগা পার হলে একটা মশালের মিছিল দেখে চার পা শক্ত করে দিয়েছিল। সে এটা জানত। দলটা বড় হলে, মিছিলে মশাল জ্বললে কোরবানের পশুটা ভয় পাবে। গলাটা টান টান করে রাখবে। দড়ি টানলে এক পা নড়বে না। চোখেমুখে আতঙ্ক। আমারে তোমরা কোন পীরের দরগায় নিয়া যাইবা। এই ত আছিল একজ্বা পীরের দরগা, হাসান পীরের দরগা—এহানে আমারে রাইখা যাও। মনের সুখে

ঘাস খাই। কিন্তু শালীর শালী কোরাবানের জীবটা একেবারে ভুলকি চালে সেই যে হাঁটছিল আর থামে নি। মাঝে মাঝে ঘাস দেখলে মুখ দিতে চেয়েছে, কিন্তু ফেলুর পা যাবে কোথায়! এক পা তুলে হড়কে শালা লাথি। যেন এই লাথি সে জীবের পাছায় মারছে না, মারছে বিবির পাছায়। শক্ত পা ওর নিমেষে এত বেশি রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে আজ হোক কাল হোক বিবি তারে খাবে। খেতে না পারলে নিশুতি রাতে পালাবে। নাকি মানে মানে সে তালাক দেবে বিবিকে! তালাক দিলে লাভ হবে বিঘা দুই ভুঁই আর জমি যা আকালুদ্দিন দশকুড়ি দশ টাকায় বন্ধক রেখেছে সব খালাস পাবে। সে যে এখন কি করে বুঝতে পারছে না। এতবড় ধর্মযুদ্ধে এসেও সে তার সামান্য ক্ষয়ক্ষতির কথা ভুলে থাকতে পারছে না। দিমু এক হাতে নালি ছিঁড়া। বোঝবা মিঞা মরদ আমি ক্যামন একখানা! হালার কাওয়া।

হালার গরু! গরু তোমার মুখ দিমু ভাইঙ্গা! তুমি নড়তেচড়তে চাও না। কেবল মুততে চাও। গরুটা ভয়ে কেবল মুতছে। যে জীবটা এতক্ষণ বেশ আসছিল, বেশ হাঁটছিল, যেন সেও সবাইর সঙ্গে নামাজ পড়তে রওনা হয়েছে, সেই জীব এখন ঘাড় শক্ত করে পা বালিতে ঢুকিয়ে টান টান করে রেখেছে গলা। আর টানাটানি করলেই হড় হড় করে মুতে দিচ্ছে। সে যে কি করে এতবড় চরে! এত ভিড়ের ভিতর তাকে জীবটা কি যে ছোট করে দিচ্ছে! কিছুতেই সে হাঁটিয়ে নিতে পারছে না। ক্রমে সবাই নদীর পাড়ে উঠে যাচ্ছে। দলে দলে ইস্তাহার মাথার ওপর তুলে নাচাচ্ছে। আলি সাহেব একটা চোঙ মুখে টিবির ওপর উঠে একের পর এক হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বর্ণনা করছে। ধর্মের প্রতি আবহমানকাল ধরে যে হিন্দুদের ঘৃণা, সেই ঘৃণার কথা তীর্যক ভাষায় প্রকাশ করছে। সবাই শুনতে শুনতে কান খাড়া করে দিচ্ছে। গরম রক্ত এবার টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। পুব দেশে যত কাফের আছে, কাফের নিধন করে পতাকা ওড়াও। কোরবানের পশুটা পর্যন্ত গলা তুলে শুনতে পেল—সেই যেন ঢাক বাজে ঢোল বাজে—জীবের গলা কাটলে শুধু থাকে রক্ত, অবলা জীবের মুখে টগবগ করে রক্ত ফুটছে, এ জীবের তবে নিদান হাঁকা দায়। ফেলু মরিয়া হয়ে হ্যাঁচকা টান দিল জীবটাকে। এবং হ্যাঁচকা খেয়ে সে পড়ে যেত, ফলে আর এক হাত সম্বল থাকত না, হাতটা তার ভাঙ্গত। কিন্তু তখনই দুটো ফাঁকা আওয়াজ পীলখানার মাঠ পার হলে। ভিড়ের ভিতর থেকে ফেলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ফাঁকা আওয়াজেই যে যেদিকে পারছে

ছুটছে। এবং চরের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু দূর এসেই ফেলু বুঝি টের পেল ওটা ফাঁকা আওয়াজ। সে একটা মানুষের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে বুঝে ফেলল সবই ফাঁকা আওয়াজ। গরুটা ফাঁক বুঝে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। সেও শালা ফাঁকা আওয়াজ। সে বলল, হালার কাওয়া! তুমি গরুর পো টের পাইছ, গলায় তোমার আমি চাক্কু চালামু। আল্লার নামে কোরবানী দিমু।

আলি সাহেব তখন টিবিতে উঠে চেঁচাচ্ছে। —ভয় নেই। আপনারা ভয় পাবেন না। সব ফাঁকা আওয়াজ। আল্লার কুদরতে বন্দুকের নল থেকে গোলাগুলি বের হবে না। সব ধোঁয়া বের হবে। সব ধোঁয়া! ধোঁয়া। আপনারা কদম কদম বাড়ায়ে যান।

কদম কদম বাড়ায়ে যান, দাঁড়ায়ে যান সামনে। আজ সবে-বরাত। সব মৃত আত্মারা বের হয়ে পড়েছে। তারা আজ মুক্ত। তারা দেখছে আপনারা যা সব ছাওয়াল পাওয়াল আছেন—আল্লার দুনিয়ায় কিডা করছেন। আলি সাহেব কলিকাতা শহরে থাকেন। কথায়বার্তায় পুব দেশের মানুষের মতো বলে আপনার জন হয়ে যান মাঝে মাঝে। তিনি বললেন, গরু, ভেড়া, দুম্বা যা কিছু কোরবানী দেবেন, সবই তারে দিবেন। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন। না পারেন নিজেরে দেবেন।

এই শুনে সবাই আবার এগুতে থাকল।

বাবুরা ছাদ থেকে দেখছিলেন এক ফাঁকা আওয়াজেই সব ছুটে পালাচ্ছে! বাবুদের ছেলেরা এমন দেখে কি হল্লা! আনন্দে ছুটে এসেছে নদীর পাড়ে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীন নিয়ে বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে বড়বাবুকে দেখতে দিচ্ছে। শংকা তার কমছে না। কারণ আবার সবাই চরে এসে জমা হচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরে গেছে পুলিশ সাহেব ভিড়টা এগুতেই ফাঁকা আওয়াজের নির্দেশ দিয়েছেন। ওরা টের পেয়ে ফের মরিয়া হয়ে গেছে। সে দেখল, যারা কোরবানীর জন্য পশু নিয়ে এসেছে তারা এবার সকলের আগে হাঁটছে। ভয় নেই। বিন্দুমাত্র শংকা নেই। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন—না পারেন, নিজেরে দেবেন। ওরা যেন নিজেকে দিতে এবার যাচ্ছে।

বল্লমের ইস্পাতে সূর্যাস্তের রোদ পড়ে ভীষণ এক কাণ্ড। হাজার হাজার এমনি সব ইস্পাতের ফলা আকাশের দিকে কারা ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওরা কদম কদম

এগিয়ে আসছে। কেউ যেন দামামা বাজাচ্ছে। তালে তালে উঠে আসছে কালীবাড়ির দিকে। বাজার বাঁয়ে রেখে ঠিক তারকবাবুর মাঠ বরাবর উঠে আসছে। মাঠে এখন কেউ নেই। কিছু কনেস্টবল। হাতে বন্দুক। একপাশে গোরা পুলিশ সাহেব। বাবুরা কৃতীলোক। ভূপেন্দ্রনাথ বাবুদের চিঠি নিয়ে সদরে দেখাসাক্ষাৎ করে এতবড় একটা বন্দোবস্ত করেছে। নতুবা সুরাবর্দি সাহেবের আমল। লীগের রাজত্ব দেশে। সামসুদ্দিন বড় গোছের নেতা। সে আর এ-সবে মাথা দিতে পারে না। হরদম সে কলকাতা যাচ্ছে। আসছে। বাবুরা কৃতী না হলে এমন হয়। বন্দুকের সঙ্গীনে সূর্যাস্তের আলো। ওরা সবাই এখন নিলিং পজিশানে আছে। কেবল আদেশের অপেক্ষায়। হিন্দু-মুসলমানে এমন মারমুখী দাঙ্গা তাকে রুখতেই হবে।

ওরা উঠে আসছে তো আসছেই। ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাচ্ছে না। শুধু অবলা জীবের চোখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। কান ঝুলে গেছে তার। ফেলু একটু হড়কে গেলেই বাগি গরুটা লেজ তুলে পালাবে। এই যে তামাশা—শালা সে কে, সে কিসের নিমিত্ত এসেছে এখানে বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার ফেলুর হাত হিলে গেলেই হল, তখন দেখবে কার সাধ্য তারে আটকায়। কিন্তু ফেলুর এক হাতই এত শক্ত যে গরুটা তা গলায় টের পাচ্ছে। দড়িটা টানাটানিতে গলায় বসে যাচ্ছে। জীবটা শ্বাস নিতে পারছে না। সুতরাং শ্বাস ফেলার জন্য সেও কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে।

—হল্ট। একসঙ্গে বিশটা রাইফেলের ট্রিগারের শব্দ। ওরা সেফটি অন করে দিয়েছে। আর এক পা এগুলেই ট্রিগার টিপবে।

আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন। দামামা বাজছে তালে তালে। মহরমের মতো ঢোল বাজছে। আর তালে তালে সেই এক পবিত্র কোরআনের বাণী ভেসে বেড়াচ্ছে যেন কানে, না পারেন নিজেরে দেবেন। ওরা নিজেদের দিতে যাচ্ছে।

রূপগঞ্জ থানার ইসমাইল দারোগা চোঙ মুখে হাতে লেখা কাগজ পড়ে যাচ্ছিল, আপনারা আর অগ্রসর হইবেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই আইন ভঙ্গ করা হইবে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করিলে গুলি করিতে বাধ্য থাকিব। আমাদের গোস্তাকি ক্ষমা করিবেন। অন্যত্র আমরা আপনাদের ধর্মকর্মের দাসানুদাস। বলেই সে পুলিশ সাহেবের সামনে এসে সেলুট করল এবং কানে কি ফিস্ ফিস করে বলল। তারপর কাগজটা ফিরিয়ে দিল।

লাল বর্ণের মানুষ। চোখমুখ এমনিতেই লাল। সূর্যাস্তের জন্য সে মুখ আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বয়স খুব অল্প। দেখে মনে হয় শংকায় ওর গলা শুকিয়ে আসছে। দামামার শব্দে কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ওরা এগিয়ে আসছে তো আসছেই।

নানা রকমের শব্দ উঠছে, গরু-ভেড়ার শব্দ, ঢাক-ঢোলের শব্দ, চোঙ মুখে বক্তৃতা। উত্তেজনা জিইয়ে রাখা চাই। সাহেবের মাথায় সব শব্দ রেল গাড়ির চাকার মতো ঝন ঝন করে বাজছে। এবং ঠিক তক্ষুণি ওরা এত কাছে এসে গেছে যে হাতের কাছে পেলে মশালে আগুন জেলে ওদের সবাইকে পুড়িয়ে মারবে। একটা বর্শা ঠিক তক্ষুণি ইসমাইল দারোগাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারল কে! জনতার ভিতর থেকে হাজার হাজার বর্শা যেন ছুঁড়ে দেবে এবার তারা। এত প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে গেল যে ইসমাইল টের পেল না, পিছনের দিকে তাকাতেই দেখল সাহেবের কান উড়ে গেছে।

ইসমাইল এবার চোখের উপর সর্ষেফুল দেখতে থাকল।

যেন এতগুলি মানুষের জীবন রক্ষার্থে সাহেব নিজের রক্তাক্ত মুখ ঢেকে হুকুম দিলেন ফায়ার!

বাস্, ফায়ার। বাস্, গুলি ছুটতে থাকল। বন্দুকের নল থেকে এবার আর ধোঁয়া বের হচ্ছে না। কেবল গুলি বের হচ্ছে। বিশ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েই সিপাইরা ফের এ্যাটেন্‌শান হয়ে গেল। হুকুম পাবার জন্য ফের কান খাড়া করে রাখল। কিন্তু কে কাকে হুকুম দেবে! আহত পুলিশ-সাবকে এখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাছারিবাড়িতে। শিলাবৃষ্টির মতো সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা চরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। নিমেষে চর ফাঁকা! সূর্যাস্তের লাল রঙ, আর কত মানুষের তাজা রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। আর সেই কোরবানীর পশুগুলি পড়ি-মরি করে ছুটছে। ফেলু ছুটছে। ধুনধুমার লেগে গেল চোখে-কানে। সে টের পাচ্ছে না কখন ওর মরা হাত উড়ে গেছে। হাতটা যে এতদিন রক্তশূন্য ছিল, অচল অসাড় হাত, যা সে বার বার কতবার ভেবেছে সময় ও সুযোগ মতো একদিন কলার ফ্যাঁতা কাটার মতো শুকনো হাতটা হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলবে, পারে নি। বড় মায়া তার হাতের জন্য। অসার হাতটার জন্য সে কষ্ট পায়, তবু সে পারে না ফেলে দিতে—আজ একটা বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হয়ে সোজা ওর হাত উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রাণটা উড়ে যেত, একটু ডান দিক ঘেঁষে গেলেই বুকের কলিজাটা ফালা ফালা হয়ে যেত।

এমন তার ধুনধুমার লেগে গেছে যে সে এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে হাতটা থেকে একটু একটু করে পানশে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে কোরবানী দেবে বলে একটা পশু নিয়ে এসেছিল —সেটা না থাকলে খালি খালি লাগার কথা—তা পর্যন্ত সে টের পাচ্ছে না। সে একা, কেউ নেই পাশে। সে দাঙ্গার আসামী। তাকে ধরার জন্য এবার যেন সবাই বের হয়ে পড়েছে। কেউ পাশে নেই। সবাই যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। ওর চোখের সামনে ত্রিশ-চল্লিশটা মানুষ জবাই করা পশুর মতো হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। এই অন্ধকারেও সেইসব লাশ তাকে ধরার জন্যে ছুটছে,—কোন খানে যাও মিঞা। আমাগ কার কাছে রাইখা যাও।

ফেলু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। অন্ধকারে মাঠের ওপর বলতে বলতে যাচ্ছে—হা আল্লা, এডা কি হইল। কোথায় গ্যালা মিঞা ভাইরা। এই রক্ত এখন কার বদলে যায়।

কেবল মনে হতে লাগল ওর মাথার ভিতর এখন কে মহরমের ঢোল বাজাচ্ছে। কেউ তার কথায় জবাব দিচ্ছে না। দিলেও সে শুনতে পাচ্ছে না। সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই।

পঙ্গু হাতটা নেই বলে শরীর হাল্‌কা। শুধু ক্ষতস্থানটা টনটন করে ব্যথা করছে। তাও সে কানেচোখে ধুনধুমার লেগে যাওয়ায় টের পাচ্ছে না। সে উথাল-পাতাল ছুটছে। কোনদিকে যে যেতে হবে, কোথায় কিভাবে ছুটলে পথ সংক্ষিপ্ত হবে সে তা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। কেবল সে যেখানে হিন্দু গ্রাম পড়ছে, সে-সব গ্রাম এড়িয়ে যাচ্ছে। সে একটাও মিছিলের লোক পাশে দেখতে পেল না। সে, কোনো লোক ছুটছে দেখতে পেলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরতে আসছে হয়তো। বাবুদের সব জঙ্গী কুকুরের মতো ছেলেরা বন্দুক কাঁধে বের হয়ে পড়তে পারে, এবং খবর রটতে কতক্ষণ, সবাই জেনে গেছে বুঝি ত্রিশ-চল্লিশটা লাশ পড়ে আছে শীতলক্ষ্যার চরে। সে হেরে যাওয়া মানুষ। বড় মাঠের অন্ধকারে সে টের পাচ্ছে না সে এখন কোথায় আছে। বাগি গরুটা থাকলেও এ-সময় ওর সামান্য বুঝি সাহস থাকত। নিজের বলতে তার এখন কিছু নেই। এমন কি এতদিনের হাতটা যা পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল, সে যে কি ভালবাসায় হাতটা শরীরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, এবং কত হেকিমি দানরি যে করেছে হাতটার জন্য, হাতে কালো তারে কড়ি বেঁধেছে, এই

ধর্মযুদ্ধে এসে তার তাও গেল। এখন হালার কাওয়া, সে কানা ফেলু, সে টুণ্ডা ফেলু। হালার কাওয়া, পাগল ঠাকুর তারে এমন করেছে। সে কেন জানি একা। এই অন্ধকার মাঠে এসে সে তার হাতটার জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সবাই দেখতে পাবে সকাল হলে একটা মরা হাত নদীর চরে পড়ে আছে। লাশগুলোর সঙ্গে মরা হাতটা বড় বেমানান। লাশের সঙ্গে মরা হাতটার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে আর পারছে না। চারপাশে ঘন অন্ধকার এবং কিছু জোনাকি জ্বলছে ভুতুড়ে চোখের মতো। সে যে কতক্ষণ তাড়া খেয়ে ছুটেছে এবং কতটা পথ এসে গেছে এক তাড়ায় অনুমান করতে পারল না। মনে হল সে একটা বড় গাছের নিচে কখন দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার গাছটার নিচে শুয়ে পড়বে ভাবল। সকাল হলে সে বুঝতে পারবে কোথায় এসেছে এবং কিভাবে যে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে, আকালুদ্দিন যদি আগে আগে ফিরে যায়। সে নেই গাঁয়ে। ওর তবে পোয়াবারো। সে ফের উঠে আবার ছুটবে ভাবল। কিন্তু দাঁড়াতেই মনে হল, শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। অবশ হয়ে গেছে পা। এত শক্তি পায় তার আর এখন সে এক পা নড়তে পারছে না। সে বসে পড়ল এবং তার ঘুম এসে গেল।

সকালবেলায় তাজা রোদের ভিতর তাকে কে যেন ঠেলছে। তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাতের ঘুমে সে এমন অচেতন যে, সে কিছুতেই চোখ মেলতে পারছে না। ওর পিঠ কে চেটে চেটে দিচ্ছে। পিঠে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে। তবু সে আলস্যে উঠতে পারছে না। চোখ মেলতে পারছে না। সে যে দাঙ্গা করতে গেছিল গতকাল তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। এবং চোখের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়লে সে ধড়ফড় করে জেগে গেল। প্রথম সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, ওর বাগি গরু এটা। গরুটা ওর পিঠে যা নুন ছিল চেটে চেটে খেয়েছে। হালার গরু বড় সেয়ানা। পথ চিনে ঠিক চলে এসেছে। না কি গরুটা ওর সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। সে খেয়াল করে নি। গরুর আর ধুনধুমার লাগার কথা নয়। সে তাড়াতাড়ি ভাবল, গরুটার মুখে একটা চুমু খাবে। কিন্তু খেতে গিয়েই মনে হল ওর বাঁ হাতটা কাঁধে আর ঝুলে নেই। গরুটা দেখে ফেললে ভীষণ সরমের ব্যাপার। সে তাড়াতাড়ি গামছা দিয়ে ক্ষতস্থানটা ঢেকে দিল। গাইগরু আর বিবি সব সমান। তুবলা স্বামী টের পেলে কেবল মাঠে পালাবার চায়।

সে বাগি গরুটা নিয়ে উঠে চারিদিকে তাকাতেই এবার বুঝল—সে উর্ধ্বশ্বাসে ঠিক পথেই চলে এসেছে। এই সেই ফাওসার বিল সামনে, এখানে কাটা মোষের মাথা ফেলে চলে গিয়েছিল কারা। এখানেই জালালি জলে ডুবে মরেছিল আর পাগল ঠাকুর জালালির মৃতদেহ নিয়ে মাঠের ওপর ভয়ে ছুটছিলেন শাদা জ্যোৎস্নায়।

সে গরুটাকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় তুলকি চালে। য্যান সে তার বিবিকে নিয়ে মেমানবাড়ি বেড়াতে গেছিল। দেখলে কে বলবে ওর মরা হাতটা নদীর চরে পড়ে আছে। হাতটা কার, এই হাত, তুবলা হাত, না কি সারা রাত রক্ত পড়ায় হাতটা এমন শীর্ণ হয়ে গেছে—হাতটা নিয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড বেঁধে যাবে। মানুষটা কে, কোন মানুষের এমন একটা শীর্ণ হাত থাকতে পারে!

কিন্তু গ্রামের কাছে এসেই ওর বুকটা শুকিয়ে গেল। বিবিটা ওর ঘরে আছে তো! যদি থাকে তবু ভয়। ওর কাটা হাত দেখে বিবিটা আড়ালে হাসবে। ক্ষতস্থানে দুব্বা ঘাসের রস ঢেলে দিতে দিতে মুখ গোমরা করে রাখবে। য্যান কত ভাব-ভালবাসা। ফেলুর দুঃখে আন্নুর ঘুম আসছে না। তর ছিনালি ছাখলে নিজের গলায় কোরবানীর চাকু চালাইতে ইসছা হয়। আমারে ফালাইয়া কোনখানে যাইস না। তুই ঘরে থাকলে বাথানের গরুর মত আমি হাম্বা হাম্বা করমু। আমি বেইমানি করমু না। কথা দে, যাইবি না। সে নিজেই কেমন একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

এখন ফেলুকে দেখলে মনেই হয় না গতকাল সে গিয়েছিল ওই জীব নিয়ে শীতলক্ষ্যার চরে। সে জীবটাকে কোরবানী দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা বড়বৌ দেখেছিল ফেলু যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। গরুটাকে সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। বরং গরুটাই তাকে যেন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গরুটা আগে আগে হাঁটছে। ফেলু পিছনে। সে তার আদরের পশুটাকে নিয়ে গিয়েছিল কোরবানী দেবে বলে। কিন্তু কি ব্যাপার। ফেলু ফিরে এসেছে! সঙ্গে এসেছে বাগি গরুটা। শীতলক্ষ্যার চরে নামাজ পড়ার কথা। বাড়িতে ওরা সারা দিন রাত দুঃশ্চিন্তায় থেকেছে। কোন খবর আসেনি। দাঙ্গা বেঁধে যেত কতক্ষণ। একবার ইচ্ছা হল ঈশমকে দিয়ে খবর নেবে। কি খবর নিয়ে এসেছে ফেলু।

বিকেলে ঈশম গিয়েছিল ফেলুর কাছে। ফেলু ঈশমের সঙ্গে কথা বলে নি। সে একটা ছেঁড়া কাঁথায় শরীর ঢেকে শুয়েছিল। আর এ-গ্রাম থেকে গেছে

আকালুদ্দিন। আকালুদ্দিনের খবর নিয়ে জানল, সে ফিরে আসেনি। আন্নুকে হাতের ইশারায় বড় কাফিলা গাছটার নিচে ডেকে নিয়ে গেলে, আন্নু বলেছে, তাকে কিছু বলছে না মানুষটা। এসেই যে কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়েছে আর উঠছে না। এমন কি আন্নুকে খুব কাছে যেতে দিচ্ছে না। কেবল মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে।

সুতরাং বিকেলের দিকে ঈশম কোন খবর নিয়ে আসতে পারল না। আর কার কাছে খবর পাওয়া যায়! সে সুলতানসাদি যাবে কি না ভাবল। অথবা নদীর চরে চুপচাপ বসে থাকলে টের পাবে, হাটুরে মানুষেরা যাবে, তারা ঠিক খবর নিয়ে আসবে। বিকেলে সে আর বাড়ি বসে থাকল না। ছইয়ের নিচে বসে তামাক খেতে থাকল এবং হাটুরে মানুষেরা যখন ফিরছে, কি বলাবলি করছে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ঈশম সন্ধ্যার পর এসে খবর দিয়েছিল, খুব দুঃসম্বাদ। জমিদারবাবুরা চল্লিশটা লাশ নামিয়ে দিয়েছে। সময় বড় খারাপ। বড়মামীর চোখের দিকে তাকালেই ঈশম যেন ভয় পেয়ে যায়। সে বলল, বড়মামী, এটা যে কি হইতাছে বুঝি না।

শচি বলল, তুই কাইল চইলা যা মুড়াপাড়া। ঠিক ঠিক কি হইছে জাইনা আয়।

—কাইল ক্যান। আইজ রওনা দেই। তবে কাইল বিকাল বেলা ফিরা আসতে পারমু।

ঈশম পরদিন বিকেলে এসে সব বিস্তারিত বললে, হিন্দু গ্রামের সব মানুষেরা ভীষণ খুশি হয়েছিল। ওরা সেদিন রাতে বিজয় উৎসব করেছিল গ্রামে। ওরা খোলকরতাল বাজিয়ে হরিসংকীর্তন দিয়েছে।

এর ভিতর সেদিন দু'জন মানুষ এসেছিল ফেলুর বাড়ি। মাথায় তাদের কালো রঙের টুপি। লাল রঙের পুচ্ছ টুপিতে। কালো রঙের পাতলা সস্তা আদ্দির পাঞ্জাবী। নিচে সাদা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা ভেতর থেকে জেল্লা মারছে। পরনে খোপ-কাটা লুঙ্গি। পাতলা নুর থুতনিতে। ওরা এসে লম্বা কাফিলা গাছটার নিচে দাঁড়াল। গরুর ঘরটা ফেলুর এখন পড়ে গেছে। একটা ঘর সম্বল। শোলার বেড়া ঘরে। নাড়া দিয়ে আন্নুর জ্বালায় একটা আঁতাবেড়া পর্যন্ত করতে হয়েছে। একটু আড়াল না করে রাখলে বিবি ধনেখালি শাড়ির মতো। চিৎপাত হয়ে থাকে খালি উঠোনে। যারা পথ দিয়ে যায়—এক খুবসুরত বিবি বান্ধা আছে এই ঘরে, ওরা চোখ মেরে যায়। ফেলু এটা বোঝে। এখানে, এই বড় কাফিলা গাছটার নিচে এলেই শালা মনুষ্য জাতির লোভ বেড়ে যায়। উঁকি দিয়া ছ্যাখে —ফেলু বাড়ি আছে কি নেই। বিবিটা তার কি করছে! দেখে ফেললে আন্নুকে, লোভে দু' ঠোঁট চুকচুক করতে থাকে। হালার কাওয়া।

সে সেজন্যে এক হাতেই সব ঠিকঠাক করে রাখছে। কেউ যেন তার বিবি-কে যখন তখন দেখতে না পায়, চারপাশে নাড়ার বেড়া, সব সময় বিবি ভিতরে থাকুক এমন ইচ্ছা তার। এটা শীতকাল নয়। গ্রীষ্মের দিন। এ-দিনে বড় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। কারণ সেই যে সূর্য মাথার ওপর উঠে কিরণ দিতে থাকে, কিছুতেই আর পশ্চিমে নেমে—হালার কাওয়া, অস্ত যেতে চায় না। চার-পাশটায় যত জমি সবই রোদে খাঁ খাঁ করছে। গাছের পাতা ঝরছে। উড়ছে। পুকুরের জল শ্যাওলায় নীল রঙ। নদীতে পায়ের পাতা ডোবে না। মানুষের দুর্দিন বলতে যা বোঝায়, একটা পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকে না গাছের নিচে। গরীব-দুঃখী মানুষেরা সব গাছের পাতা সংগ্রহ করে রাখছে। বর্ষার দিনে আগুন জ্বালাবে বলে। সারাদিন এখন আন্নু পাতা জড় করছে বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকারে। আঁতাবেড়ার আড়ালে বলে ফেলুর পরানে ডর থাকে না। ফেলুর বাঁ-হাতটা উড়ে গিয়ে যে ঘা-টা হয়েছে, কিছুতেই শুকোচ্ছে না। এখন প্রায় কুষ্ঠের আকার ধারণ করেছে। সারাক্ষণ ভনভন করে মাছি বসছে। সে বসে গামছা দিয়ে ঘায়ের মাছি তাড়াচ্ছিল তখন। আর ঘা-টাতে গরম রসুন গোটার তেল লাগাচ্ছিল। ঘায়ের ভিতরটা সারাক্ষণ জ্বলে। খাঁ খাঁ করে দাবদাহের মতো।

হেকিমি কবিরাজিতে কাজ দিল না। গোপাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল চুপি চুপি অষুধ আনতে। কিছুতেই কিছু হয় নি। মূলে আছে এর এক মানুষ। পাগল মানুষ। মুড়াপাড়ার হাতি দিয়ে মানুষটা তার এমন শক্ত শরীর বিনষ্ট করে দিল। সে যে কি করে! হালার কাওয়া, এখন বাতাসে ফুঁ দিয়া পাখি ওড়ায়। পদ্য কয় দুই চাইর লাইন। মেম সাহেবানির কইলজা চিবাইতে না পাইরা গাছের নিচে থাকে বইসা। হেসে কন্ গ্যাতচোরেতশালা! মাইনসে কয় সাধুসন্ত। ফকির। পীর হইতে পারে। ফেলু কয়, ঐ হালার কাওয়া যত নষ্টের গোড়া।

তখনই সে দেখল, কাফিলা গাছটার নিচে মোল্লাজানের মতো দুই মানুষ। ফিক্ ফিক্ করে দুই গালের ফাঁকে হাসছে। ফেলু মানুষ দু'টাকে দেখেই দ্রুত চোখ নামিয়ে আনল। আবার দুই মোল্লা মোতাবেক মানুষ। তারা কেন এসেছে সে জানে। গত সালেও একবার এসেছিল ওরা। সে সেদিন হাঁসুয়া নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। সে শালা কারে ডরায়। সে টুণ্ডা ফেলু। তবু মনের রোষটা ঠিক বেঁচে আছে। এখনও ফেলু হাঁক দিলে আন্নুর কলিজা কাঁপে। সে তেমনি হাঁকল, কেডা মিঞা গাছের নিচে খাড়ইয়া আছেন!

—আমি ভাইসাব আমিনুল্লা।

—আবার কি মনে কইরা!

—আইছিলাম একবার আকালুসাবের খুঁজে।

—তা সাহেব কি উঠানে আমার খাড়ইয়া আছে।

—তা ঠিক না।

—তবে কি ঠিক! উঠানে পাখি খুঁইজা বেড়ান।

ওরা এবার আমতা আমতা করতে থাকল।

—মিঞা মনে করেন বুঝি না কিছু!

—তা ঠিক না। মনে হইল একবার ফ্যালু মিঞার খবর নিয়া যাই।

—তা ভাল কাম করছেন। তামুক খান তাইলে।

—খাই তবে। যখন কইলেন খাইতে।

ফেলুর চোখটা এবার আঁতাবেড়ার ও-পাশে উঠে গেল। আন্নুটা আবার মানুষের গলা পেয়ে উঁকি দিচ্ছে কিনা! উঁকি দিলেই সে যদি হাতের কাছে হাঁসুয়া পায় তবে ফিকে দেবে বেড়ার ফাঁকে। এমন চোখেমুখে যখন ফেলু আঁতাবেড়ার দিকে তাকাচ্ছে, তখন আমিনুল্লা বলল, নাই।

চমকে উঠল ফেলু।—কি নাই।

—আকালুসাব নাই।

—নাই ত কই গ্যাছে। ফেলুর পরাণে জল এল।

—গ্যাছে নারায়ণগঞ্জে।

—গ্যাছে ক্যান!

—গ্যাছে মামলা করতে।

—তা পয়সা থাকলে মামলা করব না। আপনের মত গাছের নিচে খাড়াইয়া থাকব!

—সেই কথা!

ওরা এসে এবার নির্ভয়ে হোগলার ওপর বসল।

—নেন, তামুকটা টান ছ্যান। নিভা যাইব।

আমিনুল্লা বলল, আপনের ভাইসাব কড়া তামাক পছন্দ।

ফেলু দেখল বিবিটা কোথায় এখন! বলল, বড় পছন্দ। তারপর সে ডান হাত দিয়ে গামছায় আড়াল করা ঘা থেকে মাছি তাড়াল। ফেলুর শরীর থেকে কেমন একটা দুর্গন্ধ উঠছে। ফেলু বুঝি টের পেয়ে গেছে বিবি মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঁশ ঝাড়ের নিচ থেকে উঠে এসেছে। কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে সে তাজা মানুষদের দেখছে।

ফেলু উঠে যাবার সময় ওরা দেখল, সে তার ঘা-টা গামছার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারল দুর্গন্ধ উঠছে ঘা থেকে। তা'ছাড়া ওরা এই হাতটা কবে গেল জানে না। ওরা জানত, এই মানুষের হাত পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল। বাঁ-হাতের কব্জি কতকাল ফুলেফেঁপে ছিল। তারপর হাতটা একদা শুকিয়ে গেল। শুকনো লতার মতো হাতটা ওর শরীরে দুলত। হাতটার কোন ধর্মকর্ম ছিল না। কোন বোধ ছিল না। রক্ত চলাচল না হলে যা হয়। সেই হাত ওর ব্যাঙের লেজের মতো কবে খসে পড়েছে কেউ জানে না। সে সারাক্ষণ বাঁ দিকের হাতে একটা গামছা ফেলে রাখে। কাঁধের নিচে লাল দগদগে ঘা। ঘা দেখে ওদের শরীর কেমন গুলাতে থাকল। এত বড় একটা ঘা নিয়ে মানুষটা বেঁচে আছে কি করে। ওরা এসেছিল এই পথে আন্নুকে একবার দেখবে বলে। বিবি নাকি এ-তল্লাটে চান্দের লাখান মুখখান আর আকালুসাব আছে বিবির পিছনে এবং ফেলু এই বিবিকে নিয়ে রাত বিরাতে ঘাস বিচালি ধানের চাড়া, মটর দানা যা পায় জমি থেকে চুরি করে আনে।

ফেলু ভিতরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে গেছে। সে ফের আসছে। কলকিতে আগুন। সে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আসছে কলকিতে। আর একটা চোখ ওর সজাগ, সে গোপনে দেখছে দুই মিঞার চক্ষু কি কয়, কোন দিকে চক্ষু তাড়া করে। বিবি তার বড় লবেজান। ওরা এসেছে চুরি করে বিবিকে দেখে যাবে বলে। এরা সবাই আকালুর বান্দা। আকালুকে খুশি করতে পারলে এই ইবলিশদের আর কিছু লাগে না। তবু ডেকে তামুক সেবন, যেন আল্লা মেহেরবান বলে বসে যাওয়া মুখোমুখী, তারপর হাঁক দেওয়া—তোমরা মিঞা মনে কর আমি কিছু বুঝি না।

না কি সে মনে মনে আকালুকে ভয় পায়। ভয় পায় বলে ডেকে এনেছে—বইসা যান মিঞা, গরীবখানায় বইসা যান। আবার কখনও কখনও ফেলুর মনে হয় ওরা এসেছে গরু-ছাগলের ব্যাপারির মতো। আকালুই হয়তো পাঠিয়েছে। জমি বাড়ি সব তার বন্ধক। তালাকনামা লিখে দিলে যদি বন্ধক ছুটে যায়, সব মিলে যায়, তবে মন্দ হয় না। এবং দুই বিঘা ভুঁই মিলে গেলে সে কিছু একটা ফসল করে বাকি দিন গুজরান করে ফেলতে পারবে। ওরা ব্যাপারির মতো খোঁচা দিয়া ছাখতে চায় ফেলুর বিবির দামদর কত।

কিন্তু মিঞা দু'জন ফুতফাত তামুক খেয়ে বসে থাকল। কিছু আর বলছে না। ওরা আঁতাবেড়ার ফাঁকে আন্নু বিবির মুখ দেখে ফেলেছে। দেখেই কেমন গুম হয়ে গেছে। ঘরে যান শয়তানটা একটা পরী মন্ত্র পড়ে বেঁধে রেখেছে। ডানা কেটে দিয়েছে। উড়তে পারছে না। কষ্টে বিবির চোখ মরা গাঙের মতো।

বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়েই আন্নু অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু আঁতাবেড়ার ও-পাশ থেকে কচ্ছপের মতো গলা বের করেছিল। আর কিছু ওরা দেখতে পায় নি। আন্নু আর অধিক বের করতে পারে না। ওর গায়ে ফুটা-ফাটা হাজার রকমের তালিমারা শাড়ি।

একবার আকালু একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল। শাড়ি দেখে ফেলু তেলে-বেগুনে জলে উঠেছিল। এবং যা হয়, কেউ কিছু দিলেই আন্নুর পিঠ আর ঠিক থাকে না। ভয়ে আন্নু তেল সাবান, গন্ধ তেল এবং চিরুনি খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে। পরবের দিনে অথবা মানুষটা মেঘনাতে চাইন মাছ শিকারে গেলে পটের বিবি সেজে বসে থাকে আকালু কখন আসবে। অবশ্য আন্নু জানে ফেলু কোন নির্দিষ্ট তারিখে ফিরে আসে না। আগে অথবা পরে আসে।

ফেলু ফেরার আগেই সে ফের তার ফুটাফাটা শাড়ি অথবা গামছা পরে বাঁশ-ঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফেলু ফিরেই শুকনো মুখ দেখে বলবে, তুই এহানে বিবি?

—তোমার লাইগা মনডা বড় কান্দে।

আর সেই ফেলুর এখন কিছুই নেই। সে মেঘনা নদীতে আর ঢাইন মাছ শিকার করতে যেতে পারে না। সে টের পায় বিবি তার কাছে আসে না। কেবল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গন্ধে টেঁকা দায় এমন চোখমুখ তার। এখন বিবি কেবল আকালুর বিবি হতে চায়। আকালুর বিবি হওয়ার জন্য সে হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে পারত, আমারে তালাক ছ্যাও মিঞা, আমি যাই সাগরেরি জলে, তুমি আমারে ছাইড়া ছ্যাও। কিন্তু পারে না। প্রাণে বড় ভয়। মান্ধাতা আমলের কোরবানীর চাকুটার ভয়। সেই ভয়ে বাড়ির চারপাশটায় বিবি ঘুর ঘুর করে। বিবি তার হকের ধন। 'আন্নু তার দু'বিঘা জমি-জিরাতের মতো। ওর বাড়িঘরের মতো সে বিবিকে ভোগের নিমিত্ত পেয়েছে। তার ভোগ শেষ না হলে কোন শালা লেবে। যেমন তার দুটো মাটির সানকি, একটা পেতলের বদনা, বাঁশঝাড়, পাটকাঠির ঘর, উড়াট জমি, এক বিবি, সে তো দশটা পাঁচটা বিবি রাখে নি ঘরে, তবু তার এই সামান্যে সম্পত্তির জন্য কি লোভ আকালুর। তার হাত গিয়ে সে এখন এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সে মরলেই আকালু তাজিয়া নাচাবে উঠোনে। ফেলু এবার বলল, তা মিঞা আকালু মামলা করতে গ্যাল ক্যান!

কালু মিঞা বলল, ওডা তো তোমার জানার কথা।

—আমার জানার কথা! কি যে কন! ফেলু একেবারে বিনয়ের অবতার বনে গেল। সে যে এ-সব টের পায় না তা নয়। সব টের পায়। এই দুই হোমন্দির পুত আইছে আকালুর পক্ষে। আকালুর ছিনালি করতে আইছে।

আমিনুল্লা মোল্লা মোতাবেক বলল, গ্যাছে তোমার নামে এক নম্বর ঠুইকা দিতে।

ফেলু চোখ বড় বড় করে ফেলল। সে মামলামোকদ্দমাকে বড় ভয় পায়। ওর নামে মামলা রুজু করলেই দু'দিন পর পর ছোটো নারায়ণগঞ্জে। তার তাজা বিবিটা একা একা থাকবে। ফাঁক বুঝে তাজিয়া নাচাবে আকালু। সে ভীষণ শক্ত হয়ে গেল। সে মামলা করতে গেলে বিবিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবু সে

মামলার নামে ঘাবড়ে গেল। তার এখন প্রায় ভিক্ষা সম্বল। তার নামে এতবড় মানুষটা মামলা করতে গেল!

বস্তুত এই আমিনুল্লা আর কালু মিঞা এসেছিল যেনতেন প্রকারেণ ফেলুকে ঘাবড়ে দিতে। বুদ্ধিটা আকালুসাবেরই। সে-ই ফেলুকে যখন তখন ভয় দেখাতে বলেছে। টাকার জোরে আকালু বাজি ফাটাচ্ছে। আকালুর দল ভারি সে-পঙ্গু, তার অর্থবল নেই। সে গরীব। সে আকালুর কাছে কিছু না। তবু সে তার পিছনে কেন লাগে। একটা বিবি তার। —ছ্যাশে কত খুবসুরত বিবি আছে মিঞা। তোমার টাকার অভাব নাই। শহরে যাও, ধইরা আন। ফেলু বড় অসহায় বোধ করল। এই কামডা ভাল না মিঞা! ফেলু দু'হাত তুলে মোনাজাত করল আল্লার কাছে। আমি অমানুষ আল্লা। তুমি আমার কসুর ক্ষেমা দিয়। বিবিরে নিয়া রঙ্গ তামাশা করে না য্যান। গলার নালি হাঁত কইরা দিমু তবে ছিঁড়া।

আমিনুল্লা বলল, তা মিঞা কথা কওনা ক্যান?

—কি কমু কন!

—একটা ফয়সালা কইরা ফ্যাল। আকালু সাব নেতা মানুষ, তার লগে তুমি পার!

—কি ফয়সালা?

—তালাকনামা লিখা ফ্যাল। গোপনে কাজটা হইয়া যাউক।

ফেলুর মনে হল বজ্রাঘাত মাথায়। অথবা মনে হচ্ছে ওর মাথায় কারা হাতুড়ি পেটাচ্ছে। সে সেই দিনের মতো উঠে দাঁড়াল। ঘা-টা গামছায় ঢাকা তবু মাছি ভনভন করছে। খড়ি উঠে গেছে শরীরে। তার শরীর সেই আদ্যি-কালের একটা গাছের মতো। ডালপালা ভেঙে গেছে। তবু সে মহাসমা-রোহে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। মহাসমারোহে পৃথিবীর ঝড় জল রোদ সহ্য করতে করতে সহসা নিজের ভিতর দুটো হাত গজিয়ে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে আর পারছে না। ভয়ঙ্কর কঠিন উক্তি ওর মুখে এসে গেছিল। সে তা প্রকাশ করল না। করলেই ওরা পালাবে। সে ঘরের ভিতর টলতে টলতে ঢুকে গেল। তখন দুই মিঞা বুঝতে পারল ফেলু ক্ষেপে গেছে। ওর উঠোনে এখন বসে থাকলে এই দিনের বেলাতেই সে হাঁসুয়া নিয়ে গলা দু'খান করে দেবে। ফেলু যত সত্বর ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে তার চেয়ে দ্রুত ওরা মাঠে দৌড়ে নেমে গেল।

ফেলু ঘর থেকে বের হয়ে দেখল ওরা উঠোনে নেই। হাতে ওর সেই কোরবানের চাকুটা। উঠোনের এক কোণে ওর বাগি গরুটা ফেলুকে জাবর কাটতে কাটতে দেখছে। ফেলু উঁকি দিয়ে কি যেন মাঠে খুঁজছে। উঠোনের চারপাশে তাকাচ্ছে। ফেলু তাকাতেই দেখল জাফরি যেন সব বুঝে গেছে। সে তার বাগি গরুটাকে বলল, তুই মিঞা কোনদিকে গ্যাল জাফরি! গলার নালিতে কত খুন আছে একবার ছাখতাম।

বাড়ির শেষে ফেলু বড় কাফিলা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। গাছটা থেকে আঠা পড়ে পড়ে গোড়া আর চেনা যায় না। ডালপালা নেই। পাতা তুটো-একটা। দেখলে মনে হয়, গাছটা মরে গেছে। শুধু ফেলু জানে গাছ ভিতরে তেমনি তাজা, এখনও এক কোপে কত আঠা যে ওগলায়। গাছটা মাথায় খুব লম্বা নয়। খুশি মতো ফেলু ডালপালা কেটে বাড়ির চারপাশে বেড়া দেয়। কাণ্ড এখনও এত নরম যে সে একবার শাবল দিয়ে গাছটা এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সে এই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালেই বড় মাঠ দেখতে পায়। আর দেখতে পায় সেই ষণ্ড। সে দেখল আজ তুই মিঞা ভয়ে প্রায় মুখপোড়া ষণ্ডের মতোই লুঙ্গি তুলে ছুটছে। সে এবার চিৎকার করে উঠল, অঃ হালার পো হালারা, কুত্তার মত পালাও ক্যান। খাড়াও। ছাহি মরদখানা ক্যামন! বিবিরে নিয়া আমার তাজিয়া নাচাইতে পার কিনা ছাহি!

তখনই দেখল ফেলু কোথেকে সেই ধর্মের ষণ্ড মাথা নিচু করে উঠে আসছে। কালো রঙ। কি কালো, প্রায় ঈশান কোণের কালবোশেখিতে মেঘের রঙ এমন হয়। তুই শিঙ তরবারির মতো আকাশের দিকে উঠে গেছে। কি ধারালো, নিমেষে সে বসুন্ধরা এফোঁড়ওফোঁড় করে দেবে যেন।

ফেলু তার এক চোখে দেখছে ষণ্ডটাকে। ষণ্ড ও-পাশ থেকে আর এক চোখে দেখছে। ফেলু একটা গোলাপফুলের মতো কোরবানীর চাকুটা তু'আঙুলে ধরে রেখেছে। ষণ্ডটা এতক্ষণে ফেলুকে হয়তো তেড়ে এসে কাফিলা গাছটায় গেঁথে দিত—কিন্তু হাতে এক কোরবানীর চাকু। দেখলেই ষণ্ড টের পায়, বড় ধারালো ওটা, গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে নালি ফাঁক। যেন ফেলু ওটা একটা গোলাপফুল তুলে এনেছে বাগান থেকে। আও মিঞা, খাড়াইলা ক্যান। বাগিচা থাইকা তোমার লাইগা ফুল তুইলা আনছি। আও। আও। বলে এক হাতে ফেলু ষণ্ডটাকে উদ্দেশ করে উরু থাবড়াতে থাকল। আর চাকুটাকে নাচাতে থাকল হাতের ওপর।

ষণ্ড নিমেষে বেমালুম ভালমানুষ হয়ে গেল। শিঙ দিয়ে আর মাটি তুলল না। গোঁত্তা খেল না আর মাটিতে। সরল যুবার মতো হেঁটে পাখপাখালি দেখতে দেখতে নেমে যেতে থাকল। যেন এক পোষমানা জীব, ফেলুকে দেখেই মাঠে ঘাস খেতে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ফেলুর কেমন তুই মিঞাকে কাছে না পেয়ে জিদ চড়ে গেল। মিঞার বদলে এই ষণ্ড। সে মাঠে নেমে লড়াই করবে, সে হাঁকল, হাঁ হাঁ হাঁ। ষণ্ডটা এবার ঘুরে দাঁড়াল। মাঠের তুই পাশে তুইজনা। তুই জীব। আদিম এবং উৎকট চোখমুখ তুই জীবের। ফেলুর নেই ডানদিকের চোখ, ষণ্ডের নেই বাঁ দিকের চোখটা। জীবের চার পা। ফেলুর তু'পা, এক হাত। এখন ওরা এত কাছাকাছি যে উভয়ে উভয়ের অর্ধেকটা দেখছে। সবটা দেখতে পাচ্ছে না। ফেলু এখন যেন চিনতেই পারছে না, এটা জীব না অন্য কিছু। কি তার ধর্ম, কি তার স্বভাব। ষণ্ডটাও বুঝতে পারছে না সামনের জীবটা মানুষ, না পীর, না ইবলিশ। ষণ্ডের মনে হল, হালার এক আজব জীব। সে ভয়ে লেজ খাড়া করে বিলের দিকে ছুটতে থাকল। পথে আসছিল তারিণী সেন। তারিণী কবিরাজ। ঘোড়ায় চড়ে আসছে। এত বেশি জোড়ে ছুটছে ষণ্ড যে তারিণী সেনের ঘোড়া পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

ফেলু জোরে জোরে হাঁকল, হাজিসাব, আপনের ষণ্ড অমারে ডরাইছে।

তারিণী কবিরাজ যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বুড়ো ঠাকুরের এখন-তখন অবস্থা। সঙ্গে রেখেছে মকরধ্বজ। পকেটের ভিতর ঘোড়ার পিঠে কত রকমের সব লাল নীল রঙের বড়ি। ঘোড়ার পিঠে তারিণী কবিরাজ একবার উঠছে আবার নামছে। মাঠের উপরে এমন একজন মানী লোককে আসতে দেখে সে ভাবল একবার যাবে কবিরাজমশাইর কাছে। হাতের ঘা-টা তাকে দেখাবে। এই না ভেবে সেও ঘোড়ার পিছনে লেজ খাড়া করে ছুটতে থাকল।

সকাল থেকেই বাড়ির ভিতরে সবাই ব্যস্ত। সোনা অর্জুন গাছের নিচে এসেছিল পাগল জ্যাঠামশাইকে ডেকে নিয়ে যেতে। তিনি গাছটার নিচে বসে আছেন। কিছুতেই বাড়ির ভিতর যাচ্ছেন না। সোনা নিয়ে যেতে না পারলে বড়বৌ আসবে। তখনই সে দেখল সম্মান্দীর তারিণী কবিরাজ ঘোড়ায়

চড়ে আসছে। সে জ্যাঠামশাইকে ফেলে ছুটে গেছে বাড়িতে—তারিণী দাদা আইতাছে। বড়বৌ এবং শচীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে উঠোনে নেমে এল। নরেন দাস ছুটে এল। কবিরাজমশাই বড় ঘরে ঢুকে বলল, ঠাকুরদা, কেমন আছেন ?

বড়বৌ সব উত্তর দিচ্ছিল কবিরাজমশাইকে। কারণ বৃদ্ধ মানুষটির কথা বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল ভোরে তিনি সবাইকে কাছে ডাকলেন। বড়বৌ, শচি, শশীবালা, ধনবৌ সবাইকে। তাঁর বড় ইচ্ছা নৌকাবিলাস পালাগান শোনার। মহজমপুরের যোগেশ চক্রবর্তীকে খবর দিতে হবে। ঈশম যাবে ভাবছিল—তখনই হঠাৎ চোখ বুজে যেন কি বুঝতে পারলেন, বললেন, না দরকার নেই। কাল আমার একশ বছর পূর্ণ হবে। তোমরা আত্মীয়স্বজন সবাইরে খবর দ্যাও। তারপর থেকেই হৈচৈ বাড়িতে। তিনি বলেছেন, পরদিন ভোররাতে সবার মায়া কাটাবেন। আর সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকবেন না।

ফেলু দৌড়ে এসেছিল গোপাট পর্যন্ত। সে আগে এসে ধরতে পারল না। ঠাকুরবাড়ি সে কোনদিন উঠে যেতে সাহস পায় না। সে হারমাদ মানুষ। ওকে দেখলেই ভয় পায় সকলে। সে সেজন্য গোপাটের মাঁদার গছের নিচে বসে থাকল, কখন কবিরাজমশাই আবার ঘোড়ায় চড়ে গোপাটে নেমে আসবে।

তারিণী সেন বলল, ঠাকুরদা, আমি তারিণী। কি কষ্ট হইতাছে কন !

মহেন্দ্রনাথ হাত সামান্য ওপরে তুলে ইশারায় যেন বললেন, কোন কষ্ট না। এখন তাঁর সব কৃপা। তোমরা আর আমাকে তাড়না করবে না, এমন মুখচোখ তার।

শচি বলল, তারিণীকাকা, কি মনে হয় ?

—টিকব না। যা কইছে ঠিকই কইছে।

—কিছু খাইতে চায় না।

—সবাই কাছে বইসা থাক। অযুধ দিয়া আর কোন দরকার নাই।

মন মানে না। বড়বৌই বিকেলে ঈশমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারিণী কবিরাজের কাছে। তিনি প্রবীণ মানুষ। প্রবীণ বদ্যি। তিনি এই সংসারের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। এবং প্রায় আত্মীয় সম্পর্ক। সেই থেকে মানুষজন সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আত্মীয়স্বজন যা আছে সবার কাছে এবং তারিণী

কবিরাজকে খবরটা দিতে বলা হয়েছিল। খবর পেয়েই চার ক্রোশ পথ ঘোড়ায় চড়ে চলে এসেছেন। ঈশম আসে নি। সে আসবে দক্ষিণে যত আত্মীয়স্বজন আছে তাদের খবর দিয়ে। হারান পাল গেছে উত্তরে, নরেন দাস গেছে পুবে আর শশীমাস্টার গেছে মুড়াপাড়া। সে যাবার সময় গোলাকান্দাল, পেরাব, পোনাব এবং দূরে দূরে যেসব গ্রামে আত্মীস্বজন আছে সবাইকে খবর দিয়ে চলে যাচ্ছে—সে বলে যাচ্ছে, মুড়াপাড়া যাচ্ছি। ঠাকুরের দুই ছেলে আছে তাদের খবর দিতে। ঠাকুরকর্তা আগামীকাল দেহ রাখবেন।

আর দীনবন্ধু থাকল নানারকম কাজকর্মের তদারকিতে। কোথায় দাহ করা হবে ঠিক আছে। অর্জুন গাছটার নিচে রাখা হবে। তিনি গাছ লাগিয়ে তাঁর দাহ করার জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। কোন আমগাছ কাটা হবে, সেটাও ঠিক করে রাখতে হয়।

তারিণী কবিরাজ বলল, পাগল কর্তারে দ্যাখতাছি না।

—অর্জুন গাছের নিচে বসে আছে।

—ডাইকা আনেন। কাছে বইসা থাকুক।

বড়বৌ সোনাকে পঠিয়েছিল ডাকতে। কিন্তু তিনি আসছেন না। দীনবন্ধু একবার খবর নিয়ে গেল, কি রকম লাগছে। কেমন আছে ?

বড়বৌ বলল, বিকেলের টানে চলে যাবে মনে হয়।

—ধনবৌদিরে কন রান্নাবান্না শেষ করতে। পোলাপান যা আছে অগ খাওয়াইয়া দ্যান। আপনেরা অ দুইডা মুখে দ্যান।

বড়বৌ সে-সবের কোন উত্তর দিল না। বলল, দেখুন তো ঠাকুরপো, আপনার দাদাকে নিয়ে আসতে পারেন কিনা ?

—তাইন কোনখানে ?

—অর্জুন গাছটার নিচে বসে আছে। সোনাকে পাঠিয়েছিলাম। আসছে না।

—আপনি যান বৌদি। আপনি না গ্যালে আসবে না।

—যাই কি করে বলুন। তারিণী কাকা এসেছে, ওর জন্যে জলখাবার করতে হবে। ধন রান্না করছে। মা তো বিছানাতেই চুপচাপ বসে আছেন। কাল থেকে কিছু খাচ্ছেন না। কোন দিকে সামলাই বলুন।

সুতরাং দীনবন্ধু অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে ডাকল, এখানে বইসা থাকলে হইব ? বাড়ি যান।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ দেখল দীনবন্ধু তাকে নিতে এসেছে। সে পিছন ফিরে বসে থাকল।

শচি এল। সেও নিয়ে যেতে পারল না। শচি ফিরে এসে বলল, আপনি যান। দেখেন আনতে পারেন কিনা।

অগত্যা সব কাজ ফেলে বড়বৌ পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল। দেখল, তাঁর মানুষ এখন ঘাসের ওপর বসে আছে। দুটো-একটা পাতা গাছ থেকে ওর মাথার ওপর ঝরে পড়ছে। সে কাছে গেলেও মানুষটা চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। কাছে গিয়ে মাথার চুলে নরম আঙ্গুলে বিলি কাটাতে থাকল। প্রায় সন্তানের মতো যেন তার আদর। সে বলল, ওঠ। এ-সময় এখানে বসে থাকতে নেই। চারপাশে তিনি হাতড়াচ্ছেন। সবাই বলছে তিনি তোমাকে খুঁজেছেন। ওঠ ওঁর পায়ের কাছে বসে থাকবে। কোথাও আজ বের হবে না।

বড়বৌ একটু থেমে দূরের গোপাটে কাকে যেন আলগা হয়ে বসে থাকতে দেখল। কে বসে আছে এমনভাবে! ঝোপজঙ্গলের জন্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বড়বৌ উঁকি দিলে জঙ্গলের ওপাশে মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং ফের বলা। এই মানুষকে কিছু না কিছু একা একা বলে যেতেই হয়, সে তো আর কোন জবাব দেবে না। সে বলল, মেজ ঠাকুরপো, ধন ঠাকুরপোকে খবর দেবার জন্য শশীমাস্টারমশাই গেছেন। কবিরাজ কাকা এসেছেন। এসেই তিনি তোমার খোঁজ করেছেন। তোমার বোনের কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। পশি, ইছাপুরা লোক গেছে। তোমার মামাবাড়িতে খবর দিতে গেছে হারান পাল।

সে সব খুলে বলছে। কিভাবে কি সব কাজ হচ্ছে সংসারে, সব বলছে। এই মানুষ বাড়ির বড় ছেলে! তাঁর সব জানা উচিত। তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে সব করতেন। তাঁর হয়ে বুঝি বড়বৌ আর শচি সব করছে। সুতরাং ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, না কোথাও ভুল থেকে গেল, মানুষটাকে এমন জানানো। বলতে বলতে নিজের কাছেই ভুল ধরা পড়বে। অঃ, তাই তো, সোনার মামাবাড়িতে লোক পাঠানো হয় নি। তাউইমশাই খুব দুঃখ পাবেন। সে তাড়াতাড়ি সোনাকে ডেকে বলল, তোর ছোট কাকাকে ডাক তো।

শচি এলে বলল, সোনার মামাবাড়িতে কে গেছে?

—কেউ যায় নাই।

—কাউকে পাঠিয়ে দিন।

এ-সময় কি কি করণীয়, বড় ছেলে বলেই তাঁর সব জানা উচিত। অথবা এই যে সব করা হচ্ছে, আত্মীয়পরিজনদের খবর দেওয়া হচ্ছে—তিনি যেন সবই জানেন এবং তাঁর পরামর্শমতোই হচ্ছে এমন সম্মান দেখানো প্রয়োজন। বড়বৌ এ-জন্য সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে।

বড়বৌ বলল, কি দেখছ?

মণীন্দ্রনাথ গাছের ডালের দিকে চোখ তুলে দিলেন।

বড়বৌ বলল, সামনে শুধু মাঠ। ফসল নেই। জমি চাষ করা। বৃষ্টি পড়লেই পাটের বীজ বুনে দেওয়া হবে। এ-সময়ে তুমি কিছু দেখতে পাবে না।

মণীন্দ্রনাথ পা ছড়িয়ে বসলেন। যেন তিনি কোন বড় নদীর পাড়ে বসে আছেন। সকালবেলা। রোদের তাত তেমন প্রচণ্ড নয়। দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে। কি ঘন চুল এই বয়েসে! চুল তার একটাও পাকে নি। ছেলে-মানুষের মতো বড় বড় চুল। বাতাসে চুল উড়ছে। ঘাটে জল কম। ঘোলা জল। কলমিলতার সবুজ আভা মরে যাচ্ছে। রুক্ষ কঠিন মাঠ। ধূ ধূ বালি-রাশি আর কিছুক্ষণ পরই নদীর চরে উড়তে থাকবে।

বড়বৌ বলল, তিনি যাই করে থাকেন, তোমার ভালো ভেবে করেছেন।

মণীন্দ্রনাথ ছোট ছেলের মতো অভিমানের চোখ নিয়ে দেখলেন বড়বৌকে। কোন কথা বললেন না। কথা বলেনও না তিনি। বেশি পীড়াপীড়ি করলে তাঁর প্রিয় কোন কবিতা আবৃত্তি করেন। বড়বৌ এই অভিমানী মানুষটিকে দেখে ভাবল, তিনি হয়তো এখুনি কোন কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, এ-সময় সবাইকে কাছে থাকতে হয়। তুমি তাঁর বড় ছেলে। কত আশা ছিল তাঁর তোমাকে নিয়ে।

মানুষটা এবার মাথা গুঁজে দিল দু' হাঁটুর ভিতর। ওঁর কি কান্না পাচ্ছে! অথবা রাগে, অভিমানে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! বড়বৌ প্রায় এসেছে এখন জননীর মতো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।—লক্ষ্মী, এস। এমন করতে নেই। তুমি যদি পাশে না থাক, তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।

পাগল মানুষ সেই যে মাথা গুঁজে দিয়েছেন হাঁটুর ভিতর, কিছুতেই মাথা তুলছেন না। বড়বৌ হাত ধরে টানছে। ওর মাথার ঘোমটা সরে গেছে সামান্য, বাঁ হাতে ঘোমটা টেনে ঠিক রাখছে। বুকের আঁচল সরে যাচ্ছে। ঝোপের ও-পাশে একটা লোক লুকিয়ে বসে আছে। সব দেখছে বসে বসে। সকালের

রদ্দুর গাছের ডালে, পাতার ফাঁকে, মাটিতে এসে পড়েছে। মুখে বড়বৌর সকালের রদ্দুর বড় মায়াময়। মুখে কপালে তার ঘাম। কপালে সিঁদুর বাসি দাগের মতো। লালপেড়ে কাপড়, শ্যামলা রঙ তার আর এই শ্রী সকালবেলার মাঠে বড় মাধুর্য বয়ে আনছে। ফেলু কবিরাজের আশায় বসে থেকে ঝোঁপের ভিতর সব দেখছে। সুন্দর লাবণ্যময় পা, পাতার ওপর লালপেড়ে শাড়ি কি শরিফ্ মনে হচ্ছে। অথচ এত টানাটানিতেও মানুষটা উঠছে না। সামনের জমিতে সেই ষাঁড়টা এখন নিরবিলি ঘাস খাচ্ছে। কোথায় কি হচ্ছে কিছু দেখছে না।

বড়বৌ টেনে তুলতে না পেরে বলল, তুমি তো জানো, তোমাকে ভালো করার জন্য তিনি কি না করছেন!

পাগল মানুষটার হাই উঠছে। তার এ-সব শুনতে আর ভাল লাগছে না।

বড়বৌ এক এক করে এবার এ-সংসারের পুরোনো ইতিহাস বলে গেল। মনুষটার তবু যদি চৈতন্য হয়। এমন সময় এ-পাগলামি বড়বৌরও ভাল লাগছে না। কবে একবার মহেন্দ্রনাথ নদী পার হয়ে শ্মশানে চলে গিয়েছিলেন, মৃতদেহের জন্য সেই শ্মশানে একা একা রাত্রিবাস এবং মৃতদেহ চুরি, তারপর সেই কাপালিকের জন্য কত কিছু হোমের কাঠ বিল্বপত্র আর অমাবস্যা রাতের অন্ধকারে নিশীথে শিবাভোগ এবং নদীর পাড়ে শ্মশানভূমিতে এক ভয়ঙ্কর কঠিন যাগযজ্ঞে এই মানুষের আরোগ্য কামনা করেছিলেন, সে-সব মনে করিয়ে দিতে চাইলেন। যেমন তিনি জীবনে একবার মিথ্যা তার করে, সন্তানের ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি তিনি প্রৌঢ় বয়সে প্রায় তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে হারজিতের বাজিতে পড়ে গিয়ে—যা কিছু অকল্পনীয়, যা কিছু মানুষের দ্বারা সিদ্ধ, ভূত অথবা পিশাচ কোন কিছুই বাদ রাখেন নি। যেন তিনি দৈবের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য ক্রোশের পর ক্রোশ নিশীথে হেঁটে যেতেন, কোন ফকির অথবা আউলবাউলের উদ্দেশে। তাঁর বড় ছেলে পাগল। কেউ বান মারতে পারে, বন্ধন করে দিতে পারে—তিনি মন্ত্রসিদ্ধ মানুষের খোঁজে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও তেমন মানুষ খুঁজে পেলন না। শুধু মিথ্যার অহঙ্কার। যাগযজ্ঞ, তুকতাক সব মিথ্যার সঙ্গে লড়াই। যেদিন যথার্থই হেরে গেলেন, সেদিন থেকে আর ঘরের বার হলেন না। সবাই দেখল মানুষটা অন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছে মানুষটা হেরে গিয়ে সারারাত মাঠে শীতের ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদেতে মানুষটার দুটো চোখই চলে

গেল। এখন সেই মানুষ নিজেও চলে যাচ্ছেন। বড়বৌর মায়া হতে লাগল। কোন রকমে একবার নিয়ে যাওয়া, এই শেষ সময়ে শিয়রে অথবা পায়ের কাছে বসিয়ে রাখা। সে কেমন কান্না কান্না গলায় বলল, তোমার এতটুকু মায়াদয়া নেই। তিনি তোমাকে কিভাবে চারপাশে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছেন!

পাগল মানুষ দেখল তখন একটা ষাঁড়, বড় ধর্মের ষাঁড় ঘাসের জন্য ফোঁপাচ্ছে। কঠিন মাটি, জল নেই কতদিন। ঘাস পুড়ে গেছে। সূর্য মাথার ওপর থেকে যেন নামে না। কঠিন দাবদাহে ষাঁড়টা লাফাচ্ছিল। এমন কি সেটা এই পুকুরপাড়ে উঠে আসতে পারে। কেমন ভয়ে ভয়ে পাগল ঠাকুর এবার উঠে দাঁড়ালেন।

মনের ভিতর ভয় জাগলেই তিনি দেখতে পান এক কাটামুণ্ডু হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। দুই কান তার লম্বা। সাপের চোখের মতো চোখ। নীল এবং অন্ধকার। তিনি দেখতে পান কখনও মুণ্ডুটা অতিকায় বাদুড় হয়ে তাঁর চোখের ওপর ঝুলছে। তিনি তখন কাটা মুণ্ডুর ভয়ে পিছনে ছুটতে থাকেন। নিশিদিন সেই কাটামুণ্ডু কে যেন সুতো দিয়ে অদৃশ্য এক স্থান থেকে তার চোখ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়ে বলছে, এই ছাখো, এই হচ্ছে তোমার ধর্ম। তার সবটা থাকে না। কিছুটা থাকে। যা দেখলেই সত্যিকারের মানুষ ভয় পায়। নিশীথে সে এক অতিকায় বাদুড় হয়ে যেতে পারে। যক্ষ রক্ষ সব তার দোসর। তুমি তার ভয়ে কীটের সামিল। খুশি মত তখন তোমাকে বলি অথবা জবাই দেওয়া চলে। তখনই ভয়ে মণীন্দ্রনাথের নিরিবিলি এক আশ্রয়ের কথা মনে হয়। বড়বৌ সেখানে শাদা পাথরে লাল বর্ণের ফলমূল আহার নিমিত্ত রেখে দিয়েছে। পানীয়ের নিমিত্ত রেখেছে ঠাণ্ডা জল। সে তখন একা একা সেই জানালায় যাবে বলে হাঁটতে থাকে।

বড়বৌ দেখল মানুষটা এবার ঘরের দিকে ফিরছে।

সোনা বিকেলের দিকেই দেখল এই বাড়ি মানুষজনে গিজগিজ করছে। ঘোড়ায় চড়ে এল তারিণী সেন, তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফের নেমেও গেলেন। ব্রাহ্মন্দী থেকে রায়মশাইরা খবর পেয়ে বের হয়ে পড়েছেন। গোপালদি থেকে এসেছে অর্জুন সাহা, তার বৌ মা সবাই। লতব্দি থেকে এসেছেন অম্বিকা রায়। এসেছেন হাজিসাহেব, তাঁর দুই ছেলে। আবেদালি, হাসিমের বাপ মনজুর, সবাই এসেছে। ওরা বৈঠকখানা ঘরে বসে রয়েছে। মনজুর আমগাছ কেটে কাঠ করার দায়িত্ব নিয়েছে। যেখানে যা কিছু খবর এখন, সে শুধু এক খবর, বুড়োকর্তার মহাপ্রয়াণ হচ্ছে। শতবর্ষ পার করে মানুষটা আর একদিনও সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বাঁচবেন না।

সারাদিন ধরেই এ-ভাবে মানুষজন আসছে যাচ্ছে। ছোটকাকা শিয়রে বসে গীতা পাঠ করছেন। রায়মশাই পিঁড়িতে বসে মহাভারত থেকে বিরাট পর্ব পড়ে শোনাচ্ছে। ঠাকুমা পায়ের কাছে সারাদিন বসে আছে। জ্যাঠামশাইকে ধরে এনে পাশে বসিয়ে দিয়েছে জেঠিমা। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডেকেছে, বাবা, বাবা।

তখন যেন এই মানুষ কত দূরে চলে যেতে যেতে কার ডাক শুনে চোখ মেলে একটু তাকাচ্ছেন, তারপরই চোখ বুজে আবার কোন দূরাগত মায়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। জেঠিমা বলেছেন, বাবা, বাবা, ও আপনার বড় ছেলে। বলে জেঠিমা শীর্ণ হাতখানা তুলে, পাগল মানুষের মাথায় ধরে রাখছে। বাবা বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন আপনার পাগল ছেলেকে। তাঁকে বলুন, তুই আর কোথাও যাবি না। ওকে আপনি বলে যান সে কি করবে।

সোনা দেখেছিল তখন ঠাকুর্দার চোখে জল। দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। জেঠিমা খুব ধীরে ধীরে সেই জল মুছিয়ে দেবার সময় ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সবারই চোখ ছলছল করছে। ছোটকাকা বোধ হয় দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণের জন্য গীতা পাঠ বন্ধ রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বুঝি এ-সময় ঠাকুরদার পাশে জ্যাঠামশাইর এই চেহারা সহ্য করা যায় না। বুক ভেঙে কান্না উঠে আসে।

জেঠিমা বললেন, আপনি, ওকে কিন্তু চোখে চোখে রাখবেন সব সময়।

সোনার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বুকের ভিতর ওরও একটা কষ্ট হচ্ছে। যা সে ঠিক এখন ছুঁতে পারছে না। ঠাকুর্দা মরে গিয়ে স্বর্গ থেকে সবসময় চোখে চোখে রাখবেন। জেঠিমা কাঁদছেন। সোনার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আর ভয় কি। এখন থেকে সবসময় একজন পাহারাদার পাওয়া গেল। তিনি সব লক্ষ্য রাখবেন। তবে আর কান্নার কি আছে! তবু কেন জানি কান্না পায়। সোনারও কান্না পাচ্ছিল! এতক্ষণ যে বুকের ভিতর অস্বস্তি, এই কান্নার জন্য। ঠাকুর্দা মরে যাবে। এটা ভাবতেই এখন ওর কান্না পাচ্ছে। অর্জুন গাছের নিচে ঠাকুর্দাকে পোড়ানো হবে, বাবা জ্যাঠামশাই মন্দির বানিয়ে দেবেন। সোনা বিকেলে মন্দিরের চাতালে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে বসে থাকবে। বর্ষাকাল এলে চাতালের পাশে জল উঠে আসবে। জলের নিচে রূপালি রঙের পুঁটিমাছ। সে এবং জ্যাঠামশাই ছিপ ফেলে পুঁটিমাছ ধরবে।

সে নিজে এ-ভাবে জ্যাঠামশাইকে কোন না কোন কাজের ভিতর নিযুক্ত করে রাখবে। কোথাও যেতে দেবে না। কোন কাজের ভিতর, এই যেমন মাছধরা, ফলের দিনে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফল-পাকুড় পেড়ে আনা, ফসলের দিনে ঈশমদাদার পাশে বসে জমি পাহারা দেওয়া, বিদ্যালয়ে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং কোন গাছের নিচে বসিয়ে রেখে ক্লাশ সেরে আসা, ফেরার পথে কোঁচড়ে জাম-জামরুল, অথবা চিনাবাদাম, চৈত্রমাসে দু' পকেটে খিরাই, দু'জনে পথে পথে খেতে খেতে আসা—এমন একটা ছবি ওর চোখের ওপর ভেসে উঠল। ঠাকুরদার কানের কাছে এ-সব বলে দেবার ইচ্ছা তার। ঠাকুরদা, কেন কাঁদেন আপনি। আমি তো আছি। সারাজীবন জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গে আমি থাকব। তাঁকে ফেলে কোথাও যাব না।

কিন্তু এত মানুষজন ঘরের ভিতর, ওরা আসছে যাচ্ছে, দেখে উঠোনে নেমে যাচ্ছে, ঠাকুরদার সততা সম্পর্কে ওরা কথাবার্তা বলছে, এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে রাম রাজত্ব করেন, সীতা বনবাসে যায়···প্রায় যেন, এ-সংসারে তেমন চিত্র, এক পাগল মানুষ নিশিদিন হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, এক সীতার মতো সাধ্বী নারী জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে অথবা সংসারের কাজকর্মে ডুবে থাকে সে।

সোনা, ঠাকুরদার কানের কাছে গিয়ে বলতে পারল না, আমি সোনা কথা বলছি, আপনার ছোট নাতি। জ্যাঠামশয়কে আমি দেইখা রাখুম। আপনে কাঁদছেন কেন? কিন্তু এত লোকজনের ভিতর সে যে কি করে বলবে! তবু

সে কোনরকমে, শিয়রের দিকে ভিড়ের ভিতর মাথা ঠেলে ঠিক ডানদিকে এসে গেল। একটা মোটা কম্বলে শরীর ঢাকা ঠাকুরদার। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। সব শরীরটা তার কাঁপছে। সোনা কোনরকমে মাথার কাছে মুখ নিতেই, কারা যেন তাকে জোর করে সরিয়ে নিল। ওর চোখে জল। সবাই হয়তো ভেবেছে, সোনা এখন ঠাকুর্দার গলা জড়িয়ে কাঁদবে। সে বলতে পারল না, আমি কাঁদছি না, আমি গলা জড়িয়ে কাঁদব না। সোনাকে এখন তবু কারা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে বোঝ-প্রবোধ দিচ্ছে, ঠাকুরদা বুড়ো হয়েছে, মরে যাচ্ছে, কাঁদছ কেন? কি ভাগ্যবান মানুষ তিনি। তাঁর কত সুনাম। তোমরা কাঁদলে ঠাকুরদার আত্মা শান্তি পাবে না।

সে এসে দাঁড়াল জামরুল গাছটার নিচে। তারিণী কবিরাজ গোপাটে ঘোড়ার ওপর বসেই একটা মানুষের কি যেন দেখছে। সেই মানুষ ফেলু শেখ। সে একজন প্রবীণ মানুষকে তার কুষ্ঠের মতো ঘা দেখাচ্ছে। এবং লোকজন চারপাশে। সোনার মনটা ক্রমশ ভারি হয়ে আসছিল। তারিণী সেন ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছে। যারা দূরের মানুষ তারা উঠে আসছে। তারা কত রকমের সব মহৎ গল্প ঠাকুরদা সম্পর্কে বলছে। সব প্রাচীন গাঁথার মতো মনে হয়। একজন মানুষ মরে গেলে বুঝি তার অতীত সবার চোখে ঘুরেফিরে আসে। সোনার এখন এ-সব শুনতে ভাল লাগছে। সে সব মানুষদের ভিতর ঘুরেফিরে —তার ঠাকুরদার অতীত ইতিহাস, সত্যবাদিতা, পৌরুষ এবং দানশীলতা সম্পর্কে সব শুনছে। কিন্তু একজন শুধু বলেছে, তিনি একবার মিথ্যা তার করেছিলেন, তার বড়ছেলেকে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। অথচ তার করলেন, তিনি অসুস্থ, বাঁচা দায়। তিনি সেই মিথ্যা তার করে ছেলেকে আনিয়েছিলেন, এবং বড় ছেলে তাঁর ফিরে এলেই বিবাহ। বড় ছেলে তাঁর বৈঠকখানায় সারাটা দিন মাথা নিচু করে বসে রয়েছিল। পিতার সম্ভ্রমের কথা ভেবে কেমন নিরন্তর দুঃখী মানুষের মতো মুখ। সে মানুষটা, সবাইকে রামায়ণ গানের মতো তার বর্ণনা দিচ্ছিল। যেন পিতার সত্যরক্ষার্থে পুত্রের বনে গমন। জীবনের সব কিছু ভালবাসা বনবাসে রেখে আসা।

সোনার কেন জানি মনে হল, মানুষ কখনও সারাজীবন সত্য কথা বলতে পারে না। ঠাকুরদা যখন পারেন নি, তখন আর কেউ পারবে না! বড় জ্যাঠামশাই কেন যে পাগল হয়ে গেলেন! এমন একটা মিথ্যা তার না করলে তার বড় জেঠিমা এ-সংসারে আসত কি করে! বড় জেঠিমার, সকাল থেকে

রাত পর্যন্ত কেবল সেবা-সুশ্রূষা সকলের, নিজের বলতে তাঁর কিছু নেই—আর কি সুন্দর তাঁর কথা! সোনা জেঠিমার মতো অনায়াসে এখন কথা বলতে পারে। তার কখন খিদে লাগে তিনি টের পান। সে কখন অসুস্থ বোধ করে জেঠিমা চোখ দেখে ধরে ফেলেন। এবং সোনা যে বড় হয়ে গেছে তাও তিনি আজকাল ধরতে পেরে কেমন মাঝে মাঝে বলে দেন, আর কি, তোমাদের এখন পাখা হয়েছে, উড়ে যাবে। আমাদের কথা তোমরা কেউ ভাববে না।

সে শুধু তখন বলতে পারে—না জেঠিমা, আমি কখনও এমন হব না। ভাল হব আমি। আমি এই পরিবারের জন্য সব করব। ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে বলে কি হয়েছে। আমরা তো আছি। আমি মেজদা বড়দা। সংসারের সব দুঃখ আমরা মুছে দেব। কত কিছু তার এখন বলতে ইচ্ছা হয়। সুন্দর, যা কিছু মহৎ এই পৃথিবীতে আছে সব কিছু তার হতে ইচ্ছা হয়। সে জামরুল গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে। মৃত্যু সম্পর্কে নানারকম ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তার। ওর মনে হয় ঠাকুরদা মরে কোথাও যাবেন না। সবাই অনর্থক কাঁদছে। সংসারের এমন ভালবাসা ফেলে কেউ কখনও দূরে গিয়ে থাকতে পারে না। তিনি এ বাড়িতেই থাকবেন। তবে অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। মরে গিয়ে মানুষ কোথাও বেশিদূর যেতে পারে না। ঠাকুরদাও বেশিদূর যেতে পারবেন না। সংসারে তার বড় জেঠিমার মতো বৌ আছে, পাগল জ্যাঠামশাইর মতো ছেলে আছে, ঈশমদাদার মতো মানুষ আছে, মার মতো ধনবৌ আছে, তবে তিনি যাবেন কোথায়। তিনি থাকবেন, এ-সংসারেই থাকবেন। সকলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। বিপদে আপদে তিনি সকলকে দেখবেন।

আবার এও কেন জানি মনে হয় সোনার, ঠাকুরদা মরে গেলে আকাশের নিচে বড় বটগাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র হয়ে জ্বলবেন। তিনি বড় ধার্মিক মানুষ, পুত্রের স্নেহ আচরণের জন্য জীবনপণ করে বাজি ধরা ঈশ্বরের সঙ্গে—এ-সব তাঁকে দেবতা বানিয়ে দেবে। তিনি এত পুণ্যবান মানুষ যে, সে দেখল এখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। লণ্ঠন জেলে মানুষজন আসছে। সে মাথা তুলে আকাশ দেখে বুঝল, চাঁদের চারপাশে গোল মণ্ডল। সেখানে দেবতারা সব চুপচাপ বসে একজন গুণী জ্ঞানী মানুষের অপেক্ষায় আছেন। তিনি এলে তাঁর নিবাস ঠিক করা হবে। একজন পুণ্যবান মানুষ মাটি ছেড়ে চলে আসছে—সে কোথায় থাকবে, তার বাড়ি, বাগান, ঠাকুরপূজার ঘর এ-সবের আয়োজন

করছেন তাঁরা। তার ঠাকুরদা যথার্থই পুণ্যবান মানুষ। তিনি আকাশে নক্ষত্র হয়ে যাবেন। এবং তাঁর পাগল ছেলে কোথায় নিরুদ্দেশে যায় ঠিক তিনি সেখান থেকে টের পাবেন এবং তাকে চোখে চোখে রাখবেন। ঠাকুরদার আর জন্ম হবে না। তিনি আকাশ থেকে দেখতে পাবেন সোনা কি করছে, জ্যাঠামশাই হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে যাচ্ছেন, ঈশমদাদা তরমুজ খেতে পাহারা দিতে দিতে ঘুমোচ্ছে কিনা—যেন সংসারের সব ফাঁকি এবার তিনি ধরে ফেলবেন। এবং রাতে ছোটকাকাকে স্বপ্নে বলে দেবেন, আগামী বছর দুর্দিন কি সুদিন। সোনাকে বলে দেবেন, জ্যাঠামশাই কোথায় কোন গাছের নিচে বসে আছে। দুঃখ বলতে যেটুকু সংসারে আছে ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যাবে।

সোনা যখন এসব ভাবছিল তখন কেউ বলে গেল—তুমি সোনা যাও, ঠাকুরদার মুখে গঙ্গাজল দ্যাও—তখন ফেলু ট্যাবার পুকুরপাড়ের দিকে ছুটছে। সে জোনাকি ধরার জন্য ছুটছে। একটা জোনাকি ওকে সেই মাঠ থেকে উড়ে উড়ে এতদূর নিয়ে এসেছে।

—কবিরাজমশয়, আমার ঘাডা সারাইয়া দ্যান। আপনের গোলাম হইয়া থাকমু। সে এমন বলেছিল কবিরাজমশাইকে।

—তুই কেডারে!

—আমি ফেলু। আপনেগ ফ্যালা। হাডুডু খ্যালছি কত। আপনের মনে নাই আমার নামডা!

—অঃ, তুই ফ্যালা। তা তর কি হইছে?

—ঘাও হইছে।

—কাছে আয় দ্যাখি।

—এই যে কবিরাজ মশয়। দ্যাখেন।

ফেলুর মাথার ওপর মাছি উড়ছিল। কাছে যেতেই কি দুর্গন্ধ। —আরে ফ্যালু, তুই ত মইরা যাইবি।

—এডা কি কন কবিরাজমশয়। আমি মইরা গ্যালে আন্নুডার কি হইব।

—তর যে বড় কঠিন অসুখ শরীরে।

—ঘাওডা আর সারব না!

তারিণী কবিরাজ ঘা-টার চারপাশে টিপে টিপে দেখল।

—জ্বলে?

—হ জ্বলে। দাবদাহের মত জ্বলে।

—জোনাকি জ্বললে নিভলে যেমন জ্বলে না!

—হ কবিরাজমশয়, ঠিক ধরছেন। জ্বালাডা ধপ কইরা নিভা যায় আবার দপ কইরা জইলা ওঠে।

—বড় কঠিন অসুখ রে ফ্যালা। তুই এক কাম করতে পারস!

—কি কাম কন দেখি। যা কন মাথা পাইতা দিমু।

—শতমূলের গাছ চিনস?

—চিনতে কতক্ষণ। বলে সে গামছা দিয়ে ওর ঘাটা ফের ঢেকে দিল। তারিণী সেন ঘোড়ার উপর বসে রয়েছে। সে নামছে না। ফেলুকে খুব কাছে আসতে বারণ করছে। সে চোখ বুজে কি যেন ভাবছে। তারপরই যেন বলে দিল, ঠিক কবিরাজীতে তর ব্যারামের ওষুধ নাই। এডা আমি শিখছিলাম এক হেকিমদার মানুষের কাছে। সে কইছে, কুষ্ঠরোগে এডা লাগে।

—আমার কি কুষ্ঠ হইছে কবিরাজমশয়?

—ঠিক কুষ্ঠ না। তবে তর এই ঘাও আর ছাড়নের কথা না। সূর্যমুখি ঘাও। রোদ উঠলেই জ্বালাটা বাড়ে রোদ পইড়া আইলে কমে জ্বালা।

—হ, বাড়ে কমে।

—সারে না। কবিরাজি মতে এর অষুধ নাই।

—আমি যে কি করিগ কবিরাজমশয়।

—এটা কইরা দ্যাখতে পারস। আর তুই উবুৎ ল্যাঙরার গাছ চিনস!

—না গ কবিরাজমশয়, চিনি না!

—চিন কি তবে। সারা জন্ম শুধু ভাত গিল্যে চলে।

—তা চলে কবিরাজমশয়। হায়, কি যে আমার হইল!

—আইজ ত পূর্ণিমা। বৈশাখি পূর্ণিমা।

—হ, কবিরাজমশয়!

—দিনটা ভাল আছে। শুক্লা তিথিতে এই জোৎস্নায় একশটা জোনাকি ধইরা ফ্যাল। পক্ষকাল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। তারপর যখন দ্যাখবি জলটা ঘোলা ঘোলা হইয়া গ্যাছে তখন শতমূলি গাছের মূল গোলমরিচ গণ্ডা দুই জোনাকির জলে বেটে লাগাবি। কবিরাজীশাস্ত্রে এ-সব লেখা নাই। পেঁয়াজ রুসুনে তগ শরীরটা ত আর শরীর থাকে না। দুরমুস বইনা যায়। কবিরাজি অষুধ কামে লাগব না। দিয়া গ্যালাম, একবার লাগাইয়া দ্যাখতে

পারস। লাগানোর আগে জোনাকির জল দিয়া ঘা ধুইয়া নিবি।

কবিরাজমশয় ওবুৎ ল্যাঙড়া গাছের নিমিত্ত কি কইলেন যেন।

—পক্ষকাল কষ্ট পাইবি। তার আগে গাছটা সিদ্ধ কইরা কিছু বাসকের ছাল, অর্জুনের ছাল, জায় ফল, লবঙ্গ ফেইলা দিয়া একটা পাচন খাইতে পারস। শরীরের রক্ত তর খারাপ। কালোমেঘের পাতা সিদ্ধ কইরা খাইতে পারস। রক্তটা ঠিক হইলে ঘাও শুকাইতে সময় লাগব না। বলেই তারিণী সেন মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালো। ফেলু দেখল চারপাশে তার জোৎস্না। একটা জোনাকি, একটা একটা করে একশটা। একশটা জোনাকি। ওর চোখের ওপর এখন জীবনের সবচেয়ে দামী এবং নামী বস্তু জোনাকি। তখনই সে দেখল মরীচিকার মতো একটা জোনাকি বেশ পুচ্ছ তুলে উড়ে যাচ্ছে।

সে জোনাকিটাকে ডান হাতে খপ করে ধরতে গেল।

হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে দুলে জোনাকিটা যাচ্ছে। ফেলু ছুটছে তার পিছনে। মাঠের ভিতর ওর মনে হল আর একটা জোনাকি। এত কাছের জোনাকি হাতের বাইরে চলে যাবে, সে স্থির থাকতে পারছে না। যত সোজা মনে করেছিল জোনাকি ধরা, যত সহজে সে ভেবেছিল খপ করে ধরে কোঁচড়ে ফসলের মতো তুলে নেবে তত সে দেখল মরীচিকার মতো হাতের ফাঁকে জোনাকি উধাও। সে বলল, হালার কাওয়া।

সে সুতরাং জিদের বশে, অথবা এক দুই মিলে এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডা মিলে এক কুড়ি, পাঁচ কুড়িতে শ। একশ জোনাকি। সে গণ্ডার হিসাব জানে। কুড়ির হিসাব জানে। শয়ের হিসাব তার জানা নেই। সে যে এত বড় হাডু-ডুডু খেলোয়াড় ছিল, নাম তার ফেলু ছিল, ভয়ে তাকে কেউ কাঁইচি চালাত না, তার নামে কিংবদন্তি ছিল কত, ফেলু খেলার দিন সারারাত তেল মাখে গায়ে, রস্থন গোটার তেল। তেলটা তার ভিতর বসে যায়। সে পিছল করে রাখে শরীর। ঠিক পাঁকাল মাছের মতো সে বের হয়ে যায়। যত বড় প্যাঁচ দাও, যত বড় কাঁইচি চালাও, কি জুতসই সে যে ফুস ফাঁস বের হয়ে আসে কেউ টের পায় না। কেউ বলে মানুষটা এক ফকিরের কাছে তাবিজ নিয়েছে, মাদুলি গলায় বড় ঝোলে তার, পারো তো সেটা কেড়ে নাও। দেখবে কেমন ভূতের ভয়ে মামদোবাজি খেলা খেলে ফ্যালা।

এখন সেই ফ্যালা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। গলায় তার সেই কালো তার জড়ানো। রূপোর চাকতি। সে একটা জেনাকির সঙ্গে পারছে না।

তার সব কেড়ে নিল এক মানুষ। পাগল মানুষ। মনে হল তার তখন ঠাকুরবাড়ি লণ্ঠন হাতে কারা উঠে যায়। বুড়ো ঠাকুর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। কত লোক যাচ্ছে দেখতে তাকে, আর ফেলু এখন কানা গোড়া বলে কেউ একবার তাকাচ্ছে না। তার যা ইজ্জত, ধর্ম সব কেড়ে নিয়েছে মানুষটা। সে উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। জোনাকিটা শাদা জ্যোৎস্নায় ভারি খেলা খেলছে বটে। কাছে এসে যাচ্ছে, খপ করে ধরতে যাচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে, সে ভেবেছে ছেড়ে দেবে, অন্য ঝোপে খুঁজবে জোনাকি। যেখানে জল ঘোলা, অথবা পচা ডোবা সে সেখানে চলে যাবে, তখনই আবার জোনাকিটা চোখের সামনে নেমে আসছে। যেন ধরা দিতে আসছে। সে বলল, আহারে, আমার সুন্দর জোনাকি। আয় তরে ধইরা লই। পরান আমার তর লাইগা কত না কান্দে।

সে খপ্ করে ধরতে গেল। আর উড়ে গেল ফের জোনাকি। হাওয়ায় দুলতে দুলতে কঠিন রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল সে।

ফেলুর মনে হল শরীরে তার পাখা গজিয়েছে। জোনাকির মতো দুই পাখা মেলে সেও যেন উড়ছে। কঠিন রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে সে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যত দুলে দুলে যাচ্ছে, সেও তত দুলে দুলে যাচ্ছে। সে কি এক হাজার আরব্য রজনী গল্পের নায়ক হয়ে যাচ্ছে! তার যে কি ইচ্ছা হচ্ছে এখন, আহা, সে কোথায় যাচ্ছে, তার যে কি ইচ্ছা, আল্লার কুদরতে সে আবার সব ফিরে পাবে, এমন কি এটা যখন ফকির প্রদত্ত ওষুধ, দানরি ফানরিতে কি না হয়, মনে হয় তার জোনাকিটা তাকে উড়ে উড়ে আল্লার দরবারে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা এই জোনাকি বুঝি তাকে একশটা জোনাকির খবর দেবে। খবর দিলেই সে খপ করে ধরে ফেলবে, জলে ভিজিয়ে একবার শতমূলি বেটে লাগাতে পারলেই নিরাময় হবে শরীর। এমন কি তার সেখানে একটা ব্যাঙের লেজ গজানোর মতো সুন্দর হাত গজাতে পারে। সে তার ডান হাতটা নেড়ে বাঁ হাতটা আবার গজালে কি কি করবে, প্রথমেই তার কি করণীয় এমন ভাবতে ভাবতে সে যে কোথায় চলে যাচ্ছে!

ফেলু ট্যাবার পুকুর পাড়ে এসে দেখল জোনাকিটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়েছে। সে ভাবল, বা রে, বেশ মজা, তুমি কুহেলিকা, পদ্ম ফোটালে না চক্ষে, তুমি আমারে লক্ষ্মী কোনখানে নিয়া আইলা! বলেই সে ঝোপটার অন্তরালে

উঁকি মারল, ঠিক মাইজলা বিবির সনে যেন এখন পিরিত তার। সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর, যেমন সে একবার বটগাছের নিচে উঁকি দিয়েছিল, কখন মাইজলা বিবি তারে দেখা দেবার তরে পানিতে নেমে আসে।

এখানেও ঠিক সেই উঁকি দিয়ে থাকা। জোনাকিটা ঝোপের এ-পাশে উড়ে এলেই খপ্ করে ধরে ফেলবে। আর কি আশ্চর্য, সে দেখল জোনাকিটা তার দলে ভিড়ে গেছে। এখানে সে যে উড়ে এল, সে তার দলে ভিড়ে যাবার জন্য। মরি হায় হায়। কলিজা কামড়ায়, সে নাগাল পাচ্ছে না জোনাকি-ডারে। একডা দুইডা জোনাকি না, হাজার গণ্ডা জোনাকি। কেবল ঝোপের ভিতর বসে থাকছে ডালে। নাড়া খেলেই উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

সে বুঝল নড়লে উপায় নেই। চুপচাপ চিৎ হয়ে পড়ে থাকা। যেই না উড়তে উড়তে কাছে চলে আসবে খপ্ করে ধরে ফেলা। ফেলু সেই আশায় ঝোপের ভিতর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। শিকারী মানুষের মতো সে জোনাকি ধরার কায়দা শিখে ফেলেছে। সে চুপচাপ শুয়ে থেকে বেশ ফল পেল। গণ্ডা দুই জোনাকি এখন তার করতলে। কোঁচড়ে রেখে সে অবাক, মরা মানুষের মতো পড়ে আছে, টুপটাপ কি যেন পড়ছে ডাল বেয়ে। সে সে-সব লক্ষ্য রাখছে না। ওরা বেশ উড়ে উড়ে আসছে। কোনটা ধরতে পারছে, কোনটা ধরতে পারছে না। ওর বুক জ্বালা করছে। গামছা দিয়ে ঘা ঢেকে রেখেছে। মনে হল ফোঁটাগুলো শরীরে পড়ে নিচে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত নয়। কারণ আকাশ পরিষ্কার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাতের মতো কিছু পড়ছে। এক ফোঁটা দু' ফোঁটা পড়ছে। সে আঙ্গুল দিয়ে দেখল আঠা আঠা। তখনই আবার ওর বুকের কাছে দুটো জোনাকি খেলা দেখাচ্ছে। সে হাতটা তুলে একটা ধরে ফেলল। অন্য জোনাকিটা দূরে সরে গেল। দলে ভিড়ে গেল। ওরা সবাই কেন উড়ে আসছে না। চারপাশে গুঞ্জন করছে না। ফোঁটা পড়ছে। বুকে পিঠে ফোঁটা আঠার মতো। সে সে-সব ভ্রূক্ষেপ করছে না। পড়ুক। উঠে গেলেই এমন রাত আর মিলবে না। কাল, পক্ষ বিচার ঠিক না থাকলে অযুধে কাজ দেয় না। সে বলল, আন্নুরে, আবার আমি ফেলু শেখ। তরে নিয়া উজানে যামু। আমার শরীরে গন্ধ থাকব না। তরে নিয়া যামু শহরে। আকালু তরে আর কি আতর আইনা দ্যায়, আমি দিমু তরে পারস্য দেশের আতর। আমার শরীর সবল হইলে কি দিতে না পারি তরে। খপ্ করে সে ফের আর একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আকালু ঘরে যায় নাই তো! বিবি, তুই আমারে দুইটা মাস সময় দে। তরে আমি জোনাকির মত উড়াইয়া নিমু বাতাসে। খপ্।

সে খপ্ করে আরও একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আর কি আশ্চর্য! খপ্। সে দেখল বুকের ভিতর আঠায় একটা জোনাকি আটকে গেছে। খপ্। সে তুলে কোঁচড়ে রেখে দিল। আঙুলে সে আঠার মতো বস্তুটি ঠোঁটে ছোঁয়াল।—আরে হালার কাওয়া, এয় রে কয় মধু। বর্ষণ হইতাছে। ওপরে কোন বড় বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ তুমি কার?

—রাজার।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে মধু বর্ষণ কর। ডালে তোমার মধুর চাক যখন আছে, বর্ষণ কর। চান্দের রাইতে মধুতে আমার শরীর ভাইসা যাউক আমি শুইয়া থাকি। জোনাকিরা উইড়া আসুক। মরা কাঠ ভাইবা বসলেই, খপ্। সে খপ্ করে আরও একটা জোনাকি পায়ের পাতা থেকে তুলে আনল। ওর গোটা শরীরে আঠাময় হয়ে গেছে। এখন সে ওদের না ধরলেও পারে। গোটা শরীর জোনাকি, বিন্দু বিন্দু জোনাকি এক দুই করে এসে পড়তে থাকল।

তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছিল না। প্রথম একটা কাঠের গুঁড়ি মনে হচ্ছিল। ওপরে ঝোপঝাড়। তার ওপর বড় বৃক্ষের ডাল। ডালে প্রকাণ্ড মধুর চাক। কোন বন্য জীব হয়তো মধুভাণ্ডে মুখ দিতে এসে কামড় খেয়ে চলে গেছে। সব মধু এখন ঝোপের ওপর বৃষ্টিপাতের মতো পড়ে পড়ে নিচের মানুষটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। সে নড়ছে না। নড়লে জোনাকি উড়ে আসবে না। ওকে একটা কালো কাঠের গুঁড়ি ভেবে এক দুই করে সব জোনাকি শরীরে বসে গেলে সে যেন জোনাকির রাজা হয়ে গেল। তার ঘরে বিবি আন্নু যে এখন একা আছে, একেবারে সে তা ভুলে গেছে। আন্নুর কাছে সে আবার রাজার মতো ফিরতে পারবে, সে আবার ফসলের মাঠে ছুটতে পারবে—কি আনন্দ, কি আনন্দ। সে মশগুল হয়ে গেছে। নানারকম লতাপাতার স্বপ্ন দেখছে। একশটা জোনাকি সে গুনে আরও এক কুড়ি পাঁচ গণ্ডা করে ফেলেছে। কিন্তু সে বেশি সংগ্রহ করেছে। সে উঠে বসল। এখন রাতের শেষ প্রহর। কালো মোষের মতো এক খণ্ড মেঘ আকাশের চাঁদ ঢেকে দিলে সে দেখল, ফেলু এক আশ্চর্য মানুষ হয়ে গেছে। তার শরীরে

—তা কি কাম ? সে নিজেই প্রশ্ন করছে নিজেকে। যেন সে আন্নুর হয়ে জবাব দিচ্ছে। কাম হইছে দুরারোগ্য ব্যাধি ছাইড়া যায়। আমি ঝোপ-জঙ্গল থাইকা দ্যাখ কি কৌশলে জোনাকি ধইরা আনছি।

তবু সাড়া দিচ্ছে না। তা দেবে না। ঘুম তো ওর ষোলআনা। ঘুমালে আর উঠতে চায় না। সে এবার ঝাপের দরজাটা সামান্য ঠেলে ভিতরে উঁকি দেবে ভাবল, অথবা ডাকবে, আন্নু ওঠ। আর ঘুমাইস না। ভোর হইতে আর দেরি নাই।

এটা কি হয়ে গেল! দরজাটা পড়ে যাচ্ছে কেন! ভিতরের দিকে একটা বাঁশে আটকানো থাকে দরজাটা। ঘুমোবার আগে আন্নু বাঁশটা ঠেলে দেয়। বাইরে থেকে সহজে ঠেলে দিলে দরজাটা ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু এমন অদ্ভুত, সে দেখল দরজাটা পড়ে যাচ্ছে। ভিতরে কেউ যেন বাঁশ সরিয়ে রেখেছে। সে বলল, আমার লাইগা দরজা খোলা রাখছস! তা ভাল। তর ঘুম পরীর মত, ঘুমাইলে আর হুঁশ থাকে না। কাপড়চোপড় উইঠা যায়। একখানে তুই, অন্য-খানে তর কাপড়। তা তুই এডা ভাল করস নাই। আকালু নারাণগঞ্জে যাইব মোকদ্দমা করতে। অরে আমি কোরবানি দিমু। বলেই সে হাঁ হয়ে গেল।

যা ভেবেছিল তাই। ঘর খালি। সে এতক্ষণ জোরজার করে মনকে প্রবোধ দিয়েছে। যেন পাশেই আছে, সাড়া দেবে। জলের তরঙ্গ ভাইসা যায় মত বিবি তার লুকোচুরি খেলছে। সে বলল, তা ভাল হইছে। সে জোরে বলল, তা ভাল হইছে। সে চিৎকার করে আসমান-জমিন কাঁপিয়ে হেঁকে উঠল, তা ভাল হইছে! ওর হাতের মুষ্টিতে সেই কোরবানির চাকু! ভাল হইছে। আমার পরান কাইরা নিছে আকালুদ্দিন।

—তুমি আকালুদ্দিন কই যাইবা। হালার কাওয়া। বলতে বলতে সে কেমন স্থবির হয়ে গেল। মেঝের ওপর সেও ভূলুণ্ঠিত হল। বালকের মতো কাঁদল, আন্নু, তুই আমারে কালাইয়া কই গ্যালি। আমার মাটি-জমিন কার লাইগা!

সুতরাং এ অঞ্চলে আবার দুটো খবর কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকল। হাটে মাঠে এখন এ-দুটো খবরই। প্রথম খবর, এ-অঞ্চলের মহিমামণ্ডিত মানুষ দেহরক্ষা করেছেন। দেহরক্ষার আগে তাঁর তিন পুত্রকে সজ্ঞানে বলে গেছেন, শ্রাদ্ধের মালিক হবে ভূপেন্দ্রনাথ। মণীন্দ্রনাথকে তিনি কিছু বলেন নি। পাগল ছেলের দিকে শুধু মুহূর্তের জন্য অপলক তাকিয়ে ছিলেন। বলে গেছেন, সে বড়, শ্রাদ্ধের মালিক তারই হবার কথা। কিন্তু পাগল বলে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ার পাঠ তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেছেন। আর বলেছেন, বিষয়সম্পত্তি যা আছে সব তোমাদের। কেবল বড়বৌ এবং মণীন্দ্রনাথ ভরণপোষণ পাবে। পলটু সাবালক হলে তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হবে। যতদিন না হচ্ছে ততদিন ভূপেন্দ্রনাথই ওর হয়ে দেখাশোনা করবে। এবং উইলের যাবতীয় মুসাবিদা তিনি তাঁর সিন্দুকে করে রেখে গেছেন। মৃত্যুর পর সেটা বের করে যেন দেখা হয়।

আর খবর ফেলুর বিবির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওর সারা গায়ে ঘা ফুটে বের হয়েছে। এবং ঘাগুলো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে। অন্ধকারে যারাই ওকে দেখেছে, দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে ফেলু! চুল খাড়া। দাড়ি শণের মতো, চোখ আরও কোটরাগত। ঘাড়টা মোষের মতো ছিল, এখন কী করুণ চেহারা ফেলুর। সে ঘর থেকে বের হয়ে নানা জায়গায় বিবিকে খুঁজেছে। গোয়ালে থাকতে পারে, না নেই। বাঁশঝাড়ের নিচে থাকতে পারে, তাও নেই। মাঠে নেমে গেল, না নেই, ওর কেন যে মন মানছে না, সে খুঁজে মরছে। এমন নিষ্ঠুর নিয়তি তার জেনেও সে বিশ্বাস করতে পারে নি। হাজিসাহেবের বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না। সে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, আন্নু। না, কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোন বনঝোপে লুকিয়ে থাকতে পারে—হা হা করে হেসে উঠতে পারে—এই আমার মরদ, একটু না দেখলেই চোখ ঘোলা ঘোলা। সে জোরে জোরে ডাকল, আকালুদ্দিন সাহেব আছেন! জবাব নেই। সে চিৎকার করে উঠল, আন্নু আছস! বার বার সে পাগলের মতো এখানে সেখানে ডাকছে, আছস নাকি! আমি ফ্যালা। আমার আর কি থাকল ক দিনি! খোদা, তুই ক। আমি পারি না তর দরবারে আগুন লাগাইতে। আমি কি যে না পারি আল্লা!

এ-ভাবে এ-অঞ্চলে সূর্য উঠে গেল আকাশে। হাল-বলদ নিয়ে চাষীরা মাঠে নেমে যাচ্ছে। খর তাপে আবার বসুন্ধরা জলতে থাকল। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। বৃষ্টি নেই। ঝড় নেই। এখনও কালবৈশাখী আরম্ভ হল না। নদীর পাড় ধরে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। ওরা খবর পেয়েছে, এক মহিমামণ্ডিত মানুষ ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। পুকুরের পাড়ে দাহ করা হবে। মানুষজন সব এখন জড় হচ্ছে ক্রমে।

ফেলু আর পারল না। সে কেমন কঠিন এবং শক্ত হয়ে গেল। অঞ্চলের সব মানুষেরা যখন একজন বুড়ো মানুষের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ছুটছে ঠাকুরবাড়ি তখন তার পিয়ারের বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে আকালুদ্দিন। মামলা-মোকদ্দমার নাম করে সে শহরে পালিয়েছে। সে আর দেরি করল না। শহরে যাবার আগে এইসব গ্রাম মাঠ খুঁজে যাবে। সে জানে, বিবিকে সে আর ঘরে তুলতে পারবে না। বিবি তার না-পাক, আকালু নিকা করে আবার তাকে পাক (পবিত্র) করে নেবে। মিঞা, তুমি আকালু, আর আমি ফেলু। আমার বিবিরে নিয়া যাবে কোনে!

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতার মতো অসহায় দেখাচ্ছে ফেলুকে। কেউ সমবেদনা জানাচ্ছে না। ফেলুর এমনই হবে যেন কথা ছিল। তার চেহারা দেখে কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু সে দেখল, হাজিসাহেবের ষণ্ডটা এদিকে উঠে আসছে। ওর পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে এক হাত সম্বল করে কিছুই পারবে না। সুতরাং সে সাপে-বাঘের খেলার মতো খেলতে খেলতে বাড়িতে উঠে এলে জমিতে ষণ্ডটা দাঁড়িয়ে থাকল। ষণ্ডটা ফেলুর বাড়িতে উঠে আসতে ভয় পায়। ফেলু ঘরে ঢুকে বাতা থেকে কোরবানির চাকুটা বের করে নিল।—মিঞা আকালু তোমার খোঁজে, বিবির খোঁজে বাইর হইলাম। ঠিক মহরমের দিনের মতো আবার তরবারি ঘুরানো।

সে সামনে কখনও দেখতে পাচ্ছে ষণ্ডটা ওর প্রতিপক্ষ, কখনও আকালু, কখনও পাগল ঠাকুর। সে খোঁচা মারছে হাওয়ায়, দু'পা পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার সামনে নেচে নেচে হাত ঘুরিয়ে, সামনে-পিছনে হাত রেখে উঠে বসে যথার্থ খেলা। সে হাওয়ার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে মেতে গেছে। জমি থেকে ষণ্ডটা উঠোনের ওপর ফেলুর এমন কাণ্ড দেখে দে ছুট। বিবি পালিয়ে গিয়ে ফেলুকে পাগল করে দিয়েছে। হাতে তার কোরবানির চাকু। হাওয়ার সঙ্গে সে যুদ্ধে মেতে গেছে।

যারাই ওর বাড়ির পাশ দিয়ে গেল ফেলুর এমন কাণ্ডকারখানায় হাসতে পর্যন্ত সাহস পেল না। হাসলেই সে নেমে এসে পেটে খোঁচা মারবে চাকুতে।—কি মিঞা, কেমন মজা লাগে। বিবি আমার ঘরে নাই বইলা তামাশা ত্যাখতাছ।

কেউ কথা বলছে না বলে সে আরও ক্ষেপে যাচ্ছে। ক্ষেপে যাচ্ছে মাছির তাড়নায়। ভনভন করে সব সময় চারপাশে মাছি উড়ছে। সে যেন মৃত পচা জন্তু। হাতের ঘা থেকে সেই পচা দুর্গন্ধ ওকেও মাঝে মাঝে ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো করে দেয়। সে তখন কি করবে, ভেবে উঠতে পারে না। কিছুক্ষণ কাফিলা গাছটার নিচে বসে থাকল। আঠার গাছ এটা। খাঁ খাঁ করছে রোদ আঠা শুকিয়ে গেছে। ওর কোন হুঁশ নেই। শরীরে যে অজস্র জোনাকি জলছে তা পর্যন্ত তার খেয়াল নেই। সে বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে এখন। কোরবানির চাকুটা সে আমূল বসিয়ে দিচ্ছে মাটিতে। কখনও তুলে এনে কাফিলা গাছের কাণ্ডে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই এক হিংস্র খেলা তার এখন। জাফরি ওর দিকে তাকিয়ে তেমনি জাবর কাটছে। সে জানে, এখন কোথাও ঘাস নেই। তবু কোথাও জাফরির খোঁটা পুঁতে দিয়ে বের হবে। কখন ফিরবে ঠিক কি।

তখন সোনা উঠোনের চারপাশটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মানুষজন আসছে তো আসছেই। সে কোথাও যেতে পারছে না। তাকে সকলের সঙ্গে ধরে রাখতে হবে। ধরাধরি করে অর্জুন গাছটার নিচে নিয়ে যাবার সময় সেও সবার সঙ্গে একপাশে ঠাকুর্দার মৃতদেহ ধারণ করবে। মনজুর কাঠ কাটার তদারক করছে। হাজিসাহেবের বড় বেটা এসেছে। মেঝ আসে নি। সে গেছে আকালুর খোঁজে। আকালুর ঘরে বিবি আছে। তিন বাচ্চাকাচ্চা। এ-সব ফেলে সে ফেলুর বিবিটাকে নিয়ে যে কোথায় গায়েব হয়ে গেল। হাজি-সাহেবেরও মন ভাল না। তবু একবার দেখে চলে গেছে। দীনবন্ধু কাঠ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুকুরপাড়ে।

ঠাকুরদার মুখ ঢাকা। ঠাকুমা পায়ের কাছে বসে রয়েছে সেই থেকে। একেবারেই নড়ছে না। এখন সেই আবার, বড় জেঠিমার সংসারে যত কাজের চাপ। সকালের দিকে ঝিল কে কাটবে এই নিয়ে বচসা হয়ে গেছে নরেন দাস এবং আড়াই হাজারের রায়মশাইর সঙ্গে। ঝিল কেটে পুণ্য সঞ্চয় করবে নরেন দাস। কাল থেকেই ছোটকাকার পিছনে পিছনে ঘুরেছে। তাকে

যেন ঝিলটা কাটতে দেওয়া হয়। নরেন দাসের চোখেমুখে আর কোন অপমানের চিহ্ন ভেসে নেই। মালতী নিরুদ্দেশে চলে গেছে—গিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে। সে আবার নতুনভাবে ফসল ফলাচ্ছে, ঘরের চালে শণ দিয়েছে এবং রাতে তাকে আর জেগে থাকতে হয় না। যা কিছু পাপ অবশিষ্ট আছে ঝিল কাটতে পারলেই শেষ হয়ে যাবে।

সোনা সকাল থেকেই ভীষণ আফসোসে কষ্ট পাচ্ছে। সে ভেবেছিল বসে বসে ঠাকুরদার মৃত্যু দেখবে। কিন্তু তার যা ঘুম, ঠাকুরদাকে বাইরে বের করে আনলে সে দেখল তিনি আবার আগের মতো ভাল হয়ে যাচ্ছেন। ভাল হয়ে যাচ্ছেন বলেই ওর ঘুম পেয়ে গেল। বাবা, মেজ জ্যাঠামশাই পায়ের কাছে ভূলুণ্ঠিত হলেই তিনি কেমন সহসা ভাল হয়ে যাচ্ছিলেন। ভাল হয়ে যাবে বুঝি, তবে আর বসে থেকে কি হবে। বড় জ্যাঠামশাইও বসে নেই। তিনি আগেই উঠে চলে গিয়েছিলেন, মেজ জ্যাঠামশাইকে ঠাকুরদা শ্রাদ্ধের ভার দিলে তিনি সটান উঠে পূবের ঘরে চলে গেলেন এবং শুয়ে পড়েছিলেন। সোনাও পাগল জ্যাঠামশাইর শরীরে ঠ্যাঙ তুলে দিয়ে আশ্চর্য গভীর ঘুমে ডুবে গেল। কিন্তু খুব সকালে বড় জেঠিমা ডাকলেন, এই, ওঠ সোনা, তোর জ্যাঠামশাইকে তুলে আন—তোর ঠাকুরদা আর বেঁচে নেই। শুনে ধড়মড় করে সে উঠে বসেছিল। নেমে এসেছিল উঠোনে। সবাই কাঁদছে। লণ্ঠনের আলো জ্বলছে চারপাশে। সকাল হয়ে যাচ্ছে। তবু লণ্ঠনগুলো নেভানো হচ্ছে না। ঠাকুরদার মুখ ঢাকা। পাখিরা তেমনি কলরব করছে চারপাশে, কামরাঙা গাছে ফল নেই, তবু ক'টা টিয়াপাখি উড়ে এসে বসেছে। এমন এক আশ্চর্য সকালে যেখানে আবার হাত ধরে নাতিদের নিয়ে সূর্যোদয় দেখার কথা, তিনি কিনা সে-সব না করে সোনাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। ওর ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল চাদরটা তুলে বুড়োমানুষটার মুখ দেখে—কি বাসনা আর তাঁর ছিল, কোনো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বড় মাঠের ফসল কাটার গান শোনার ইচ্ছা যদি থাকে তবে যেন সে বলবে, এবার আপনি সোজাসুজি সব দেখতে পাবেন ঠাকুরদা। আমাদের মতো উঁকি দিয়ে আর কিছু দেখতে হবে না। বলেই সে চাদরটা তুলে মুখ দেখল। চোখ খোলা। তুলসীপাতা চোখে। ঠাকুরদার প্রাণপাখি তবে চোখ দিয়ে বের হয়েছে। কোথায় আছে সে! কোন গাছের ডালে বসে মজা দেখছে না তো—বা, বেশ তুমি শুয়ে আছ চিৎপাত হয়ে, আমি গাছের ডালে বসে আছি। পাখি হয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে কোউর্ কোউর্ করে

ডাকছি। সে ভাবল পাখিটা হয়তো নীলবর্ণের পাখি হবে। মহীরাবণের পাতাল-প্রবেশের মতো ঘটনা যদি হয়, সে তো পাখি না হয়ে একটা মাছি হয়ে যেতে পারে। ঠাকুরদার সাদা চাদরে একটাই মাছি এখন উড়ে উড়ে বসছে। সে মাছিটাকে খপ্ করে ধরে ফেলতে চাইল। প্রায় সেই ফেলুর মতো সবই খপ্ করে ধরে ফেলা। কিন্তু মাছির নাগাল পেল না। মাছিটা উড়ে উড়ে কামরাঙা গাছের ও-পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ডালে অদ্ভুত একটা পাখি, নীলবর্ণের পাখি। নীলবর্ণ মানেই পবিত্র কিছু। ওর মনে হল তখন গাছের ডালে যে পাখিটা বসে আছে, ওটাই ঠাকুরদার আত্মা। ওটাই ওর কামনা-বাসনার ঘর।

পাগল মানুষ দেখলে বলতেন, ওটাই হচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি। সারাজীবন মানুষকে ঘুরিয়ে মারে। কোথাও সে আছে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, সে তোমার জন্য গাছের ডালে বাসা বানাচ্ছে। তুমি ঠিকঠাক ঘুরে মরছ, তোমার কেবল ইচ্ছা আশ্বিনের ভোরে জয়ঢাক বাজুক। তুমি সারাজীবন বরণডালা হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে। মনে হবে সামনের মাঠ পার হলেই নদী। নদীর পারে গ্রাম। সব মরীচিকার মতো তোমাকে জন্ম থেকে জীবনের সব ক'টা দিন ঘুরিয়ে মারবে সে।

সোনা তখন দেখল পাগল জ্যাঠামশাইও চাদর তুলে বাপের মরামুখ দেখছেন। তারপর প্রাণটা এখন কোন গাছের ডালে পাখি হয়ে বসে আছে চারপাশে খুঁজছেন।

তখন সবাই ধ্বনি দিল, বল হরি, হরি বোল।

পীতাম্বর মাঝি পায়ের কাছে বসে কাঁদছে। —আপনে জীবন সাঙ্গ কইরা চললেন ঠাকুর। আপনে জীবনে একটা বাদে মিছা কথা কইলেন না।

সবাই বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরদাকে তুলে ধরছে। কেমন দুলছে শরীরটা। সব আত্মীয়স্বজন যে যেটুকু পারছে ছুঁয়ে রাখছে। সোনা শিয়রের দিকে আছে। ওরা কাঠবাদাম গাছটা পার হয়ে তেঁতুলতলায় এল। তারপর বড় জাম গাছ, এবং বাঁ দিকে গেলে দুটো খেজুর গাছ পড়বে। দক্ষিণের পাড়ে সেই অর্জুন গাছ। সেখানে ঝিল কাটা শেষ। ওরা গাছটার নিচে ঠাকুরদাকে রেখে চারপাশে ঘিরে বসে থাকল। আশ্চর্য, সোনা দেখছে সেই নীল রঙের পাখিটা আবার এসে অর্জুন গাছটায় বসেছে। সেই ঘরটা নীল, যেখানে অমলা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, মায়ের মুখ ব্যথায় নীল, ছোট্ট বোনটা তার তখন জন্ম

নিচ্ছে। যার মুখ আর অপবিত্র মনে হয় না। এই পাখিটাও নীল। সে দেখল আকাশ নীল, স্বচ্ছ জল নীল রঙের। এ-পাখি ঠাকুরদার আত্মা না হয়ে যায় না। সে চারপাশে লক্ষ্য রাখছে পাখিটা কিভাবে থাকছে। ওর মনে হল ঠাকুরদার চিতা যতক্ষণ না জ্বলবে ততক্ষণ পাখিটা অর্জুনের ডালে বসে থাকবে।

ওর ইচ্ছা হচ্ছিল লালটু পলটুকে সব ঘটনাটা খুলে বলে। দাদা, ঐ যে দেখছিস পাখিটা, ওটা ঠাকুরদার আত্মা। চিতা জ্বলে উঠলেই পাখিটা আকাশে উড়ে যাবে।

এত বেশি লোকজন যে সে উঠতে পারছে না। সবাই চেপে বসে আছে যেন। গোপাটের ও-পাশে হাজার লোক কি তারও বেশি হবে। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ অর্জুন গাছটার কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাপের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। মুখটা শুকনো, দাঁত নেই। একটা শুকনো কঙ্কালের ওপর চোখ দুটোতে তুলসীপাতা, দুটো মাছি চোখের পিচুটি শুষে খাচ্ছে। সোনা হাত দিয়ে মাছি দুটোকে তাড়িয়ে দিল। এই মৃত চোখ কি বিমর্ষ। মরে গিয়েও ঠাকুরদা দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রেখেছেন। এত যে আয়োজন, এত যে হরিসংকীর্তন এবং ঘি, তেল, বিল্বপত্র, চন্দনের কাঠ—সবই এই মানুষকে দাহ করা হবে বলে। শৈশবে এই মানুষ সোনার মতো নদীর চরে নামতে গিয়ে ভয় পেয়েছে, যৌবনে এই মানুষ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ছিল—বামুনের চক নিলামে উঠেছে। নিলাম ডাকছে পীতাম্বর মাঝি, শুধু সামান্য কথা ঘুরিয়ে বললে এত দামী জমি নীলামে ওঠে না। হস্তান্তর হয় না। তবু অবিচল অটল। অথচ সামান্য এক প্রেম, পলিন নামে এক ইংরেজ যুবতী পুত্রবধূ হয়ে থাকবে—সংসার বড় কঠিন। মিথ্যা তার—ধর্ম, মানুষটাকে অযথা মিথ্যায় জড়িয়ে দিল। তাঁর এমন সোনার টুকরো ছেলে পাগল হয়ে গেল। পীতাম্বর মাঝি এ-সব মনে করে হাউহাউ করে কাঁদছে। সে-ই মিথ্যা দলিল করেছিল, এই মানুষের বিরুদ্ধে।

ঠিক যজ্ঞের হবির মতো এই দেহ এখন। ঠাকুরদাকে একেবারে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। সোনা কেমন ভয়ে তাকাতে পারছে না। হাত-পা কাঠি কাঠি, শক্ত। জেঠিমা ওর হাতে সামান্য তেল দিলেন। সবাই এখন ঠাকুরদার শরীরে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। সবাই ঘড়া করে জল তুলে এনে ঠাকুরদাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। তাকেও জল আনতে হবে, তেল মেখে দিয়ে ঠাকুরদাকে স্নান করাতে হবে। অথচ কেন যে সে ভয় পাচ্ছে অথবা মনে হচ্ছে, যেন মানুষটাকে

সে আর চেনে না। এ মানুষ তার ঠাকুরদা নয়। সেও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

জেঠিমা বললেন, সোনা, তেল মেখে দাও। শেষ কাজ। দাঁড়িয়ে থেকো না।

সোনা তবু দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন সেই নীলবর্ণের পাখিটা উড়ে উড়ে এসে শিয়রে বসছে। বোধ হয় এটা একটা চড়াইপাখি। চড়াইপাখি নীলবর্ণের হয় না। তবু আকার দেখে তাই মনে হয়। পাগল জ্যাঠামশাই পাখিটাকে দেখছে। এ-ভাবে যদি কোনদিন সোনা মরে যায়, সোনার আত্মা পাখি হয়ে যাবে। ওর ভাবতে ভাল লাগছে, পাখিটা ডালে ডালে অথবা এই ঘাসে এবং মাটিতে সারা কাল বেঁচে থাকবে। মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় না। আত্মাটা আবার কারো নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন জন্ম হবে আর একটা মানুষের। এ-ভাবে ঠাকুরদা তাদের ভিতর ফের ফিরেও আসতে পারে। সে তো চিনতে পারবে না—ঠাকুরদা যে ফিরে এসেছেন। সে কিভাবে যে তখন তার ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলবে!

এই মৃত্যু সম্পর্কে সোনা নানাভাবে ভেবে দেখেছে—তবু সব ভাবনাগুলোর ভিতর ঠাকুরদা যদি আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকে তবে যেন সেই ভালো। সে মনে মনে এখন এমনই চাইছে। সে মনে মনে বলল, পাখি, তুমি আর উড়বে না। এবারে ঠাকুদার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাও। ঠাকুরদা পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। তিনি আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকবেন।

—যা সোনা, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। শশিভূষণ সোনাকে তাড়া লাগাল। কপালে তেলটা মেখে দে।

সোনা কপালে তেল মেখে দিল। ওর হাতটা কেমন শিরশির করে কাঁপছে। অদ্ভুত অনুভূতি। ঠাকুরদার শরীরে প্রাণ নেই। ভাবা যায় না। এ-ভাবে মানুষ মরে যায়। কেমন রুক্ষ এবং কঠিন চামড়া ঠাকুরদার। সে তাড়াতাড়ি এক ঘড়া জল এনে ঢেলে দিল শরীরে। হাতের আঙুল যেন এখনও শিরশির করে কাঁপছে। একজন মরা মানুষকে ছুঁয়ে দিয়ে সে কেমন অপবিত্র হয়ে গেছে। স্নান না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। অথচ একটা কষ্টও প্রাণে। ঝিল কাটা হয়ে গেছে। দীনবন্ধু এবং মাস্টারমশাই কাঠ সাজিয়ে রাখছে। নানাবর্ণের ছবি এখন। ফুলের পাশে আতপ চাউল, তিল, তুলসীপাতা। ঠাকুরদার শরীরে রাশি রাশি ঘি মাখানো হচ্ছে। থেকে থেকে মেজ-জ্যাঠামশাই, বাবা বাবা বলে

হতাশ গলায় কেঁদে উঠছেন। কেবল নিষ্ঠুর চোখ-মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন পাগল জ্যাঠামশাই। তাঁকে জোর করে ধরে আনা হল। তাঁকে জেঠিমা তেল দিলেন হাতে। জল এনে দিলেন। তিনি নিজে কিছুই করতে চাইছেন না। তেল, জল ঢেলে আবার তিনি অর্জুন গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পায়ের কাছেই চিতা সাজানো হচ্ছে। তিনি কেমন নিষ্ঠুর চোখমুখ নিয়ে এ-সব দেখছেন। যেন অর্জুন গাছের নিচে আগুন জলে উঠলেই, চিতায় তিনি বাপের সঙ্গে আরোহণ করবেন। জ্যাঠামশাইর চোখমুখ দেখে সোনার ভয় ধরে গেছে প্রাণে। সবার অলক্ষ্যে জ্যাঠামশাই চিতায় ঝাঁপ দিলে কি যে হবে!

কুশ তিল তুলসী মন্ত্রপাঠ তাকে কিছুতেই আজ অন্যমনস্ক করে দিতে পারছে না। সে সবসময় পাগল জ্যাঠামশাইকে চোখে চোখে রাখছে। ঠাকুরদাকে ছুঁয়ে দেবার পর ওর মুখে থুথু জমে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলতে পারছে না। অশুচি শরীর নিয়ে সে কিছু গিলে ফেলতে পারে না। সে বার বার তাই থুথু ফেলছে। এবং যেই না মনে হচ্ছে ঠাকুরদাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে—মাংস পোড়া চামসে গন্ধ বের হবে—আগুন, ধোঁয়া, একটা আস্ত মানুষ পুড়বে, কি ভয়াবহ দৃশ্য—সে সেই সকাল থেকে এই দৃশ্যটা চোখের ওপর কিভাবে যে দেখবে—ঠিক সেই মোষ বলির মতো তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এখনও সে-সবের কিছুই হচ্ছে না। জেঠিমা পাগল জ্যাঠামশাইকে ধরে এনেছেন ফের। সাতপাক ঘুরে ঘুরে মুখাগ্নি। তারপর সেই দৃশ্য—কি কঠিন এবং নিষ্ঠুর যে মনে হচ্ছে না! সবাই কোলে তুলে নিয়েছেন ঠাকুরদাকে। সে পা ছুঁয়ে রেখেছে মাত্র। সেও সবার সঙ্গে সঙ্গে সাতপাক ঘুরছে। সাতবার প্রদক্ষিণ করছে চিতা। কোলে তুলে ছোট্ট শিশুকে মা যেমন বিছানায় শুইয়ে দেন, তেমনি সবাই ঠাকুরদাকে চিতার কাঠে দক্ষিণের দিকে মাথা, উত্তরের দিকে পা, মুখ মাটির দিকে রেখে শুইয়ে দিল! এবং একটা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিল। সে এতক্ষণ কাঁদে নি। তাঁর কাঁদতে ইচ্ছা হয় নি। পাগল জ্যাঠামশাই কাঁদেন নি। তিনি এতক্ষণ সব দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু যেই না সবাই শুইয়ে দিয়ে সাদা কাপড়ে শরীর ঢেকে দিল, পাটকাঠির আগুন ঝিলে ঢুকিয়ে দিল, পাগল জ্যাঠামশাই আকাশ-ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, বাবা……। সোনাও ঠাকুরদাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে কাঁদছে। জ্যাঠামশাইর কান্না দেখে কেউ আর স্থির থাকতে পারে নি। এই চিতার পাশে যত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এমন দৃশ্য দেখে কেউ না কেঁদে পারল না। প্রায় যেন কান্নার রোল পড়ে গেল। আগুন তখন চিতার

চারপাশটা গিলে ফেলেছে। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে আগুন দাঁত বের করে দিচ্ছে। অর্জুনের ডাল, শাখাপ্রশাখা এমনকি পাতায় আগুনের হল্‌কা গিয়ে লাগছে। আর পাগল মানুষ তেমনি শিশুর মতো উপুড় হয়ে চিতার পাশে পড়ে কাঁদছেন। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শশিভূষণ ওঁকে ধরে বসে আছে। পায়ের কাছে সোনা বসে আছে। আগুন ক্রমে দাঁত বের করে চারপাশে হল্‌কা ছড়াচ্ছে।

মেজ জ্যাঠামশাই চন্দনের কাঠ ফেলে দিলেন কিছু চিতায়। কিছু ধূপ। ঠাকুরদার গলার দু'পাশ দিয়ে আগুন উঠে গেছে। উপুড় করে শোয়ানো শরীর। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চামড়া পুড়ে প্রথম কালো হয়ে গেল, তারপর সাদা রঙ। আস্ত মানুষ, এ-ভাবে পুড়ে যাচ্ছে। সোনা মরে গেলে ওর শরীরও সবাই পুড়িয়ে দেবে। সোনা মরে গেলে সবাই ঠিক এ-ভাবে ধরে তুলে দেবে চিতায়। পাগল জ্যাঠামশাই মরে গেলে ঠিক এ-ভাবে আগুন জেলে দেবে তারা। মা মরে গেলে—সে আর ভাবতে পারল না। কেমন এক হতাশা তার। এবং জীবন সম্পর্কে সে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল।

পাগল জ্যাঠামশাই এখন গাছের কাণ্ডে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কিভাবে এক অমৃতময় শরীরযজ্ঞের হবির মতো জলে যাচ্ছে দেখছেন। চামসে মাংসপোড়া গন্ধ বের হচ্ছে। সোনার ভিতর থেকে থেকে বমিবমি পাচ্ছে। কিন্তু সে কিছুতেই ওক দিতে পারছে না। ওর ভয় করছে বড়। সে এখন চিতার দিকে তাকাতে পারছে না। কি শরীর কি হয়ে যাচ্ছে! আর আগুন কিভাবে একটা মানুষকে গিলে খাচ্ছে। গাছের নিচে যারা বসে আছে ওরা কীর্তন করছে। ধোঁয়া উঠে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এঁকেবেঁকে সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে কেমন বহুদূরে ঠাকুরদা অসীমে মিশে যাচ্ছেন।

সোনার মনে হল সে চিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বরং পাগল জ্যাঠামশাইকে নিয়ে অন্য কোথাও তার চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরদার শরীর পুড়ে গেলে চিতায় জল ঢেলে দিতে হবে। সে, পাগল জ্যাঠামশাই একসঙ্গে জল ঢেলে দেবে। বরং সে এখন ভাবল, অর্জুন গাছের ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে থাকবে। কি অপলক তিনি দেখছেন!

বোধ হয় পাগল মানুষ ভাবছিলেন তখন—এই শরীর অমৃতময়, এই শরীরে আমার জন্ম। আপনার রক্ত এ-ভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে। আপনার ধর্ম এভাবে সারা জীবন এবং শতবর্ষ পার হলেও এক অমৃতময় ধ্বনি

ভেবে অন্ধকারে পথ হাঁটবে। আমরা কিছুই জানি না। এই যে জগতে, দিন মাস কাল, মৃত্যু এবং সৌর আবর্তন সবই এক নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘোষিত হচ্ছে। কত ছোট সেখানে আপনি, আপনার এই কোষাকুষি, তিল তুলসী বিল্বপত্র। বাবা, আমরা বড় বেশি নিজেকে নিয়ে বাঁচি। আমাদের সবকিছু যত তুচ্ছই হোক, তাকে অপরিসীম মূল্যবান মনে করে সংসারের যাবতীয় সত্যকে অস্বীকার করি।

সোনা এখন পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাঠামশাই একবারও ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। আগুনের আঁচ ওদের শরীরে এসে সামান্য লাগছে। সোনা হাত ধরে টানছে, একটু দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। শশিভূষণ আর একটু আগে দাঁড়িয়ে আছে। দীনবন্ধু লক্ষ্য রাখছে সব। বড়বৌ ভূপেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছে, ওঁকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না। সোনাকে বলুন ওকে এদিকে নিয়ে আসতে।

শশিভূষণ বলল, আমি আছি। এখানেই থাকুক। এই শেষ দেখা। কাছে থাকলে ওর মন শান্তি পাবে।

কিন্তু ভয়, এমন অপলক তিনি এই আগুনে কি দেখছেন! চোখে এসে প্রতিবিম্ব পড়ছে আগুনের। সোনা দেখল জ্যাঠামশাইর চোখদুটোয় চিতা জ্বলছে। আর গাছের নিচে এক চিতা। তিন চিতায় সে, জ্যাঠামশাই এবং ঠাকুরদা ক্রমাগত যেন জ্বলে যাচ্ছেন। সে ভয়ে জ্যাঠামশাইকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।

সোনা ডাকল, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা আপনাকে ডাকছে। পাগল মানুষ এবার সোনার দিকে তাকালেন। —ঐ দ্যাখেন জেঠিমা দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে জামগাছটার নিচে গ্রামের সব মেয়েরা দাঁড়িয়ে এই বুড়ো মানুষের দাহ দেখছে। সকলেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখছে মাটি এবং মানুষের এক চিরন্তন ইচ্ছা এভাবে শেষ হয়ে যায়।

পাগল মানুষকে সোনা কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারল না। তিনি এখন হাসছেন। তবে আর ভয় নেই। সোনার এখন মনে হল ঠাকুরদার সব অহঙ্কার আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। সে-জন্য জ্যাঠামশাই হাসছেন। সব পৌরুষ জ্বলে যাচ্ছে, সে-জন্য জ্যাঠামশাই হাসছেন। মিথ্যা ধর্মবোধ জ্বলে যাচ্ছে, সে-জন্য তিনি হাসছেন।

সে বলল, জ্যাঠামশাই, আপনার চক্ষে ঠাকুরদার চিতা জ্বলতাছে।

মণীন্দ্রনাথ সোনার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, তুমি নিজের চোখ দেখ সোনা।

সে লালটুকে বলল, দাদা রে, আমার চক্ষে কিছু জ্বলতাছে?

লালটু উঁকি দিল। বলল, হ'। সোনা তর দুই চক্ষুতে ঠাকুরদার চিতার আগুন।

—সত্যি?

—হা রে, সত্যি।

সোনা তাড়াতাড়ি বড়দাকে ডাকল। —দ্যাখি, তর চক্ষু।

চিতার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সবার চোখে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সে বলল, বড় কষ্ট না রে দাদা। আমরা সবাই মইরা যামু। ভাবতে কষ্ট লাগে, না?

তখন শশিভূষণ বলল, অত কাছে যাবে না। এদিকে সরে এস। মাথা ফুটে ঘিলু ছিটকে আসতে পারে।

মারেন বাড়ি। শশিভূষণ ভূপেন্দ্রনাথকে বলল।

—মাথাটা হেলে পড়ে যাচ্ছে। সোনা লালটু সবাই তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বাঁশের খোঁচায় মাথাটা ফাটিয়ে দিতেই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। সোনা দেখল আগুন ক্রমে কমে আসছে। এখন আছে শুধু সামান্য মাথার খুলি, নাভি এবং কোমরের দিকটা। ভূপেন্দ্রনাথ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেটা আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুরদার নাভিটা একটা পোড়া ব্যাঙের মতো দেখাচ্ছে। ব্যাঙের লেজ খসে শরীরটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। ঠাকুরদার এমন চেহারা দেখে ওর ভারি মজা লাগছিল। সোনা যেমন আয়নায় মুখ দেখে, ঠাকুরদা যদি আয়নায় এখন তেমনি মুখ দেখতে পেত!

সে ঠাট্টা করে বলল, বুড়াকর্তা, আয়না দিমু আইনা? আয়নায় যদি নিজের মুখটা দ্যাখেন। সে পলটুকে বলল, বড়দা রে, ঠাকুরদা একবারও ভাবছিল শরীরটা ওর ব্যাঙের মত হইয়া যাইব।

পলটু ধমক দিল।—থাড়, ধনকাকারে কইতাছি।

সোনা এবার চুপ করে গেল। এমন মহাপার্বণের দিনে সে কি আজেবাজে ঠাট্টা করছে। সে বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে কেন। মানুষের জীবন কত ছোট, কত অপরিসীম তুচ্ছ। এই বয়সেই এসব ভাবায় বলে সোনা মাঝে মাঝে এই পৃথিবী বিচরণশীল মানুষের জন্য নয় এমন ভাবে। যুদ্ধের বর্ণনা সে শুনেছে। শশিভূষণ নানাভাবে কোথায় কিভাবে মহাযুদ্ধ হয়েছে, দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গার কথা বর্ণনা

করেছে। সোনা সে-সব শুনে মাঝে মাঝে এক সুন্দর সুদৃশ্য জগৎ নিজের মনে তৈরি করে নেয়। সেখানে ঈশমদাদা তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে হয়। সেই ঈশমদাদাই আজ এমন মহাপার্বণে কাছে আসতে পারছে না। সে দূরে দূরে অপরিচিত মানুষের মতো থাকছে।

তখন ভূপেন্দ্রনাথ অবশিষ্ট নাভিটুকু সামান্য একটা টিনের কৌটায় পুরে রেখে মাথায় করে জল নিয়ে এল। তখন নদীর চরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কি গরম আর এই দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন বৃষ্টির দরকার। কালবৈশাখীর ঝড়ে আমের কুসি ঝড়ে পড়বে। বৃষ্টিপাত না হলে ধরণী শান্ত হবে না। ভূপেন্দ্রনাথ, পাগলঠাকুর মানুষের দিনগত পাপক্ষয়ের পর শান্তি আসুক, এই ভেবে সারাক্ষণ ঘড়া ঘড়া জল এনে চিতার আগুনে ঢেলে দিতে থাকল।

জলে চিতা নিভে গেলে ওরা বাড়ি ফিরে গেল। সোনা ফেরার সময় পেছনে তাকাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই এক কলসি জল চিতার ওপর রেখে পিছন ফিরে কলসি ফুটো করে দিয়েছেন। কেউ আর তাকাচ্ছে না পিছনে। সোনার মনে হল, পিছনে তাকালেই সে তার ঠাকুরদাকে দেখে ফেলবে। তিনি যেন পদ্মাসনে শ্মশানের ওপর বসে আছেন। সেখানে আর শ্মশান নেই। সুজলা সুফলা ধরণী। তিনি সেখানে বসে মধুপান করছেন। মৃত্যুর পর মানুষের মধুপান দেখতে নেই। সোনা সে জন্য আর তাকায় নি। তাকালে পাপ হবে সে এমন শুনেছে। অথচ খুব দেখার ইচ্ছা তার। সেই শ্মশানে কি হচ্ছে এখন। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হলে অস্পষ্ট অন্ধকারে কোন কুকুর অথবা শেয়াল আসতে পারে। কোন কুকুর অথবা শেয়াল দেখতে পেলেই বুঝতে পারবে ঠাকুরদা শেয়াল-কুকুরের বেশ ধারণ করে ফিরে এসেছেন। নীলবর্ণের পাখি আর থাকছেন না। কিন্তু সে তাকাতে পারল না ভয়ে। ঠাকুরদা রাগ করতে পারেন তার ওপর। তুমি সোনা যা নিয়ম নয়, যা করতে নেই, সে-সব করার বড় শখ তোমার। তুমি তাকালে কেন। আমি আর বড় বটগাছের মাথায় নক্ষত্র হয়ে থাকব না। আমি কিছুই দেখব না তোমাদের। তোমাদের বাগে পেলে ঘাড় মটকে দেব।

সোনা সেজন্য খুব সুবোধ বালকের মতো পিছনে না তাকিয়ে সবার সঙ্গে পুকুরে ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। এবং অন্ধকার নামলেই ওর কেমন ভয় ধরে গেল। সে দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টারের পাশে গিয়ে বসে থাকল। এমন কি যখন একটা গণ্ডগোল উঠেছিল গোপাটে—ফেলুর শরীরে কি জ্বলছে, ফেলুর ঘা

ফুটে এখন আগুনের মতো জলছে নিভছে এবং হাতে তার কোরবানির চাকু, ভয়ে কেউ কাছে যাচ্ছে না, সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, আবার সে কার গলা যে হ্যাৎ করে কেটে ফেলবে—কেউ বুঝতে পারছে না, বাতাসে যেন সেই নরহত্যার খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে, সবাই সাবধান হয়ে যাচ্ছে, ওকে দেখলে গোপাটে আর কেউ নেমে যেতে পারছে না—তখনও সোনা শশীমাস্টারের পাশে বসেছিল।

কেবল নির্ভীক এক ষণ্ড। সে চারপা শক্ত করে ভিটাজমিতে দাঁড়িয়ে আছে। কতদূরে ফেলু আছে বাতাসে গন্ধ শুঁকে সে টের পাচ্ছে।

হাওয়া কেটে রাতের অন্ধকারে হাত তুলে ওপরে, ফেলু ছুটছে। ফেলু গোপাট পার হয়ে এদিকে আসছে। কি তুমি এমন একখানা মানুষ, তোমার চিতার চারপাশে মানুষ ভেঙে পড়েছে! তুমি মশাই মরেও গরব তোমার যায় না। আগুনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাক আর লোকে দেখে হায় হায় করে, আমি এক ফেলু, বিবি ঘরে নেই, আমার দুঃখে কেউ কাঁদে না। ত্থাখি কি আছে মাটিতে। তুমি কোনখানে আছ, তোমার পাগল ছাওয়ালে আমারে কানা কইরা দিছে। বলেই সে সেই শ্মশানের ওপর এসে কেমন উত্তেজনায় কোরবানির চাকুটা দুলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য করতে থাকল।

কেউ দেখে ফেললে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কি যে হত! কেবল শশীমাস্টার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছে পুকুরপাড়ে অর্জুনগাছের নিচে একজন মানুষের অবয়ব। তার শরীর থেকে আগুন ফুটে বের হচ্ছে। শশীমাস্টার বলল, সোনা, আয়। মজা দেখবি। মানুষ মরে কোথাও যায় না। এ পৃথিবীতেই থাকে। শুধু আমরা দেখতে পাই না এই যা। ঐ ত্থাখ।

সোনা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, সত্যি সেই মহাশ্মশানে তার ঠাকুরদা ফিরে এসেছেন। কি সব অলৌকিক ঘটনা। ওরা দেখল কিছুক্ষণ সেই আত্মা সেখানে ঘোরাঘুরি করে শেষে মাঠের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কালো শরীর বুঝি সেই বিদেহীর। সারা শরীরে আগুন ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। অদ্ভুত সব চোখ আগুনের—সে চিনে উঠতে পারল না। কেবল শশীমাস্টার বলল, ভয় পেতে নেই সোনা। আমরা সবাই এভাবে মরে যাব। মরে গিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসব।

সোনা কিছু বলতে পারছে না। ওর ভয়ে জর আসছে।

কম্প দিয়ে জর আসছে সোনার। সেই আগুনে পোড়া মানুষটার শরীরে

অজস্র আগুনের ফুলকি জলছে নিভছে। সোনা হি হি করে মাঘমাসের শীতের মতো কাঁপছে। সে মাস্টারমশাইর বিছানায় একটা কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়ল। মনে হল এবার বুঝি তার পালা। এবার বুঝি সেও ঠাকুরদার মতো মরে যাবে। পোড়া শরীরে আগুন ফুটে বের হবে। জালাযন্ত্রণায় ছটফট করবে সে। সে সবাইকে দেখতে পাবে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সে কাঁথার ভিতর কেবল ছটফট করছিল।

শশিভূষণ সহসা চিৎকার করে উঠল, ধনবৌদি, তাড়াতাড়ি আসুন। সোনা কেমন করছে, এসে দেখুন।

পাগল মানুষও সোনার সঙ্গে পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছিল। লালটু পলটু ডুব দিয়েছিল, এক ডুব। ওরা বাড়ি এসে নিমপাতা মুখে দিয়ে আগুনে শরীর সেঁকে ঘরে উঠে গেল। বাড়ির সবকিছু এখন সাফ করা হচ্ছে। চার-পাশে গোবরছড়া এবং উঠোনে সব বিছানাপত্র বের করা হয়েছে। সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। পাগল মানুষ উঠোনের ওপর ভিজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হারান পাল দন্দির বাজার থেকে নতুন কাপড়, ফল-মূল, সাগু সব ঈশমের মাথায় নিয়ে এসেছে। নতুন মাটির সরা। মাটির গ্লাস, পাতিল সব এসেছে।

শশীবালা বসে নেই। গোলা থেকে ধান বের করে দিচ্ছে। মুড়ি-চিঁড়ার ধান। মাথায় করে মনজুর নিয়ে যাচ্ছে। সময় কম, দেখতে দেখতে দশ রাত্রি পার হয়ে যাবে। এতটুকু আর অন্যমনস্ক নয় শশীবালা। অদ্ভুত একটা কষ্ট বুকের ভিতর বাজছে। খাটজোড়া মানুষটার দিনমান পড়ে থাকা। এখন ঘরটা বড় খালি খালি, ফাঁকা ফাঁকা। ঘরের ভিতর ঢুকলেই বুকটা তার হাহাকার করছে। কতদিন আগে মানুষটা তাকে এ-সংসারে নিয়ে এসেছিল। এখন সব মনে করতে পারে না। তবু মনে আছে শশীবালা বড় অবোধ বালিকা তখন! তার বাবা মেয়ে পণ নিয়েছিল বলে আদর বড় বেশি তার। মানুষটার বয়স অনেক। বড় ভয় করত দেখলে। সে মানুষটাকে প্রায় বাপের মতো সমীহ করত। এবং বড় হতে হতে এই সংসারেই শশীবালা কৈশোরের কাল যৌবনের কাল কাটিয়ে দিল। বয়সের তফাত মানুষটার সঙ্গে ত্রিশের ওপর। ছেলেরা জন্মেছে আরও পরে। সে তো জানত না কিছু। মানুষটা তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল। বাপের কথা মনে আসে না। মার কথাও মনে নেই। এই মানুষই তার সব ছিল। বাপ-মায়ের স্নেহ দিয়ে এই সংসারে এক অখণ্ড প্রতাপশালী মানুষ তাকে বড় করে তুলেছিল। বড় করতে করতে মানুষটা কখন তার অতি আপনার এবং নিজের হয়ে গেল। যেন তার অঙ্গের সামিল। এখন সেই মানুষ যত বয়সই হোক চলে গেলে বুকের ভিতরটা বড় ফাঁকা লাগে।

বড়বৌ এসে এসব দেখে ধমক দিল।—কি দরকার মা আপনার এসব

করার। আজকের দিনটা অন্তত চুপচাপ বসে থাকুন। বলে সে ঈশমকে ডাকতেই দেখল উঠোনে কেউ নেই। পাগল মানুষ ভিজা কাপড়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

সে বলল, যাও, ভিতরে যাও। বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল পুবের ঘরে। নতুন কাপড় দু'ভাগ করে খোঁট করে দিল। একটা খোঁট পরিয়ে দিল। আর একটা খোঁট গায়ের করে দিল। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ পুরোহিত-দর্পণ দেখছিল। ওরা খেয়াল করে নি বড়দা তখনও উঠোনে। আকাশে তারা না উঠলে ওরা ফলমূল খেতে পারবে না। এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার উঠোনে নামে নি। লালটু পলটু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েরা উত্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। কে আগে তারা দেখতে পাবে। তারা দেখতে পেলেই বাবা, জ্যাঠামশাই খেতে পাবেন। ওরা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশে তারা খুঁজছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, শ্যামা দাদারে খবর পাঠা।

শচীন্দ্রনাথ বলল, কাইল যাইব ঈশম।

পাগল মানুষের গলায় চাবির সঙ্গে কাচা ঝুলছে। তিনি এখন একটা কুশাসনে চুপচাপ বসে আছেন। একটা খোঁট গায়ে। উত্তরের মাঠে ছেলেদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। দক্ষিণের পুকুরে বাবাকে দাহ করা হয়েছে। এ কথাটা মনে হল তাঁর।

ওরা মাঠে কি করছে! ওঁর বড় জানার ইচ্ছা হল। এখন অন্ধকার নামছে! বড়বৌ এদিকে নেই। ছেলেরা কি করছে। মাঠে ওরা এমন কোলাহল করছে কেন। তিনি উঠবেন ভাবলেন।

তখন বড়বৌ বলল, কোথাও এ ক'দিন যাবে না। যেতে নেই।

পাগল মানুষ বড়বৌর এমন কথায় আবার বসে পড়লেন। শশীমাস্টার জানালা দিয়ে এসব লক্ষ্য করছে। সোনা বসে আছে ওর পাশে? সেও উত্তরের মাঠে কোলাহল শুনছিল। ওরা কি করছে সবাই!

সে জানালা থেকে বলল, বড়বৌদি লালটু পলটুকে দেখছি না।

—ওরা তারা খুঁজছে আকাশে।

—তারা!

—তারা না দেখলে জল খেতে পাবে না।

—এখনও কি তারা আকাশে ওঠে নি! সে বের হয়ে যাবার সময় দেখল সোনা শুয়ে আছে। ওর জর গায়ে। অবেলায় ডুব দিয়ে জর এসে পারে ভেবে সে নেমে গেল উঠোনে। ঘরে আরও মানুষ-জন রয়েছে। সোনা ভয় পাবে না। একা থাকলে ভয় পাবার কথা। ওকে সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়েছে। এখন ওর মনে হচ্ছে, কে সে! কে এই শ্মশানে আবছা অন্ধকারে এমন নৃত্য করে গেল! কে সে মানুষ!

সে উঠোনে নেমে এসে দেখল পাগল মানুষ তেমনি বসে আছে। তিনিও কি আকাশের কোথায় নক্ষত্র উঠতে পারে প্রথম, লক্ষ্য রাখছেন। শশীমাস্টার দক্ষিণের পুকুরে যাবে ভাবল, এবং যেতে গিয়ে সে দেখল আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিমে কালপুরুষ উঠে বসে আছে। উত্তরের মাঠ থেকে ওরা দেখতে পাবে না। কারণ গ্রামের গাছপালা উত্তরের মাঠ থেকে এই কালপুরুষকে ঢেকে রেখেছে। সে যে ভেবেছিল, সেই বিদেহী কে. সে কেন এখানে এসেছিল, কি তার কাজ, আর কেনই যে সোনাকে সে এমন একটা মজা দেখাল এখন ভেবে পাচ্ছে না। সোনা ভয় পায়নি তো। ভয় পেলে কম্প দিয়ে জর আসতে পারে। সে তবু এখন এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না। কেবল বড়বৌর সঙ্গে দেখা হলে বলল, বৌদি, সোনার মনে হয় জর এসেছে।

—সে কোথায়!

—আমার বিছানাতে শুয়ে আছে।

—থাকুক। ওর মা তো কাজ করছে। ঘরদোর সাফসোফ হচ্ছে। আভা এসে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এখন ও আপনার ঘরেই শুয়ে থাকুক।

শশীমাস্টার এবার বলল, লালটু-পলটু আকাশে তারা খুঁজছে। অথচ এখানে দেখুন কত তারা!

বড়বৌ আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

—তাই তো!

—এটা কি বলুন তো?

—কোন্‌টা?

—ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন সাতটা তারা।

—ও, ওটা তো কালপুরুষ।

—আপনি তবে জানেন।

—জানব না!

—লালটু-পলটু আকাশে এত তারা থাকতে কেন যে উত্তরের মাঠে তারা খুঁজছে বুঝি না।

—আপনি যান। ওদের নিয়ে আসুন। পড়াশুনা নেই বলে তারা দেখবার নাম করে মাঠে নেমে গেছে।

শশিভূষণ মাঠে নেমে দেখল ওরা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এদের এখন বয়স হয়েছে। লালটু পলটু প্রায় সাবালক হতে চলেছে। এই মৃত্যুর দিনে কিছু আত্মীয়স্বজনের মেয়ে নিয়ে নক্ষত্রের খোঁজে চলে আসা শশিভূষণের ভাল লাগল না।

সে মাঠে নেমে বলল, তোমরা এত দূরে কেন! এদিকে এস।

পলটু বলল, মাস্টারমশায় আমরা আকাশে তারা খোঁজছি।

—দেখতে পাচ্ছ না?

—না।

—এদিকে এস।

ওরা ছুটে চলে এল।—ঐ দ্যাখো। কত তারা। দ্যাখছো সাতটা তারা।

—দেখতে পাইছি।

—ওর নাম কালপুরুষ।

পলটু ছুটে বাড়ি উঠে এল। চন্দ্রনাথকে বলল, ধনকাকা তারা দেখেন আইসা।

—কই?

—ঐ দ্যাখেন কালপুরুষ।

চন্দ্রনাথ দেখল এখন আকাশে অনেক তারা। বলল, তোমরা তারা চেনো?

—হ্যাঁ, সে ঘাড় কাৎ করল এবং ছুটে নেমে এল মাঠে। যেন সে কত তারা চেনে।

তখন শশিভূষণ বলছিল, তোমরা সবাই উত্তরের দিকে তাকাও।

সবাই মুখ তুলে সোজা উত্তরের আকাশে তাকাল। পলটু ছুটে এসেছে। সে জানে মাস্টারমশায় নিশ্চয়ই মাঠে দাঁড়িয়ে এখন এই গাছ ফুল মাটি সম্পর্কে কিছু বলছেন। সে আর কালপুরুষ দেখল না। সে মাঠে নেমে এসে দেখল, সবাই উত্তরের আকাশে কি দেখছে।

পলটু বলল, মাস্টারমশয়, কি দ্যাখছেন।

—ওটাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে।

লালটু দেখল এখন এখানে সবাই আছে। কেবল সোনা নেই। এমন একটা আশ্চর্য সন্ধ্যায় উত্তরের আকাশে যখন মাস্টারমশাই ওদের নক্ষত্র চেনাচ্ছেন, তখন সোনা নেই ভাবা যায় না। সে বলল, মাস্টারমশয়, সোনাকে ডাইকা আনি। কারণ লালটু জানে সব বলে দিলে সোনা এলে মাস্টারমশাই আবার প্রথম থেকে বলবেন। বরং সোনা এলেই আরম্ভ হবে। সোনা এই সময়ে কাছে থাকবে না, আর ওরা ঠাকুরদার মৃত্যুর দিনে আকাশের সব নক্ষত্র চিনে ফেলবে সে হয় না। সোনা এমনিতেই বড় কি কেন স্বভাবের ছেলে। বার বার সে নানাভাবে প্রশ্ন করবে।

শশিভূষণ লালটুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, ছোট ভাইটি কাছে নেই বলে কষ্ট হচ্ছে তার। লালটু এমনিতে সোনাকে খেলায় অথবা মাঠে নেমে গেলে, কিংবা ওরা যখন ভলিবল খেলে, সঙ্গে নিতে চায় না। সোনা বেহায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়। লালটু মাঝে মাঝে তেড়ে আসে। সোনা ছুটে যায়, আবার কিছুদূর গেলেই সে ওদের দিকে হাঁটতে থাকে। এমন কতদিন দেখেছে শশিভূষণ। কোনদিন ওর চোখের ওপর এসব হয় না। চোখের ওপর করতে সাহস পায় না লালটু। কিন্তু আজ ঠাকুরদার মৃত্যুতে কেমন সব অনিত্য ভেবে ছোট ভাইটির জন্য তার কষ্টবোধ হচ্ছে। শশিভূষণ আস্তে আস্তে বলল, সে আসবে না লালটু। ওর জর এসেছে। আমার বিছানাতে কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে।

লালটুর মুখ কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। শশিভূষণ দেখল আকাশে তখন জ্যোৎস্না। আকাশে তখন ছায়াপথ আপন মহিমায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত। তিনি বললেন, ঐ যে জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সাতজন ঋষির নামে প্রতিটি নক্ষত্রের নাম। তুমি কাল্পনিক রেখা টানলে দেখতে পাবে ওদের অবস্থান ঠিক একটি জিজ্ঞাসাচিহ্নের ওপর। তুমি যদি সেখান থেকে আরও একটি বড় লম্বা রেখা টেনে ওপরে তুলে দাও দেখতে পাবে একটা খুব বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেখতে পাচ্ছ?

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠল।

—ওটা কি হবে বলতো?

—ওটা ধ্রুবতারা, না স্যার! দীপালি বলে মেয়েটি এমন বলল।

—তুমি তবে চেন।

—আমার বাবা আমাকে মাঝে মাঝে আকাশের নক্ষত্র দেখান। নাম বলেন। কিন্তু স্যার আমি ভুলে যাই। মনে রাখতে পারি না।

লালটু বলল, হ্যাঁ মাস্টারমশয়, তারপর!

সে আরও জানতে চায়। এই ধ্রুবলোকের রহস্য তার জানার বড় ইচ্ছা।

—এরা কিন্তু সবই নক্ষত্র। নক্ষত্র আর গ্রহে কি তফাত বল তো! শশিভূষণ বললেন।

—নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে, গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই।

—ঠিক। খুব ঠিক জবাব। তোমার নাম কি?

—আমার নাম দীপালি। দীপালি চ্যাটার্জি।

—নামের আগে শ্রীমতী বলতে হয়।

দীপালি জিভ কাটল।

খুব ভাল হয়েছে। লালটু এমনই চেয়েছে। বড্ড পাকা। আগে আগে কথা। শহরে থাকে বলে সব জানে এমন একটা ভান সব সময়। সে এই মেয়ের মুখ থেকে কিছুই শুনতে চায় না। সে বলল, তারপর মাস্টারমশয়।

—ঐ ছাখো, পশ্চিমের দিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ?

—অনেক তারা মাস্টারমশয়।

—ছাখো, বড় একটা তারা জ্বলজ্বল করছে।

—বড় বড়, হ্যাঁ হ্যাঁ বড়।

দীপালি বলল, ওটা শুকতারা না স্যার?

আবার! এই মেয়ের জ্বালায় এখানে থাকা যাবে না। লালটু বলল, স্যার আমাদের মাথার ওপর উত্তর-দক্ষিণে ছায়াপথ আছে না?

—আজ জ্যোৎস্না উঠেছে। ছায়াপথ ভাল দেখতে পাবে না। একদিন অন্ধকার আকাশে তোমাদের ছায়াপথ দেখাব। নিজেরাও দেখতে পার। কি বিচিত্র লীলা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

—স্যার, ও-সব গ্রহে আমাদের মানুষ থাকে?

—হ্যাঁ থাকে। তোমার মত মেয়েরা থাকে। লালটু আর বিরক্তি চাপতে পারল না। এমনিতে মনে ওর ভীষণ একটা দুঃখ বাজছে। সোনা নেই। ওর জ্বর হয়েছে। ঠাকুরদা নেই। বাড়ির বড় ঘর খালি। মাস্টারমশাই নক্ষত্র দেখাচ্ছেন, তার ভিতর ফড়ফড়ি। এসব ফড়ফড়ি তার একেবারে ভাল লাগে না। সে মনে মনে বলল, দিমু ঠাস কইরা গালে এক চড়। ফড়ফড়িটা ভাইঙা যাইব।

শশিভূষণ বলল, এইভাবে আমরা এক বড় সৌরজগতে বসবাস করি। এই ক্ষুদ্র এ-পৃথিবী। মানুষ আরও কত ছোট, কত কিঞ্চিৎ সে। তোমরা এই মাঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অণু পরিমাণ জগৎ দেখতে পাচ্ছ তার ভিতর রয়েছে লক্ষ কোটির মতো সূর্য; আপন দাবদাহে নিরন্তর জ্বলছে। হিলিয়াম গ্যাস। বায়ুশূন্য আকাশ। এবং আমরা যা-কিছু নীল দেখছি সে অন্তহীন সাম্রাজ্যের স্বরূপ। তুমি আমি সেখানে অতি তুচ্ছ। আমাদের জন্ম-মৃত্যু আরও তুচ্ছ। তবু একটা নিয়ম আছে জেনে রাখ, যেমন আপন মহিমায় এই সৌরজগৎ আবর্তন করছে, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করছে, রাত দিন বৎসর এবং কাল তারপর মহাকাল, এ-সবের ভিতর একটি অতি নিয়মের খেলা আছে। সে হচ্ছে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসা। শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তের মতো আমরা আবার ফিরে ফিরে আসি। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শেষ হয়ে যাই না।

শশিভূষণ আজ এই মৃত্যুর ব্যাপারে কি একটা যেন আবেগ বোধ করছে। সে, সংসার অনিত্য এমন ভাবছে। এক পাগল মানুষ আছেন, নিত্যদিন সংসারে চুপচাপ, কোন কথা বলেন না, বেশ আছেন, যেন কথা না বললে বেশ থাকা যায়, সংসারের সারবস্তুটি তিনি জেনে ফেলেছেন—কি হবে দুঃখ নিয়ে বেঁচে থেকে, যে ক'দিন আছ, থাক খাও, পাখি ছাখো—তিনি কেবল পাখি দেখছেন, শশিভূষণ ওদের নক্ষত্র দেখাচ্ছে। শ্মশানে যে বিদেহী এসে গেল, সে কে! সে কি মানুষের আত্মা। কেবল কষ্ট পাচ্ছে। কেবল ঘুরছে ফিরছে, কোথায় গেলে একটু শান্তি মিলবে!

সে এবার সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, এবার তোমরা বাড়ি এস। মাঠে বেশি সময় দাঁড়াতে নেই। তিনি এখন আমাদের চারপাশেই আছেন। পার-লৌকিক কাজ শেষ না হলে তিনি মুক্তি পাবেন না।

সবার এমন কথায় খুব ভয় ধরে গেল। প্রাণে ভয় ওদের সব সময়ই ছিল। তবুও ওরা আকাশে তারা দেখতে এসেছিল মাঠে। দলবল নিয়ে এসেছে। এই দিনে একা মাঠে নেমে আসে কার সাধ্য। কিন্তু শশিভূষণের এমন কথায় সবাই ওকে ঘিরে থাকল। মাস্টারমশাই বাড়ি উঠে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওরাও উঠে যাবে।

শশিভূষণ বলল, তোমরা এদ্দিকে কোন কালো রঙের মানুষ দেখেছ?

ওরা মাস্টারমশাই কি বলতে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছে না। ওরা তাকিয়ে থাকল।

—এই একজন কালো রঙের মানুষ। শরীরে আগুন জলছে নিভছে।

ওরা এমন কথায় একেবারে শশিভূষণকে ভয়ে জড়িয়ে ধরল।

—তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন। আমি দেখেছি। আমার এখন দেখা দরকার তিনি তোমাদের ঠাকুরদার আত্মা, না অন্য কিছু।

ওরা কথা বলতে পারছে না। একা উঠে যেতে পারলে বাড়ি উঠে যেত। তাও পারছে না। এক অবলম্বন এই মানুষ। ওরা ওকে ঘিরে খুব কাছে কাছে থাকছে। যেন সেই প্রেতাত্মা ওদের ছুঁয়ে দেবার জন্য চারপাশে ঘোরা-ফেরা করছে। ভয়ে লালটু পলটু গায়ত্রী জপ করছিল।

—মানুষের গায়ে আগুন জলে নেভে এ আমি কোনদিন আশা করি নি।

আমাদের শরীর আগুনে পুড়ে গেলে কি হয়! আমরা ছাই হয়ে যাই। আর কি থাকে!

শশিভূষণকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।—ওটা দক্ষিণের মাঠে নেমে গেছে। আমি তোমাদের কি বলব, এত যে সাহস আমার, কিছুতেই আজ দক্ষিণের মাঠে যেতে সাহস পাই নি।

—ভয় মানুষকে কি করে রাখে! ভয় মানুষকে অদৃশ্য অলৌকিক কিছু আছে যা ছোঁয়া যায় না, যা অনুভূতিগ্রাহ্য নয়, তেমন এক জগতে বসবাস করতে প্রেরণা দেয়। সে বলল, এই হচ্ছে আমাদের ভগবান লালটু। যার কোন ব্যাখ্যা চলে না, তাকে আমরা ভগবান ভাবি। তোমার ঠাকুরদা এখন কালো রঙের শরীর নিয়ে নানারকম আগুনের গর্ত সৃষ্টি করে নিজেই ভগবান হয়ে গেছেন। বলতেই ভয়ে ওরও কেমন শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠল। সে বলল, এস, আর মাঠে নয়। তারা তোমাদের আর দেখতে হবে না।

তারপর ছুটে এসে প্রায় সবাই উঠোনে উঠে এল। দক্ষিণের ঘরে এত লোকজন, তবু কেন জানি শশিভূষণের ভয় কাটছে না। সোনা কাঁথা মাথায় মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। নিচে পড়ার টেবিলে নরেন দাস, শ্রীশ চন্দ আরও গ্রামের কিছু মানুষ বসে বসে গল্পগুজব করছে ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সে তাদের কিছু বলল না। যেখানে সোনা শুয়ে আছে তার পাশেই বসল। জরটা বেড়েছে কিনা দেখার সময় মনে হল, সোনা শক্ত হয়ে আছে। একি, এত শক্ত কেন! সে চিৎকার করে উঠেছিল, আপনারা আসুন। সোনা কি হয়ে গেছে!

বড়বৌ তখন সাদা পাথরে সাগু ভিজাচ্ছিল। ফলমূল কাটছিল। ওরা তারা দেখে ফলজল খাবে। কাঁচা দুধ, মধু এবং তরমুজ। আর সাগু কলা।

এই খাদ্য। রান্নাঘরে ওদের আত্মীয় পবন কর্তার বৌ আছে। ধন রান্নার সবকিছু বের করে দিচ্ছিল। তখনই ওরা শুনল সেই অসহনীয় চিৎকার।

সবাই ছুটে গেল। মণীন্দ্রনাথ সবাইকে এমন ছুটে দক্ষিণের ঘরে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

ফেলু মাঠে নেমে এসে তখন কোন্‌দিকে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। হালার কাওয়া। হালার ভগবান তুমি ঠাকুর। তোমার ভগবানগিরি ভাইঙ্গা দিমু। বলে সে যেমন তার কোরবানির চাকু হাওয়াতে দোলায়, তেমনি দোলাতে দোলাতে সে দেখল, ওর গায়ে অজস্র জোনাকি। সেই যে গতকাল মধুর সঙ্গে সব লেপ্টে আছে শরীরে, তারা আর উড়ে যেতে পারে নি।

ভীষণ মজা পেয়ে গেল ফেলু। সে ভাবল এখন একবার সেই ধর্মের ষণ্ডটাকে দেখলে হয়। কোথায় আছে সে। তাকে চিনতে না পারলেই শালা লেজ তুলে পালাবে। সে ভাবল সব শালাকে আজ ভয় দেখাবে। এই যে মাঠ আছে, সাদা জ্যোৎস্না আছে, আহা, অন্ধকার হলে খুব ভাল হত, লোকে দেখত কেবল কাঠের মতো একটা মানুষ নিরন্তর ছুটছে আর তার গায়ে অজস্র দেব-দেবীর চোখ। চোখ জলছে। সে ফের কিংবদন্তী হয়ে যেতে পারে। মানুষের ভগবান হয়ে যেতে পারে। সে বলল, আমি ভগবান, আমি আল্লা। আমি না পারি কি। কেয়ামতের দিনে আমি রসুলের পাশে বসে থাকব। বলব, হা রসুল আমার বিবিরে যে নেয় কাইরা তার ধর্ম কি! আমার যে অন্ন নাই, আমার ধর্ম কি। জালালি যে পানিতে ডুইবা মরল তার ধর্ম কি!

এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল মানুষের আর থাকে কি। সে যে কি চায় নিজেও জানে না। সে মরে সুখ পাবে না, বেঁচে থেকে সুখ পাবে না, তবে কি ধর্মের নামে সুখ। সে সুখ সুখ করে বিবি বিবি করে পাগল হয়ে গেল। সে বলল, আন্নুরে, তুই কই গ্যালি। তরে কই পামু। শহরে আমি যাই কি কইরা। তুই একটা মানুষের দুঃখ বুঝলি না। তাজা ষণ্ড দেইখা পালাইলি। আমি আর মানুষ নাই রে, আন্নু। আমি যে কি হইয়া গ্যাছি নিজেই জানি না। আমার চোখে পানি ঝরে না।

সে শ্মশানের উপর নৃত্য করে সেই সৎ মানুষটাকে অপবিত্র করে দিয়ে এসেছে। সারাদিন সবাই করজোড়ে ছিল, আর সে লাথি মেরে ঘট ভেঙে

দিয়েছে। জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল আর তার হা-হা করে হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে জানে কেউ আর আজ এই মাঠের দিকে তাকাবে না। কেউ আজ আর এ-মাঠে নেমে আসবে না। সবারই এক ভয়। মানুষ মরে গেলে শেষ হয়ে যায় না। আকাশে-বাতাসে সে ঘুরে বেড়ায়। সে ডাকল, ঠাকুর, তোমার পোলারে সাবধানে রাইখ। তুমি ত মইরা গিয়া শক্তিধর হইছ। পার কিনা ছাখ আমার লগে। আমি আর তোমার পোলা, আকালু যারে আমি পামু খুন করমু। আমি কোনখানে যামু না। এই শরীরে বনে-জঙ্গলে ঘুইরা বেড়ামু। ফাঁক পাইলেই হ্যাৎ। হালার কাওয়া। যেন মনে হল বাতাসে ঠাকুরের আত্মাটা এখন ভাসছে। সে জোনাকি ধরার মতো মাঠে আত্মা খাঁচায় পোরার বাসনাতে ছুটছে। হালার কাওয়া। হ্যাৎ। সে হাত বাড়িয়ে বাতাস থেকে ঠাকুরের আত্মা ধরতে চাইল।

এভাবে ঘুরে ঘুরে যখন বোঝা গেল মৃত আত্মা বাতাস থেকে ধরা যায় না অযথা সে ঘুরে মরছে মাঠে, অকারণ এই আত্মা খুঁজে মরা, তার চেয়ে বরং ভাল, গিয়ে বসে থাকা আকালুর ঘরের পিছনে। সে যদি রাতে তার ঘরে ফিরে আসে।

তখন ভূপেন্দ্রনাথ বলল, মাথায় জল ঢালো বেশি করে।

গোপাল ডাক্তার এসেছে। সে গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে বসে আছে। জ্বরের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেছে এমন বলছে। খুব বেশি জ্বর। এত জ্বরে মাথা ঠিক থাকে না। রক্ত উঠে গেছে মাথায়। সকলে ভিড় করে বসে রয়েছে। কে আর কি খাবে। বড়বৌ সব ফেলে চলে এসেছে এ-ঘরে। আশ্বিনের কুকুর পাহারায় আছে। সে ঘরে ঢোকে না। সে কেবল চারপাশে লক্ষ্য রাখে কেউ ঘরে ঢুকে যাচ্ছে কিনা। মাথায় এত জল ঢালা হচ্ছে যে মেঝে ভেসে গেছে জলে। সোনা চোখ বুজে আছে। হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। এখন হাত খোলা নরম। দাঁত লেগে ছিল, এখন দাঁত খোলা। বড়বৌ মাঝে মাঝে ডাকছেন, সোনা সোনা! ভাল লাগছে? সে চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছে না। চোখদুটো এখনও লাল আছে। মাথায় রক্ত উঠে এমন হয়েছে। পাঁচের ওপর জ্বর। সে বিড়বিড় করে কি বলছে যেন। চন্দ্রনাথ মুখের কাছে কান নিয়ে গেল। বলল, জল দিমু। বড়বৌ কাছে এসে বলল, জল খাবি সোনা? হাঁ কর। তুই এমন করছিস কেন! কি হয়েছে, কি কষ্ট! এই তো আমরা, কি ভয় তোর!

শশিভূষণ কেমন বোকা বনে গেছে। সে কেন যে বলতে গেল, এই সোনা মজা দেখবি। বলে সে কেন যে পুকুরপাড়ে শ্মশানের দিকে হাত তুলে দেখাল। ভয়ে তার এমন হয়েছে। এ-সব বলে দেওয়া ভাল। সে বলে দিল, আমি যে কি করলাম বড়বৌদি! ওরও যেন ভয়ে কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে।—কি বলব আপনাদের, শ্মশানে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আপনারা সবাই যখন বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন, আমি সোনাকে নিয়ে এ-ঘরে বসে রয়েছি। আমার উচিত ছিল জানালা বন্ধ করে রাখা। তবে আর এ-সব দেখতে হত না। বলেই কেমন সে জানালাটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল।

দেখলে মনে হবে শশিভূষণেরও যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসবে। সে বলতে পারছে না। সে ঢোক গিলছে। সে বলল, পাঁজি এনে দিনটা দেখলে হত। কি দিনে তিনি গেলেন।

—কেন কি হয়েছে! বড়বৌ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল। ধনবৌ অনবরত জল ঢেলে যাচ্ছে। ওর হাত ধরে গেছে, তবু কিছু বলছে না। সে অপলক তাকিয়ে আছে সোনার দিকে। দাহ করার সময় কাছে থাকতে না দিলেই হত এমন ভাবছে।

শশিভূষণ বলল, আমি বললাম মজা দেখবি! সোনাকে আঙুল তুলে দেখালাম। সোনার কৌতূহল বেশি জানি। সে বার বার আমাকে নানাভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। মানুষ মরে কোথায় যায়, কি হয়, কোথাও সে জন্ম নিলে আমরা চিনতে পারব কিনা—এই আমাদের ঠাকুরদা। নাকি জন্ম কোথাও কেউ নেয় না, বাতাসে আত্মাটা মিশে যায়। আমি বললাম, সোনা, কেউ মরে শেষ হয়ে যায় না। ঐ ছাখো। দেখলাম বৌদি, পোড়াকাঠের মতো একজন মানুষ সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে শ্মশানে এসে নৃত্য করছে। গায়ে ফুলকি দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ঠিক যেন আধপোড়া একটা মানুষ শ্মশানে ফিরে এসেছে ফের। আমার ভারি কৌতূহল হল। সোনাকে বললাম, ঐ ছাখ। মানুষ মরে কোথাও যায় না। এ-পৃথিবীতেই সে থাকে।

গোটা ঘর চুপচাপ। কোন শব্দ নেই। কেবল জল পড়ার শব্দ। গোপাল ডাক্তার বলল, এখানে এসব আলোচনা করা ঠিক না।

সবারই হুঁশ হল। এ-সম্পর্কে আর কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। রাম রাম। সবাই মনে মনে রাম-নাম উচ্চারণ করল।

এই বাড়িতে আর কিছু নেই এখন মনে হয়। সবাইকে কেমন এক-

অশরীরী এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে। সবাই ভয়ে ভিতরে ভিতরে ফুলে যাচ্ছে। কেবল মণীন্দ্রনাথ ঘরের দাওয়ায় বসে হাঁকছে, গ্যাৎচোরেৎশালা। ওকে কেউ খেতে দিচ্ছে না। সারাদিন না খেয়ে তাঁর খিদে বেড়ে গেছে।

কুকুরটাও হাই তুলল। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। গোপাল ডাক্তার ঘন্টি বাজাতে বাজাতে আজ গেল না। ওকে ঈশম দিতে যাবে তার গ্রামে। সে একা একা ফিরে আসবে আবার। সে যেমন সোনার জন্মকালে হাতে লণ্ঠন, বগলে লাঠি নিয়ে বের হয়েছিল, তেমনি নিশীথে গোপাল ডাক্তারকে দিতে চলে গেল।

সোনা তখন বাতাসে বুঝি দুলছিল। সে হাতটা ওপরে তুলে বাতাসে কি খুঁজছে। সে কি খপ করে ধরতে চাইছে।

ধনবৌ এমন দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। সারারাত এই করতে করতে কখন সকাল হয়ে গেছে কেউ টের পায় নি। তারিণী কবিরাজের জন্য আবার লোক পাঠানো দরকার। ঈশমই সকালে এসে খবর দিল, একজন ওঝা আসছে। সে সোনাকে দেখবে। সকালে যে ওঝা এসেছিল তার বর্ণবহুল চেহারা বড়বৌকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। সে চুল বড় করে রেখেছে। হাতের নোখ কাটে না, পায়ের নোখ কাটে না। চোখ লাল। গাঁজার কল্কে হরেক রকমের গলায় বাঁধা। সে বলল, মরা দোষ পাইছে। সহজে নিস্তার নাই।

তা নিস্তার না থাকুক, সোনা কিন্তু সকালের দিকে কেমন একটু নিদ্রা গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, এবারে তুমি যাও, দরকার পড়লে ডাইকা পাঠামু।

ওঝা বলল, কর্তা, ভূত বাড়িতে পাড়া দিতে না দিতেই পালাইছে। আমার বিদায়!

—বিদায় আর কি। কি চাও তুমি?

—দুই কাঠা ধান। আর পাত পাইতা দই-চিড়া।

—তা শ্রাদ্ধের দিন আইস। খাইবা।

ওঝা চলে গেল। যাবার সময় বলল, কর্তা বাড়ি বাইন্দা দিয়া গ্যালাম। কোন ডর নাই।

সবাই শুনল কথাগুলি। লালটু পলটুর শুনে সাহস ফিরে এল। শশিভূষণ পর্যন্ত কথাটা বিশ্বাস করল। এবং বাড়িতে যে এক অদৃশ্য ভয় সবসময় ঝুলে ছিল বাতাসে, এক সামান্য ওঝা এসেই কেমন তা উড়িয়ে দিয়ে গেল।

মণীন্দ্রনাথ তখন সোনার শিয়রে বসে ছিল। সোনা বস্তুত মণীন্দ্রনাথকে শিয়রে

দেখেই কেমন সাহস পেয়ে গেল। ওর ভিতরে যে ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য, তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কারা, পুড়িয়ে মারার জন্য চিতার কাঠে তুলে দিচ্ছে, অমলা কমলা কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আগুনের ভিতর ওর সুন্দর চোখ-মুখ পুড়ে যাচ্ছে, সে কালো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পুড়ে যেতে যেতে সে একটা লেজ খসে পড়া ব্যাঙ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আত্মাটা তার সেই ব্যাঙের ভিতর আছে, সে টের পাচ্ছে সব, কষ্ট যন্ত্রণা টের পাচ্ছে, সে আর এ-পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছে না সোনা হয়ে, সে একটা অন্য জীব হয়ে গেছে—তাকে কেউ চিনতে পারছে না, সে মেলায় হারিয়ে যেমন ভেউভেউ করে ছেলেমানুষ কাঁদে তেমনি যখন কাঁদছিল তখনই সে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই ওর শিয়রে এসে বসেছেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাকে একমাত্র তিনিই চিনতে পেরেছেন। বল-ছেন যেন সোনা, তোর ভয় নেই, আমি তোর সঙ্গে যাব। সোনার সঙ্গে যদি পাগল জ্যাঠামশাই থাকে তবে আর কি ভয়। ওর চোখে নির্ভয়ে ঘুম এসে গেল।

পাগল মানুষ তারপর বের হয় এলেন। কেমন একটা অভিমান কাজ করছে। কাল রাতে কেউ তাঁকে খেতে দেয় নি। বাবা তাঁকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে অনুমতি দিলেন না। তিনি ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছেন। যেদিকে এখন দু'চোখ যায় বের হয়ে যাওয়া। তিনি ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে হাঁটতে থাকলেন।

কেন যে আজ সকালে এমন কুয়াশা হল। পাগল মানুষ গোপাটে নেমে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এটা গ্রীষ্মের দিন। তিন চার দিন মাঝে আকাশ মেঘলা গেছে। কিন্তু ঝড়জল কালবৈশাখী কিছু হয় নি। দু'দিন খাঁ খাঁ রোদ। কাল রাতে জ্যোৎস্না ছিল। আজ সকালে কুয়াশা। তিনি পথে নেমে এলে কেউ তাকে দেখতে পেল না। হাসান পীরের দরগায় তিনি আজ যাবেন। কতদিন তিনি যান নি। কতদিন তাঁর হাসান পীরের সঙ্গে দেখা হয় নি। সেই কবে এক-বার বর্ষার শেষে হাসান পীরের দরগায় তিনি গিয়েছিলেন। তর যা চক্ষু মণি, চক্ষুতে কয়, তুই পীর হইবি, না হয় পাগল বইনা যাইবি।

—আচ্ছা পীরসাহেব, আমার সেই চক্ষুতে কোন দুরাশা জেগে আছে?

—দুরাশা সবারই থাকে মণি, তরও আছে। দুরাশা না থাকলে মানুষ বাঁচে না।

—আমার কি দুরাশা?

—তর দুরাশা তুই যা পাইবি না তার জন্য ঘুইরা মরবি।

—কেন পাব না। আমার কি কসুর। সে পীরসাহেবের ভাষায় কসুর কথাটা ব্যবহার করল।

—তর কসুর তুই বড় বেশি সাদাসিধা মানুষ। সাদাসিধা মানুষের বেশি দুরাশা ভাল না।

—আমি ঠিক চলে যাব। এখানে থাকব না। ওর কাছে চলে যাব। আমাকে কেউ খেতে দেয় নি কাল পীরসাহেব। বাবা আমাকে মন্ত্রপাঠ করতে দিল না। আমার কি আর আছে। সারাদিন আপনার কাছে আজ বসে থাকব। তারপর হেঁটে হেঁটে পলিনের কাছে চলে যাব। কেউ আমার নাগাল পাবে না। ঠিক না পীরসাহেব ?

কুয়াশার ভিতর তিনি হাঁটছেন আর হাঁটছেন। দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। তিনি বড়বৌকে উদ্বিগ্ন করে তুলবেন। সে বের হয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি হবে, সে না থাকলে সবাই ফল জল খাবে না। তাকে কাল বড়বৌ খেতে দেয় নি। সে সারা-ক্ষণ আশ্বিনের কুকুরের পাশে চুপচাপ বাইরে বসেছিল আর দেখেছে সব মানুষের ভিড় দক্ষিণের ঘরে। কি হয়েছে সোনার! তাকে কেউ ডাকছে না। কেউ বলছে না, তুমি এস। সে যেন এ-বাড়ির কেউ নয়। তিনি যেন এ-বাড়িতে অপরিচিত মানুষ। না পেরে সে ভোর রাতের দিকে নিজেই উঠে গেছে সোনার কাছে। তিনি শিয়রে গিয়ে বসেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলছে, এখন মনে হয় একটু ভালোর দিকে। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ কেবল সোনার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। ওঁর কেন জানি বার বার ইচ্ছা করছিল, একেবারে সাপ্টে কোলে তুলে নিতে। বুকের পাশে জড়িয়ে নিলেই সব গ্লানি সোনার মুছে যাবে। অথবা এই যে কুয়াশা, এই কুয়াশায় সোনাকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে হেঁটে গেলে এক জলাশয় পাওয়া যাবে, এক বড় মাঠ পাওয়া যাবে, তারপর হাসান পীরের দরগা, দরগাতে গিয়ে শুইয়ে দিতে পারলেই সে নিরাময় হয়ে যাবে।

ওঁর আজকাল বড়বৌর ওপর অভিমান হলেই কোথাও গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। কোন কিছুর অভাব হলে অভিমানে খুব দূরে গিয়ে আজকাল বসে থাকেন না। ধারেকাছে থাকেন। যেন সোনা অথবা লালটু পলটু গিয়ে খুঁজে আনতে পারে। তিনি লালটু পলটু গেলে আসেন না। সোনা গেলে কখনও কখনও উঠে আসেন। আর বড়বৌ গেলে অনেকক্ষণ সাধাসাধি। এক অবোধ বালকের মতো হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর আর দূরে যেতে ইচ্ছা হয় না। কেমন

স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যাচ্ছেন। তবু আগে একটা দুর্গের ছবি, রেমপার্ট এবং বড় একটা নদী দেখতে পেতেন। মাঝে মাঝে কি যেন একটা প্রতিমার মতো মুখ ভেসে উঠেই মিলিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তিনি একটা সিলভার ওকের গাছ দেখতে পেতেন। তার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে। এখন আর তেমন ছবি কিছুই ভাসে না। ক্রমাগত এক নিষ্ঠুর যাত্রা তাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। কাল-সময় তাঁকে বড় একাকী করে রাখছে। কেবল এই বড়বৌ এবং সোনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ওঁর প্রতীক্ষা, ততক্ষণই তিনি বসে থাকেন এবং মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকান, কেউ ওঁকে খুঁজতে আসছে কিনা। আজ তিনি বেশ দূরে চলে যাচ্ছেন। দেখুক সবাই কেমন মজা। খেতে না দিয়ে সব ভুলে থাকার মজা দেখুক বড়বৌ।

ঘন কুয়াশার ভিতর পথ চিনে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তবু উত্তরের দিকে ক্রমান্বয়ে হেঁটে গেলে সেই দরগা মিলে যাবে। তিনি কুয়াশার ভিতর কেবল হেঁটে যেতে থাকলেন।

কেবল হেঁটে যেতে থাকল আরও একজন মানুষ, সে ফেলু। কুয়াশার ভিতর তাকে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না, যেন একটা বড় গজার মাছ জলের নিচে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। বিলের জল, কালো, তার নিবাসে কে এসে মজা লুটছে. সে জলের ভিতর ডুবে ডুবে শ্যাওলার অন্ধকারে তা লক্ষ্য রাখছে। সে কখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। দু'হাত অন্তর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে যে কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। সে সারারাত আকালুর বাড়ির পাশে যে জঙ্গলটা আছে সেখানে বসেছিল। যদি আকালু রাতে ফিরে আসে। যদি আকালু শেষপর্যন্ত কিছু ভুলে যায় নিতে, সে রাতে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সারারাত ফেলু মশার কামড় খেয়েছে। শরীর তার ফুলে গেছে। ওর শরীর এখন আর শরীর নেই। যেন সে এই কুয়াশার ভিতর এক অশরীরী হয়ে কেবল ছুটছে।

সকালবেলাতে বড়বৌর মনে হল কেউ রাতে ফল-জল খায় নি। সবাই সোনাকে নিয়ে এমন উদ্বিগ্ন ছিল যে, খাবার কথা কারও মনে আসে নি। এখন সোনা ঘুমোচ্ছে। খুব আলগোছে চন্দ্রনাথ তাকে পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। এবং শুইয়ে দিচ্ছে। কাঁথা-বালিশ সব টেনে নেওয়া হচ্ছে পশ্চিমের ঘরে। কপালে হাত দিয়ে দেখল বড়বৌ। মনে হল ওর জ্বরটাও কমে এসেছে। সে পুবের ঘরে গিয়ে দেখল, তেমনি পড়ে আছে সব। কুকুরটা দাওয়ায় শুয়ে আছে। তার মানুষ কোথাও নেই। তাঁকে ওর রাতে খেতে দেওয়া উচিত ছিল। ওর যে এমন মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথের মুখচোখ এত বেশি উদ্বিগ্ন ছিল যে, খাবার কথা বড়বৌ বলতে সাহস পায় নি। ওরা খেতে আসছে না, ওর মানুষ একা-একা বসে খাবে, ওর কেমন স্বার্থপরতার কথা মনে হয়েছিল। একসঙ্গেই খাবে। সোনা হয়তো কিছুক্ষণের ভিতরই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এই আশায়-আশায় সবাই রাত ভোর করে দিয়েছিল।

পাগল মানুষই নেই। কুয়াশা ঘন বলে কোথায় আছে মানুষটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। খুব দূরে যখন আজকাল যান না, তখন হয়তো অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে বসে রয়েছেন। তার অনেক কাজ। সে সকাল-সকাল ঘরে ঢুকে সব ফলমূল বের করে দিল। আর একটু বেলা হলে সেই ফলমূল ছেলেদের ভাগ করে দেবে। মনটা কেন যে খচখচ করছে বড়বৌ বুঝতে পারছে না। ভীষণ একটা হাহাকার বাজছে। প্রথম মনে হয়েছিল, শ্বশুরমশাই মারা গেছেন, এতদিন সে মানুষটাকে সেবা-শুশ্রূষা করেছে, হয়তো এজন্য এমন হবে। কিন্তু পরে মনে হল, এত গভীরে সেই হাহাকার বাজবে কেন। কেমন শূন্য-শূন্য মনে হচ্ছে সব। তিনি কতদিন কাছে থাকেন না, দশ-বার দিন ক্রমান্বয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ান, বাড়ি ফিরে এলেই নাপিতবাড়ির হরকুমারকে ডেকে দাড়ি কামানোর ব্যবস্থা করা হয়, প্রতিদিন হরকুমার আসে না, দু'দিন অন্তর-অন্তর তার এ-বাড়ি ঘুরে যাবার কথা, সে না এলে এক মুখ দাড়ি নিয়ে মানুষটা থাকবে বলে বড়বৌর খারাপ লাগে। গতকাল সে বারবার করে বলেছে, তুমি এ ক'দিন কোথাও যেও না। এ-সময় কোথাও যেতে হয় না।

তবু যে মানুষটা কোথায় গেল! সে পলটুকে ডেকে তুলল, এই, ওঠতো। যা দেখ উনি আবার কোথায় গেলেন।

মার এতটা উদ্বিগ্ন ভাব পলটুর, ভাল লাগল না। সে পাশ ফিরে শুল।

—কত বেলা ঘুমাবি। যা না বাবা। দেখ, উনি কোথায় গেলেন। ধরে নিয়ে আয়।

পলটু চোখ বুজে ছিল। মার এই বার বার ডাকা ওর ভাল লাগছিল না। ঠাকুরদা মারা গেছেন বলে এ ক'দিন ওদের পড়া থেকে ছুটি। সে খুব ঘুমাবে এ কদিন। অন্য সময় সকাল হলেই দরজায় শব্দ, পলটু ওঠ। বেলা হয়ে গেছে, গোপাটে যাবি। মাস্টারমশাইর জন্য ওরা ঘুম থেকে কিছুতেই বেলা করে উঠতে পারে না। ওর মনে হয় তখন, মাস্টারমশাই রাতে ঘুমান না। কেবল জেগে থাকেন। যদি ভোর হয়ে যায়, বেলা হয়ে যায় তবে তিনি ওদের নিয়ে গোপাটে যেতে পারবেন না, মটকিলার ডাল ভেঙে দিতে পারবেন না, দাঁড়িয়ে সব প্রাতঃকৃত্যাদির কাজ, যেন তাঁর শুধু ওদের পড়ানোই কাজ নয়, ওদের স্বাস্থ্যবিধি সব লক্ষ্য রাখা তাঁর কাজ। পলটুর মনে হয় তখন, কে যে তাঁকে এ-সব দায়িত্ব দিল, কেন যে তিনি সারা রাত না ঘুমিয়ে ওদের ডেকে তোলার জন্য বসে থাকেন! সে মাস্টারমশাইর ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সব সময়। ওর কিছুতেই পড়া মুখস্থ হয় না। সে বারবার পড়েও পড়া মনে রাখতে পারে না। মাস্টারমশাই তাকে খুব মারেন। লালটুকে খুব একটা মারতে পারেন না। একদিন খুব মেরে ছিলেন মাস্টারমশাই।—পড়াশুনা না করলে বড় হয়ে করবি কি? খাবি কি!

লালটু একটু বেয়াড়া ধরনের, জেদি, একগুঁয়ে। সে মার খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে বলেছিল, আমি তরকারি বেইচা খামু।

সেই থেকে শশিভূষণ যেন লালটুকে আর তেমন মারে না। বরং সে যেন কেমন একটু ওকে ভয় পেতে শুরু করেছে। পলটু শুয়ে শুয়ে ভাবল, তাকে মারলে সেও একদিন এমন বলে দেবে। কিন্তু সে দেখেছে, পারে না। খুব রেগে গেলে মাস্টারমশাই মারেন। তারপর আবার কেমন চুপচাপ, মাথা ঠাণ্ডা হলে কেমন দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রাখেন। বলেন, তোরা বড় হলে এই দেশ বড় হবে। অর্থাৎ যেন এই শশিভূষণের বলার ইচ্ছা, দেশ মানেই হচ্ছে দেশের মানুষ। তাদের প্রকাশই হচ্ছে দেশের প্রকাশ। স্কুলে পলটু দেখেছে সারাটা সময় মাস্টারমশাই কি ব্যস্ত থাকেন। কোথায় কি হবে, তিনি

নানারকম ফুলের গাছ এনে স্কুলের মাঠে লাগিয়েছেন। নানারকম খেলার ব্যবস্থা করেছেন। সবার ছুটি হয়ে গেলেও তাঁর ছুটি হয় না। ওরা তখন স্কুলের মাঠে মাস্টারমশাইর জন্য বসে থাকে।

বড়বৌ আবার ডাকল, কি রে, তুই উঠবি না!

সে বলল, না। আমার ভাল লাগে না।

—দেখ বাবা, উনি এই সকালে কোথায় আবার বের হয়ে গেলেন। একটু উঠে গিয়ে দেখ।

—তুমি ছাখ। আমি উঠতে পারমু না।

বড়বৌ ছেলের মাথার কাছে বসল।—সোনার শরীর ভাল না। কত কাজ আমার। তোরা এখন বড় হয়েছিস। ওকে যদি দেখে না রাখিস তবে কে দেখবে।

পলটুর ভারি বিরক্ত লাগছিল। সে সাধারণত মায়ের সঙ্গে আগে শুত না। এই সেদিন থেকে মায়ের পাশে শুচ্ছে। সে শুত ছোট কাকার সঙ্গে। কিন্তু এই দেশে কি যে হল! রাতে নানারকম অত্যাচার এবং অবিচারের ছবি ভেসে উঠলে মা ভয় পান! সারারাত কোন কোন দিন ওদের জেগে থাকতে হয়েছে। বর্ষাকালটাই ভীষণ মনে হয়েছিল। শীতকালটা ভালই গেছে। কোথায় কোন অঞ্চলে আবার দাঙ্গা বেঁধে গেছে। এই গ্রীষ্মে আবার নানা রকমের খবর। এসব কারণেই পলটু মায়ের সঙ্গে থাকছে। মার এমন কথায় সে বলে ফেলল, আর তোমার লগে শুমু না। ছোট কাকার লগে শুমু।

বড়বৌ ভারি কষ্ট পেল ওর কথায়। পলটু খুব একটা জেদি ছেলে নয়। তবু কেমন যেন সে তার বাপ সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা পুষে রেখেছে। সে যেন বুঝতে পারে, সে তার মা এবং বাপ এই পরিবারের গলগ্রহ। এবং তার বাবা কত বড় কাজ করত। সে এবং মা। কত সুন্দর সে একটা ছবি দেখতে পায় মাঝে মাঝে। বড় শহরে তার মা তার হাত ধরে কোন একটা বড় রেল-স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার পরনে প্যান্ট-কোট। বাবা চকচকে জুতো পরেছেন। মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। ওর বাবা সাহেব বনে যেতে পারত। যেমন সে দেখেছে মুড়াপাড়ায় সেই মানুষ, মেজবাবু, যাকে সে দেখেছে প্যান্ট-কোট পরলে অন্য মানুষ হয়ে যায়। সারা পরিবারে যতই মেজবাবুর সম্পর্কে নিন্দা হোক, ভিতরে ভিতরে মেজবাবুকে সবাই কেমন সমীহ করত।

পলটুর ভারি খারাপ লাগে ভাবতে, তার বাবা পাগল। সেজন্য যখনই

কোথাও ওর বাবার কথা ওঠে, সে সেখানে থাকে না। কারণ ভিতরে ভিতরে ওর এই এক কষ্ট। এবং সেইজন্যই বুঝি কোন পড়া মনে রাখতে পারে না। কেমন এক হীনমন্যতায় সে সব সময় ভোগে। কোনদিন বড়বৌ ওকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারে না। তখন যদি ধন এসে বলত, পলটু ওঠ, তোর বাবাকে খুঁজে নিয়ে আয়, পলটু এক লাফে উঠে পড়ত। এবং সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হত।

বড়বৌর এসব জেনেও পলটুকে কেন জানি বার বার বলতে ইচ্ছা হয়, তুই তোর বাবাকে দেখে না রাখলে কে রাখবে। তোর বাবার জন্য কষ্ট হয় না পলটু? তুই আমার একমাত্র ছেলে। তুই আমার দুঃখ বুঝবি না!

মার এমন চোখ-মুখ পলটু সহ্য করতে পারে না। সে ভয়ে তাকাচ্ছে না। যত কষ্ট মার এই চোখে-মুখে। কেমন দুঃখী মুখ নিয়ে মা মাঝে-মাঝে তার শিয়রে বসে থাকে। তখন সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। বাবাকে সে খুঁজতে বের হয়। কাউকে সে কিছু বলে না। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুর, তুমি এই জঙ্গলে অথবা মাঠে, সে বলে, এমনি। সে যে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে কিছুতেই কাউকে বলবে না। বরং সে নিজে, যত জায়গা আছে, যেখানে যেখানে তিনি বসে থাকতে পারেন, সব জায়গায় ভীষণ ছুটোছুটি করেও যখন খুঁজে পায় না, তখন এক অসহ্য অভিমানে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে কাঁদে। যেন তার বলার ইচ্ছা, বাবা, তুমি এটা বোঝ না কেন, তোমার জন্য আমার মা চোখ-মুখ বুজে সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে। তুমি ভাল হলে আমাদের কোন দুঃখ থাকত না।

আর সোনা যদি খুঁজতে বের হয় তার পাগল জ্যাঠামশাইকে তখন সে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে, কই গ্যাছে ছাখছেন? আমার জ্যাঠামশাইরে ছাখেন নাই? সকাল থাইকা বাড়ি নাই।

—না রে, ভাই ছাখি নাই।

সোনা লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। বাড়ি-বাড়ি সে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়। কখনও-কখনও কেউ খবর দেয় তিনি বসে আছেন ট্যাবার পুকুরপাড়ে। তখন সোনা এমন ছুটতে থাকে রোদ মাথায় করে যে কে বলবে এই ছেলে সোনা। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলে, কোথায় যে এখন যাচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না। কেবল জানে সে যেখানেই যাক, যাচ্ছে পাগল মানুষকে খুঁজে আনতে।

আর যদি পলটু খুঁজতে বের হয় মনে হবে, সে বাড়ি থেকে না বলে না

কয়ে বের হয়ে এসেছে। একা একা বনে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন উদ্দেশ্য নেই। কেবল কাজে ফাঁকি দেবার জন্য, অথবা পড়াশোনা না করার জন্য সে বাড়ি বাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। কেবল একজন মানুষ বুঝতে পারে পলটু যাচ্ছে তার বাবাকে খুঁজতে, সে কিছু বলে না, কেবল খুঁজে বেড়ায়। সে হচ্ছে ঈশম। সে তখন বলবে, কর্তা, না জিগাইলে পাইবেন কি কইরা?

—কারে জিগামু?

—যারে সামনে পাইবেন তারেই।

পলটু তখন কোন কথা বলে না। সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে টের পেলেই সে যেন সকলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। পলটুর মুখ দেখলেই তখন টের পাওয়া যায় বাবার জন্য সেও কম দুঃখী নয়। সে কোন কথা না বলে কেবল হাঁটে। এই মাঠে-ঘাটে সে চুপচাপ বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় তার বাবা ভাল হয়ে গেছেন। তিনি বারদির স্টিমারঘাটে এসে নেমেছেন। কত লটবহর। মার জন্য ট্রাঙ্ক ভর্তি শাড়ি এনেছেন। ধনকাকীমার জন্য সুন্দর ছাপাশাড়ি, সোনা লালটুর দামি প্যাণ্ট জুতো এবং সঙ্গে দু'জন দারোয়ান, ওরা পলটুকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাহেবের ছেলে, ওরা ওকে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। অথবা ওর মনে হয় এক রাতে জেগে গেলে সে দেখতে পাবে বাবা বলছেন, আমি কলকাতায় যাচ্ছি চাকরি করতে। তোমরা ভাল হয়ে থেকো। সে ঈশমদা, সোনা, লালটু সবাই মিলে বাবাকে নদীর চর পার করে দিয়ে আসবে। বাবাকে স্টিমারঘাটে তুলে দিয়ে আসবে। বাবা রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানাবেন। স্টিমারটা মাঝগাঙে ভেসে গেলে, বাবাকে যখন আর সে দেখতে পাবে না, তখন সকলের অলক্ষ্যে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে।

মার চোখ-মুখ দেখে পলটু কেমন বিরক্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। বড়বৌ এখন আর কাউকে বলতে পারে না, বিশেষ করে শচীন্দ্রনাথ অথবা চন্দ্রনাথকে, একবার দেখুন তো মানুষটা এত সাতসকালে যে কোথায় গেল! বরং নিজেরই একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। কে তার জন্য এত করবে। পলটু বড় হয়েছে। লালটু বড় হয়েছে। সে এখন ওদের পিছু-পিছু ঘোরে। লালটু জেঠিমার এই দুর্বলতা বোঝে। মাঝে মাঝে সে পরিবর্তে নারকেলের নাড়ু চায়। তিলের নাড়ু, তক্তি এসব চায়। সে কাজের পরিবর্তে এসব না পেলে জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে চায় না। সোনাকে সব সময় পাঠানো যায় না। সে

ওদের মতো বড় হয় নি। একবার পাঠালে কিছুতেই আর আবিষ্কার না করে ফিরবে না। একবার সারাদিন ঘুরে ওর চোখ-মুখ বসে গিয়েছিল। দুপুরে খোঁজ পড়লে ভয়ে ভয়ে বড়বৌ বলতে পর্যন্ত পারে নি সে তাকে পাঠিয়েছে পাগল মানুষটাকে খুঁজতে। বিকাল হয়ে গেছিল সোনার ফিরতে। তার কি ভয়! ফিরে এলে চুপি চুপি বলেছিল, তুই কিন্তু বলিস না সোনা তোর জ্যাঠা-মশাইকে খুঁজতে গিয়েছিলি।

সে বলেছিল, বলব না জেঠিমা।

আর সোনা কেন জানি সেই দিন থেকেই দুটো-একটা মিথ্যা কথা বললে কিছু হয় না এমন ভেবেছিল। বাবা বলেছে তাকে, বিদ্যাসাগরমশাইর মতো হতে হবে। সদা সত্য কথা বলিবে। ওর কেন জানি মনে হয় বিদ্যাসাগরমশাই সারা জীবন সত্য কথা বলেন নি। কেউ সারা জীবন সত্য কথা বলে না। ঠাকুরদা সারাজীবন সত্য কথা বলেছিলেন এও তার বিশ্বাস হয় না। সে তো নিজে অনেক কিছুই গোপন করেছে মায়ের কাছে। সে তো কত কিছু শিখে ফেলেছে! মা তার মুখ দেখে কি করে টের পাবেন, মাঝে মাঝে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। অমলা কমলাকে স্বপ্নে দেখলে ঘুম ভেঙে যায়, শরীরে কেমন যেন একটা কষ্ট হয় তখন। সেকথা মাকে সে বলতে পারে নি। বিদ্যাসাগর-মশায় তাঁর মাকে অনেক কিছু বলতে পারেন নি। এসব কথা মাকে তো আর বলা যায় না, মায়ের কাছে এসব গোপন রাখতে হয়। তিনিও গোপন রেখেছিলেন। কেউ সারা জীবন মিথ্যা কথা না বলে থাকতে পারে না। সেও পারবে না। জেঠিমার জন্য মিথ্যা কথা বলে কোন অনুশোচনা তার হয় নি। বরং একটা কাজের মতো সে কাজ করেছে। মা আজকাল বড় জেঠিমাকে কেন যে অযথা এই নিয়ে হেনস্থা করে। তাকে পাঠালেই মা রাগ করে।

যেন এটা নিয়ম হয়ে গেছে সংসারে, কেউ তো আর বসে নেই। একজন পাগল মানুষের সঙ্গে সবসময় কে আর ঘুরে বেড়ায়। সোনা এসব বোঝে বলেই সে যখন যায় চুপি চুপি বের হয়ে যায়। এমন কি কোন কোন দিন সে জেঠিমাকেও বলে যায় না। সে ফিরে এলে নানারকমের প্রশ্ন করে মা। কোন জবাব না দিলে ছোটকাকাকে বলে মার খাওয়ায়। সে তখন জেঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

বড়বৌ তখন বলল, দ্যাখ, তোর ঠাকুরদার শ্মশানে বসে আছে কিনা!

পলটু ঘুরে এসে বলল, মা অর্জুন গাছের নিচে নাই।

বড়বৌর ছেলের এমন কথায় কান্না আসছিল। গাছের নিচে নেই, না থাক, অন্য কোথাও হাঁটছেন তিনি। মাঠে নেমে খোঁজ করলেই হবে। কিন্তু পলটুর ভিতরে যে কি রাগ বাপের ওপর সে বোঝে না। কিছুতেই সে বলল না, মা, বাবা অর্জুন গাছের নিচে নেই। বলল শুধু নেই। তোর অভিমানের এত কি আছে! আমি সারাজীবন এমন একজন মানুষকে নিয়ে ঘর করলাম, আমার কোন নালিশ নেই আর যত নালিশ তোদের। তুই এত স্বার্থপর পলটু!

—তবে দেখ টোডারবাগের বট গাছটার নিচে বসে আছে কিনা?

সে আবার বের হল। আজ পড়তে হবে না। সে, ভেবেছিল ঘুম থেকে বেলায় উঠবে। বেলায় উঠে ঠাকুরদার শ্মশানের চারপাশটা সাফ করবে। সেখানে ধনকাকা বলেছে একটা তুলসীগাছ লাগাবে। সে এবং বাড়ির আর যারা আছে তাদের নিয়ে একটা বড় তুলসীমঞ্চ করবে। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় আলো দেবার কথা। এখন এমন একটা কাজ ফেলে তাকে যেতে হচ্ছে টোডারবাগের বটগাছটার নিচে। সে বলল, এবারই শেষ। আমি আর যেতে পারব না।

কুয়াশা তখন কেটে যাচ্ছিল। ক্রমে হাল্কা রোদ উঠেছে। বড়বৌ ঘাটে স্নান করার সময় দেখল পলটু ফিরে আসছে। সে এসে বলল, না নাই।

বড়বৌর ভিতরটা আবার হাহাকার করতে থাকল। সে কিছুতেই যেন স্থির থাকতে পারছে না। বুকের ভিতরটা এমন কেন করছে সে বুঝতে পারছে না।

স্নান সেরে এসে বড়বৌ একটা লালপেড়ে শাড়ি পরল। চুল ভিজা। কপালে এ ক'দিন সিঁদুর দিতে নেই বলে আর আয়নার সামনে দাঁড়াল না। তা'ছাড়া অশৌচের সময় আয়নায় মুখ দেখতে নেই। সে, বড়বৌ বলে, তাকে হবিষ্যান্নের আয়োজন করতে হবে। এত করে মানুষটাকে বলেও সে ঘরে রাখতে পারল না। বাসি ফলমূল যা বের করে দিয়েছিল, তা সবাইকে ডেকে ভাগ-ভাগ করে দিয়ে দিল। ঘরের এক কোণায় তিনটে কচার ডাল পুঁতে রাখল। কাজগুলো যত সে নিবিষ্ট মনে করবে ভাবছে, তা পারছে না। ভিতরটা কেবল তার ছটফট করছে। এবং মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা খালি করে শ্বাস নিচ্ছে। মনে হচ্ছিল তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন যে কেন হচ্ছে! সে একবার ঘরের বাইরে এল, দেখল শশিভূষণ লালটু পলটুকে নিয়ে

পুকুরপাড়ে যাচ্ছে। এবং এই ফাঁকে সে একবার ধনবৌর ঘরে ঢুকে কপালে হাত রাখল সোনার। মনে হয় জরটা কমে গেছে। কপালে হাত রাখতেই সোনা চোখ মেলে তাকাল। তারপর তাকিয়ে দেখল, ওর শিয়রে জেঠিমা দাঁড়িয়ে আছেন। জেঠিমার এমন চোখ দেখলেই সোনা টের পায় জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই।

সে বলল, আমি ভাল হয়ে নিয়ে আসব।

বড়বৌ বলল, তুই এখন ঘুমো। ও ঠিক চলে আসবে। বড়বৌ জানে তিনি চলেও আসতে পারেন। প্রায় সময় তো নিজেই ফিরে আসেন। কোন কোন দিন ফিরে না এলেই কষ্ট হয়। আগের চেয়ে তিনি ভাল হয়ে গেছেন। প্রায় তিন সালের ওপর তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথাও দু'দিনের বেশি থাকেন না। যদি কেউ সেদিন খুঁজে না পায় পরদিন সকালে অথবা দুপুরে তিনি ফিরে আসেন। খুব ক্ষুধা লাগলে আখের দিনে আখ, আনারসের দিনে আনারস মাঠ থেকে তুলে খান। সুতরাং মানুষটাকে কেউ ডেকে না আনলেও যখন ফিরে আসে, তখন ব্যস্ততার কি আছে এমনভাবে সংসারের অন্য সবাই। কেবল বড়বৌ জানে যত তার বয়স বাড়ছে, তত এই মানুষের জন্য তার মায়া বেড়ে যাচ্ছে। সে কিছুতেই আজকাল আর দু'দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁকে।

কি যে ভুল হয়ে গেল! লজ্জার মাথা খেয়ে কেন যে সে এল না, তাকে খেতে দিল না! এখন তো সংসারের সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে, যারা আত্মীয়-স্বজন এসেছে, তারা দু'একবার জিজ্ঞাসা করেছে পাগল মানুষ সম্পর্কে, তাদের কোন মায়া-মমতা নেই। এত লোক বাড়িতে অথচ কেউ একবার মুখ ফুটে বলছে না, যাচ্ছি আমি খুঁজে আনতে।

বড়বৌ বলল, কি খাবি সোনা!

—মা বার্লি করতে গেছে।

—তা হলে বার্লি খা।

—ভাল লাগে না জেঠিমা।

—একটা কমলালেবু দেব। পেট ভরে বার্লি খেলে একটা কমলা পাবি।

—সত্যি!

—সত্যি। তুই যা দেখালি কাল! বলতেই সোনা কেমন আবার মুখ কালো করে ফেলল। সে তার দুঃস্বপ্নের ভিতর দেখেছে সেই অশরীরী যেন

কার পেছনে কেবল ছুটছে। সে বলল, জেঠিমা, জ্যাঠামশায়কে কেউ খুঁজতে যায় নাই ?

—পলটু গিয়েছিল। পায় নি।

—জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছে কেউ দেখে নাই ?

—না। খুব কুয়াশা ছিল, কেউ লক্ষ্য করে নি।

সোনার মনে হল ওর তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাওয়া উচিত। সে কেমন ভীত চোখ নিয়ে তাকাল। বলল, আমি কবে ভাত খামু জেঠিমা ?

—জ্বর ছাড়লেই ভাত দেবে।

—এখন কত জ্বর হবে! বলে সে মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে জেঠিমার দিকে তাকাল।

—দাঁড়া দেখছি। বড়বৌ থারমোমিটার বের করল, ঝেড়ে নামালো তারপর বগলের ভিতর দিয়ে সোনার পাশে চুপচাপ বসে থাকল।

সোনা বলল, জেঠিমা, আমি কাল ভাত খাব ?

—না। কাল তোমাকে ভাত দেওয়া হবে না। যদি আজ জ্বর না থাকে, তবে পরশু ভাত পাবে।

—আমার তো কিছু হয় নি। ভয় পেয়ে গেছিলাম।

—কেন এমন ভয় পেলি !

—জানি না। কি যে হল, কি যে দ্যাখলাম শ্মশানে।

—এ-সব মিথ্যা।

—কি !

—এই যে কাল তুই দেখলি।

—না জেঠিমা সত্যি।

—চোখের ভুল।

—মাস্টারমশায় পর্যন্ত দেখল।

—চোখের ভুল।

—একসঙ্গে দু'জনের চোখের ভুল কি করে হবে ?

—হয় বাবা। হয়। দেখি। বলে থারমোমিটার বের করে চোখের ওপর তুলে ধরল। জ্বর এখনও বেশ আছে।

সোনা বলল, কত ?

জ্বর বেশ আছে বললে, সোনার মন খারাপ হবে। বড়বৌ এই ভেবে

বলল, বেশি নেই। খুব অল্প। মনে হয় বিকেলের দিকে জ্বর রিমিশান হবে।

সোনা জ্বর আছে জেনেই উঠে বসল। দেখি কত জ্বর।

বড়বৌ ততক্ষণে থারমোমিটার ঝাঁকাতে শুরু করেছে। সে বলল, এই দেখ।

—আটানব্বই তিন পয়েন্ট। সোনা থারমোমিটার দেখতে দেখতে বলল।

আরও বেশি জ্বর। কিন্তু সোনা তার সঠিক জ্বর দেখতে পেল না। ওর কেমন এখন ভাল লাগছে। কেবল মাথাটা একটু ভারি। সে বলল, আমি আর শোব না। বারান্দায় বসব।

বড়বৌ বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার পেতে দিল। ঘরের ভিতর শুয়ে থাকলে কিছু ভাল লাগে না। ঘরের চারপাশে কত আলো, কত রকমের পাখি। সে একা একা শুয়ে থাকলে সব পাখির ডাক আলাদা আলাদা চিনতে পারে। গাছের কোন ডালে অথবা পাতার আড়ালে এবং কত দূরে সব ঘুঘু পাখির ডাক অথবা ডাহুক পাখিরা যে পুকুরের জলে এখন কীটপতঙ্গ খেতে খেতে ডাকছে সে এই বিছানায় শুয়ে থাকলেও তা ধরতে পারে। তার কেবল মনে হচ্ছিল বাইরের পৃথিবীতে অনন্ত সুখ। তাকে এই বেলা পর্যন্ত জোর করে ঘরের ভিতর আটকে রাখা হয়েছে।

ধনবৌ বারান্দায় এলে বলল, মা আমার জ্বর নাই। জ্বর আমার আটানব্বই তিন পয়েন্ট। জেঠিমা থারমোমিটারে দ্যাখছে।

ধনবৌকে বড়বৌ ইশারায় কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সোনার পায়ে রোদ নেই। টিনের চালে রোদ। সে আজ ভাত খেতে পাবে না। জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই। বাবা, মেজ জ্যাঠামশাই দক্ষিণের ঘরে কিসের ফর্দ তৈরি করছে। ছোটকাকা ঈশমকে পাঠিয়েছে বড় ঘোষকে ডেকে আনতে। দাদা বড়দা ঠাকুরদার শ্মশানের চারপাশটায় যত আগাছা আছে কেটে ফেলেছে। সে এই বারান্দায় বসে সব খবরই পাচ্ছে, সে কেবল এমন দিনে উপবাসী এবং কিছু খেতে পাবে না। সে হাতে একটা হলুদ রঙের কমলা নিয়ে বসে রয়েছে। ছোট বোনটা তার বারান্দায় ফ্রক গায়ে ঘুরছে ফিরছে। দাদার অসুখ এই ছোট্ট মেয়ে কি করে বুঝবে। সে একবার দাদাকে খামচে দিয়ে গেছে। এবং কমলা কেড়ে নিয়ে ছুটছে রান্নাঘরে।

তখন পাগল মানুষ ছুটছেন হাসান পীরের দরগায়।

তখনও ফেলু শেখ হাঁটছে।

ক্রমান্বয় এই হাঁটা। কে কোথায় যায়, কি যে করণীয় এই ধরণীতে যেন জানা নেই। আক্রোশের বশে হাঁটা। কার বিবি এখন কার ঘরে। কার মানুষ এখন কার মাটিতে। ধরণীতে ফুল ফল ফোটে। মানুষের আহার নিমিত্ত বাঁচা। এই বাঁচার জন্য সংগ্রাম। দান দয়াশীল, ধর্ম বড় বেমাফিক কথাবার্তা। সব নিজের জন্য নিজে করে যাচ্ছ মিঞা। তা মিঞা তুমি একখানা মানুষ বটে। তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ, তবু মিঞা তোমার বাছুরটার নিমিত্ত প্রাণে কষ্ট। কারণ কি। কারণ ধর্ম! কারণ ইজ্জত। তা কি যথার্থই এরে কোরবানি দিয়া আল্লার বেহেস্তে একটু জায়গা করে নিতে চাও!

আর জ্যোৎস্না রাতে এত অন্ধকার কেন! চারপাশে মৃত্যুর বিভীষিকা। আকাশে এক প্রবল প্রতাপান্বিত মোষের মতো, কালো মেঘ গর্জাচ্ছে। বিদ্যুতের শিখা আকাশকে মাঝে মাঝে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। কড়কড় করে কোথাও বজ্রপাত হল। পাগল মানুষ টের পাচ্ছেন না মৃত্যু তাঁর পিছনে এসে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তিনি পলাশ গাছের নিচে বসে নিভৃতে তখনও কীটসের কবিতা আবৃত্তি করছেন।

বিদ্যুতের আলোয় ওঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল। বড় সরল এবং অমায়িক মুখ। সারাদিন কিছু খান নি। গতকাল রাতে হবিষ্যান্ন করার কথা, তা পর্যন্ত করেন নি। চোখমুখে শুকনো একটা ভাব! ম্লান জ্যোৎস্না ছিল প্রথম রাতের দিকে। তিনি, ওরা কেউ আসবে খুঁজতে, এই আশায় বসে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখন জেগে গেছেন। কেউ আসে নি। ঈশান কোণে সেই কালো কঠিন মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কোথাও আর বিন্দুমাত্র আলো নেই। আকাশে কোন নক্ষত্র জ্বলছে না। বিদ্যুৎ চমকালেই ওর মুখ দেখা যাচ্ছে। বিষণ্ণ মুখ। কবিতার ভিতর কি যে এক জাদু অথবা বলা যেতে পারে মায়া আছে, যার আবৃত্তিতে সব গভীর দুঃখ ভিতর থেকে মুছে যায়—আহা, এমন, সুন্দর সাবলীল এবং ভরাট সৌন্দর্য নিশীথে দেখা যায় না। প্রায় দেবদূতের শামিল তিনি পলাশ গাছের নিচে কুশাসনের ওপর দু'পা ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। আকাশের ঘনঘটা দেখে সামান্য হাসছেন। ধরণীর এত উত্তাপ, ক্রমে অঝোরে বৃষ্টিপাত ঘটলে কমে যাবে। তখন ফেলু দেখে ফেলেছে তাঁকে। এমন একটা সময়ে এত হাতের কাছে সেই জীব চলে আসবে ফেলু কল্পনাই করতে পারে নি। ফেলুর নিষ্ঠুর মুখ দেখলে আত্মা উবে যাবে। চোখ-মুখ ওর দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে এত বেশি গাছপালা এবং অন্ধকার যে তাকে দেখা যাচ্ছে না। কেবল দেখা

যাচ্ছে একই জায়গায় সরল বৃক্ষের মতো মৃত কাঠে কিছু জোনাকি জ্বলছে নিভছে। সচল জোনাকির একটা মৃত কাঠ মনে হয় ফেলুকে। এখন অন্ধকারে সে ঘোরাফেরা করছে। সে এসেছিল এখানে আকালুর খোঁজে। আকালু কোন ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে, অথবা ওর তো অনেক লোক হাতে। লোকলজ্জার ভয়ে সে এখানে আছে, খাবার দিয়ে যায় কেউ। ফেলু এসেই এমন একজন মানুষকে গাছের নিচে বসে আছে দেখতে পাবে—ভাবতে পারে নি। তার এখানে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেছে। কারণ সে নানা বর্ণের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছিল শরীরে। সে গ্রামে গ্রামে যত গরীব দুঃখীজন আছে তাদের বলে এসেছে, আমাদের কেউ নাই। আপনেরা সাক্ষী থাকলেন, আকালু আমার বিবিরে নিয়া ভাগছে। আমি খোঁজ পাইলে অর মুণ্ডু ছিড়া ফালামু।

তার যে কোন কসুর থাকবে না, সে দুঃখী ফেলু, সে এ-বাদে আর কিছু জানে না, কবরের সময় তার সব দুঃখটার কথা ভেবে যেন সে ইবলিশ কি মানুষ এটা ঠিক করা হয়। কেয়ামতের দিনে অন্তত দুঃখীজনেরা যেন আল্লার কাছে সাক্ষী থাকে—সে ইবলিশ ছিল না, সে মানুষ ছিল। সে তার বিবিকে খুব ভালবাসত। অভাবে অনটনে বিবিকে সে ভাত দিতে না পারলে কষ্ট পেত। বিবি তার জানের মতো। সেই জান নিয়ে আকালু পালিয়েছে।

সে এখানে এসে ভেবেছিল আকালুকে পাবে। পাবার কথা নয়, কেন আকালু আসবে বনেবাদাড়ে। সে তো সোজা স্টিমারে উঠে চলে গেছে। তার এখন ময়ফেল শহরে। সে কিছুদিন রমনার মাঠে বিবিকে বোরখা পরিয়ে ঘুরাবে। শহর দেখাবে। সদর-ঘাটের কামান দেখাবে। সে কেন মরতে আসবে হাসান পীরের দরগায়। কিন্তু হলে হবে কি, ফেলুর এত দূরে যাবার পয়সা নাই। সে শহরে যাবার আগে সব গ্রাম-গঞ্জ খুঁজে যাবে। হাসান পীরের দরগা খুঁজে যাবে। যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে সে যাবে।

তার কারণ এখন ফেলু আর ফেলু নেই। মাথায় তার গণ্ডগোল। কেবল মনে হয় তার, বিবি আর আকালু বনেবাদাড়ে ঘুরে মরছে। বিবি তার আস্ত একটা মুরগী বনে গেছে। আকালু ঝুঁটিয়ালা মোরগ। বনের এক প্রান্ত থেকে মুরগী ডেকে উঠছে, অন্য প্রান্তে মোরগ ডাকছে কক্কর অ কো। মাঝখানে বুঝি বসে আছে এই পাগল মানুষ। পাগল মানুষ ফেলুর কাছে এখন আর একটা মোরগা হয়ে গেছে।

পলাশ গাছের অন্ধকারে বোঝাই যাচ্ছে না। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসছে। মাথার রক্ত না নামলে যা হয়—ফেলুর হাত-পা কাঁপছে। উত্তেজনায় উন্মত্ত ফেলু কি যে করতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না।

পাগল মানুষ দেখলেন অন্ধকারে একটা ইস্পাতের ফলা ভেসে ভেসে এদিকে চলে আসছে। চারপাশে তার জোনাকি। অন্ধকারে কিছুই চেনা যাচ্ছে না। সব কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে তার কাছে। তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য এসব হচ্ছে। তিনি ভয় পাবেন কেন। তিনি আর সেদিনের মতো ভয় পাবেন না। কাটা মুণ্ডু সুতোয় ঝুলিয়ে রেখেছিল ঈশ্বর। তাকে ভয় দেখাবার জন্য তিনি এসব করেছিলেন। ঈশ্বরের কাণ্ডকারখানা বোঝা দুষ্কর। বড় গোঁজামিলের ব্যাপার তিনি সেজন্য মনে মনে হাসলেন। তারপর চোখ বুজে ফের কবিতা আবৃত্তিতে মন দিলেন।

ইস্পাতের ফলাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তো আসছেই।

একটা ব্যাঙ তখন গর্ত থেকে ক্লপ ক্লপ করে ডাকল।

একটা কাঠবিড়ালী তখন লাফিয়ে পড়ল মাথায়। কিন্তু মানুষটা বড় নিবিষ্ট কবিতা আবৃত্তিতে। তাঁর এখন কিছু খেয়াল নেই। কাঠবিড়ালীটা তাঁর গা বেয়ে ঘাসের ভিতর নেমে গেল।

বিকেলের দিকে সোনার জর আবার বেড়ে গেল। ওর ভীষণ শীত করছিল। কম্প দিয়ে জর আসছে। সে ভেবেছিল জর না এলে কাল ঠিক জেঠিমাকে ধরে দুটো ভাত খাবে। ভাত না খেলে কি যে কষ্ট! যেন সে কতদিন না খেয়ে আছে। মুখ বিস্বাদ। কেবল জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাথা ধরেছে ভীষণ। মাথা ধরার জন্য সে খুব চিৎকার করছিল। জেঠিমা এসে ওর মাথাটা কাপড়ে বেঁধে দিয়ে গেছে। খুব চাপ দিয়ে বাঁধা। বেশ তার আরাম বোধ হচ্ছে। সে এখন জানালা দিয়ে পালেদের ডুমুর গাছ দেখতে পাচ্ছে। ডুমুর গাছে সেই নীলবর্ণের পাখি। সে দেখে চোখ বুজে ফেলল। কারণ কেবল মনে হচ্ছে, এই অসুখে যদি সে মরে যায়। আর ভালো না হয়। তবে সেই নীলবর্ণের পাখিটার সঙ্গে আর একটা পাখি গিয়ে ডালে বসবে। তাকে কেউ আর দেখতে পাবে না। সে সব দেখতে পাবে—এবং দেখেও মাকে বলতে পারবে না, মা আমি গাছের ডালে বসে আছি। কারণ এমন বললেই মা তাকে ভয় পাবে। সে তো আর সোনা থাকবে না, সে মায়ের কাছে তখন একটা অশরীরী আত্মা হয়ে যাবে। এসব ভাবলেই তার কষ্টটা বাড়ে। সে যেন দেখতে পায় সে মরে গেছে মা তার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদছে। সে একটা নীলবর্ণের পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। তার শরীরটা উঠোনে ফেলে রেখেছে অথবা ঠাকুরদার পাশে আর একটা চিতা জলছে,সেই চিতায় ওরএমন নরমশরীর পুড়িয়েদেওয়া হচ্ছে।

ধনবৌ কি একটা কাজে ঘরে এলে সোনা বলল, মা জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও।

—ক্যান রে।

—আমার ভয় করে।

ধনবৌ বুঝল সোনার ভয় কাটে নি। সে দরজা বন্ধ করে দেবার সময় এমন বলল, কোন ভয় নেই। ঠাকুরদা তোমার মরে গিয়ে স্বর্গে গেছেন। সেখান থেকে কেউ কখনও ফিরে আসে না।

—আচ্ছা মা, আমি মরে গেলে ঠাকুরদার সঙ্গে আমার দেখা হবে?

ধনবৌর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। বলল, এমন বলতে নাই।

—আচ্ছা মা, তুমি কাঁদবে আমি মরে গেলে?

—জানি না।

সোনা বুঝল সে মাকে রাগিয়ে দিচ্ছে। সে বলল, মা, বড় জ্যাঠামশাই আসে নাই?

—না।

—কেউ গেছে খুঁজতে?

—না।

—ঝড় উঠবে, না মা? আকাশটা কি কালো!

—চুপচাপ শুয়ে থাক। কথা বলে না।

সোনা কাঁথার ভিতর মুখ টেনে নিল। সে সারা গায়ে কাঁথা লেপ টেনে চুপচাপ শুয়ে থাকল। মাথার কাছে জল। ঘরের চারপাশে ট্রাঙ্ক, কাঠের আলমারি। ওপরে কাঠের সিলিঙ। অন্যদিন এঘরে শুয়ে থাকলেই একটা পরিচিত গন্ধ। কিন্তু আজ সে কেমন একা পড়ে গেছে। বড় জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে ওর শিয়রে হয়তো এখন বসে থাকত। সে এমন জ্বরের ভিতরও জ্যাঠামশাইর জন্য কেমন ছটফট করছে। ভেবেছিল তার জ্বর সেরে যাবে। সে তবে খুঁজতে যেতে পারত। কিন্তু আবার কম্প দিয়ে জ্বর আসায় তার কান্না পাচ্ছিল। মা ঘরে নেই। সে তার ছোট বোনের নাম ধয়ে ডাকল, ছবি, ছবি।

ছবির সে সাড়া পেল না। মাথা থেকে কাঁথা সরিয়ে সে উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। নানা কাজে সবাই ব্যস্ত। সে দেখল হেঁটে হেঁটে হারান পালের বৌ চলে গেল। যাবার আগে উঁকি দিল দরজায়, কি গ, কর্তা, কেমন আছেন? সম্মান্দির জেঠিমা এসেছেন। তিনিও চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। ঠাকুমা ছবিকে কোলে নিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে ডাকলে শুনতে পাবে না বলে ডাকল না। কেউ তার কাছে আসছে না। ওর কষ্ট হচ্ছে। বাইরের পৃথিবী তার কাছে কি সুন্দর এখন, সে এই ঘরে চুপচাপ শুয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে, পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের কি অনন্ত সুখ, সে কেবল একা দুঃখী মানুষ এই ঘরে অসুখে কষ্ট পাচ্ছে। এবং রাতের দিকে তার কেমন শ্বাসকষ্ট হতে থাকল।

আর এক দুঃখী মানুষ তখন ফেলুর পায়ের তলায়। হাসান পীরের দরগাতে তখনও একটা শকুন আর্তনাদ করছে। মরা পলাশের ডালে কিছু শকুনের চোখ নিচের দিকে। চোখ মেলে তাকাচ্ছে। এক অতিকায় মানুষ পায়ের নিচে পড়ে আছে ফেলুর। কেমন চুপচাপ অসীম নীরবতা চারপাশে। ফেলু

মুখটা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকালে সে মাঝে মাঝে দেখতে পায়, চোখদুটো খোলা। গলা কাটা, চারপাশে রক্তপাত, এবং বৃষ্টি পড়ছে, একফোঁটা দু'ফোঁটা। কড়াৎ করে মেঘ ফেটে গেলে সে দেখতে পেল জলের প্লাবন নেমেছে এই পৃথিবীতে। পাতা থেকে জল পড়ছে। সবুজ পাতা থেকে নির্মল জল গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। ফেলু সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখতে পাচ্ছে, এক হাতে ষণ্ডের গলা সে জবাই করেছে। তার কাছে মানুষটা ঠিক হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টার মতো। সে এতটুকু মায়া বোধ করল না। সে এমন কি হাহা করে আজ হাসতেও পারল না। পায়ের নিচে ষণ্ড পড়ে আছে। গভীর রাত। এবং চারপাশে কোন লোকালয় নেই বলে, সে জানে এখানে আর কে আসে! তার ভাল লাগছিল। হাতি তার হাত ভেঙে পার পেয়ে গেল। জালসা ভেঙে দিল। কেউ কিছু বলতে পারল না। ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ পেল না—সেই এক মানুষ ভূপেন্দ্রনাথ, সবাই ভয় পায়, এখন কে তোমারে রক্ষা করে! বলে সে পা দিয়ে মুখটা মাড়িয়ে দিল। শক্ত হয়ে গেছে। ঘাড়টা শক্ত। মুখ হাঁ করা। কত অনায়াসে সে পিছন থেকে গলাতে নিমেষে পোঁচ মেরে দিয়েছিল। ঠিক হালার জবাই করা য্যান একটা মুরগী। টেরও পেল না মানুষটা, পিছনে তার দুশমন। চোখের পলকে গলা হ্যাৎ করে দিল। দিল কি দিল না, সে চাকুটা কত অনায়াসে টেনে দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়েছিল। অন্ধকার এত তীব্র, এত ঘন যে সে দেখতে পেল না ঠাকুরের মুখটা ব্যথায় কতটা নীল হয়ে যাচ্ছে। সে কেবল দেখল যেন একটা জবাই করা মুরগী উড়ে উড়ে বনের ভিতর লাফাচ্ছে।

আকাশে এত যে মেঘ, এবং এমন যে বৃষ্টি এবং গাছপালা অঝোরে ভিজছে, বাতাসে ঝড় আর ডালপালা ভেঙে পড়ছে চারপাশে, ফেলু খেয়াল করতে পারছে না।

জল পড়ছে বলে একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। নানা রকমের কীটপতঙ্গ এখন ডাকছে। কি বিচিত্র তার আওয়াজ। ফেলু কান পাতল। কিছু কিছু ভাঙা পাঁচিলে সাপের গর্ত থাকতে পারে, সেখানে সাপেরা যেন হিসহিস করছে। এমন প্রচণ্ড উত্তাপের পর এই জল সব পথঘাট ভাসিয়ে দিচ্ছে। সাপেরা এবার বের হয়ে পড়বে। ওর এবার যথার্থই ভয় করতে থাকল। শকুনের সহসা আর্তনাদে ফেলু বলল, কর্তা, আমারে ডর দ্যাখায়। আমার নাম ফেলু। শকুন আমারে ডর দেখায়।

মনে হল এবার কে যেন এই বনে হাসছে।

ফেলু বলল, কেডা হাসে !

আবার হাসি।

ফেলু বলল, আমার নাম ফেলু। তিন যণ্ডের এক যণ্ড শেষ। আর আছে দুই যণ্ড। কিন্তু বড় যণ্ডটা যদি সিং বাগিয়ে রাখে তবে তার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। সে বলল, কেউ আপনারা আমার বিবিরে দেখছেন !

নানা রকমের শব্দের ভিতর, কারণ প্রথম বর্ষা নেমেছে, ধরণী শান্ত শীতল হচ্ছে, মাটির নিচে জল ঢুকে যাচ্ছে, নানারকম পোকা-মাকড় তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছিল এতদিন, এখন এই জল ওদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। ওরা আনন্দে ডাকছিল। তা'ছাড়া আছে কত জীব এই পৃথিবীতে আর অঝোরে বৃষ্টিপাতে জল নেমে যাবার শব্দ। সেই শব্দের ভিতর বড় বড় ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কোন ধূর্ত শেয়াল মৃতের গন্ধ পেয়ে চারপাশে হয়তো হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের পায়ের শব্দও উঠতে পারে। আর সব শুকনো ঘাসপাতা যা এতদিন শুকনো খড়খড়ে ছিল, তারা জল পেয়ে সব জল শুষে নিচ্ছে। মাটি জল শুষে নিচ্ছে। কতরকমের সব গর্ত মাটিতে। কত পোকা-মাকড় ভিন্ন ভিন্ন আবাস সৃষ্টি করে মাটির পৃথিবীতে বেঁচে আছে। তারাও জল শুষে নিচ্ছে। ফলে কি যে বিচিত্র শব্দ, সেই শব্দের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ পেলে ফেলুর আর দোষ কি ! ওর মনে হচ্ছিল, কেউ হাসছে, আবার মনে হচ্ছে, হাসানপীরের দরগায় বসে কেউ কাঁদছে। সেই যে মরা অশ্বথ গাছ আছে, যেখানে সব শকুনের নিবাস তারা এমন ঝরে কঁকিয়ে উঠতে পারে—সুতরাং ওর মনে হল, কেউ গাছের ওপরে উঠে গিয়ে শোকে আকাশফাটা আর্তনাদ করছে। কি যে মনে হচ্ছে না, সেই সব প্রাচীন গর্ত থেকে কিছু সাপখোপ বের হতে পারে, এখানে কোন আলো জলছে না যে সে দেখতে পাবে আলোর ভিতর আকালু, আন্নুকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। সে পাগলের মতো চারপাশে এইসব বিচিত্র শব্দের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করে দিল। বলল, কারে ডর দ্যাখাও মিঞা ? আমারে ? ডরাই না। ভুনিয়ায় এক আল্লা বাদে কারে ডরাই। এই বলে যেই না সে ভেবেছে এখান থেকে এবার ছুটে পালাবে, নয়তো ধরা পড়ে গেলে জেল ফাঁসি, তখনই মনে হল সে যেভাবে পোঁচ চালিয়েছে গলায়, এ পোঁচ যেন দারোগাসাবের চেনা। এমন আর হাতসাফ কার হবে ! ফেলুর। সুতরাং ফেলুকে ধরার জন্য আবার দারোগা-পুলিশ। ঘায়ের ওপর ঘা। সে সেজন্য আর দ্রুত ছুটে নেমে যেতে পারল না। এই লাশ নিয়ে তার এখন ঝামেলা। সে এমন একটা লাশকে গায়েব করে না দিতে পারলে ওর এবার নির্ঘাত গলা যাবে। সে তাড়াতাড়ি ফের উঠে এল। জল পড়ছে তো পড়ছেই। নিবারণ হচ্ছে না বৃষ্টিপাতের, রক্ত জলে ধুয়েমুছে যাচ্ছে। একবিন্দু রক্ত কোথাও লেগে থাকছে না। যা রক্ত এখনও গলাটা ওগলাচ্ছে, বৃষ্টির জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এবং এই ধরণী সব শুষে নিচ্ছে। সব কষ্ট যন্ত্রণা নিমেষে মুছে দিয়ে আবার ঘাস পাতা পাখি পোকামাকড় সব সজীব। লাশ তুলে নিলে কে বলবে এখানে কিছুক্ষণ আগে এক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে গেছে ফেলু !

বাগের ভিতর ঢুকে লাশটাকে সে যেখানে রেখে গেছে ঠিক সেখানে এসে ফের দাঁড়াল। পুব দিক ফর্সা হয়ে আসছে। সে বুঝল আর দেরি করলে চলবে না। সে তাড়াতাড়ি হাসান পীরের কবরের কাছে এগিয়ে গেল। বৃষ্টি-পাতের জন্য জল চারপাশে। মাঠে জল জমে গেছে। খুব জোর বর্ষণের ফলে চারপাশটা খাল-বিলের মতো হয়ে গেছে। কবরের ভিতর জল জমে গেছে। যে বড় শানটার নিচে হাসান পীরের কঙ্কাল এখনও পড়ে আছে, যেখানে পাগল ঠাকুর আসত মাঝে মাঝে, এবং বলশালী মানুষ বলে যে মাঝে মাঝে শান তুলে কথা বলত পীরের সঙ্গে, সেই শানের নিচে সে ভাবল চাপা দিয়ে রেখে দেবে—তবে কেউ টের পাবে না। জল জমে গেছে কবরে। জলের ভিতর লাশটা পড়ে থাকবে। ওপরে শান চাপা। সুতরাং দু'দিন যেতে না যেতেই পচে মাটির সঙ্গে জলের সঙ্গে মিশে যাবে। এবং যেমন হাঁ করে হাসান পীরের কঙ্কালটা তাকিয়ে আছে ফেলুর দিকে, তেমনি পরে এসে সে একবার দেখে যাবে এই মানুষের কঙ্কাল কি খুবসুরত মুখ নিয়ে উঁকি দিয়ে থাকে। তখনই যেন সে বলতে পারবে, আমার নাম ফেলু। হালার কাওয়া।

অর্থাৎ আমি মানুষ একখানা মিঞা। ভয় ডর নাই। সুখ সখ সব গেছে। বিবি আমার পলাতক। আমি মরেও মরি না। আমার বাঁচার বড় সখ। আমারে তোমরা কেউ বাঁচতে দিতে চাও না। আমার মরণ হাঁকবা ঠাকুর, তোমার কি আস্পর্ধা। আমি জানি তুমি আমারে হাতির পায়ের নিচে রাইখা মারতে চাইছিলা। পাগলা ঠাকুর ! সে এবার একটা ঠ্যাঙ ধরে টানতে গিয়ে দেখল ভীষণ ভারি। তার এক হাতে কত আর শক্তি ! সে এক হাতে টানাটানি করে লাশ এতটুকু হেলাতে পারল না। সে ডানদিকের পা'টা ওর

ডান বগলে ফেলে কপিকলের মতো আটকে দিল। তারপর টানতে থাকল। কিছুটা নড়ছে। নড়ছে! সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পাশেই জল জমে আছে। জলের ভিতর নিয়ে ফেলতে পারলে এত ভারি লাগবে না। এবং এই ভেবে সে টেনে লাশ জলের ভিতর ভাসিয়ে দিল। তারপর ঠেলে ঠেলে যেখানে সেই কবর এবং নানারকমের গাছগাছালির ছায়া সেখানে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে শানটা তোলার চেষ্টা করছে। ওর পক্ষে শান তোলা ভারি কষ্টকর। একমাত্র এ অঞ্চলে এই পাগল মানুষ পারতেন এত ভারি শান তুলে পীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। আর কেউ পারত না। ফেলু এমন গল্প শুনেছে। সে একবার-যখন সে যথার্থ ফেলু, হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ফেলু, তখন এমন বীরগাঁথা শুনে এই হাসান পীরের দরগায় চলে এসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও বলশালী ফেলু দু'হাতে শানটা নড়াতে পারে নি। আজ সে কিভাবে যে পারবে! তা'ছাড়া কি উপায়! আছে এক উপায়। কবরের ওপর বৃষ্টির জল জমে প্রায় হাঁটুজল। জলের নিচে এখন শানটা পাতলা হবে খুব। ওকে খুশি খুশি দেখাল। সে বলল, আমার নাম ফেলু। হালার কাওয়া।

এক হাতে সে অনায়াসে লাশটাকে জলের ওপর ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিল। জল খুব অল্প। তবু যেখানে গর্তমতো জায়গা সেখানে খাল-বিলের মতো জল। সে জলে টেনে এনে একেবারে ঠেলে ফেলে দিতেই ওর মুখ-চোখ শরীর সব কর্দমাক্ত হয়ে গেল। জোনাকিরা যা আটকে ছিল, মরে গেছে বোধ হয়। জলে ধুয়ে গেছে। সে আর আজব জীব নেই। সে অশরীরী নয়। সে ফেলু। বার বারই তার মনে হচ্ছিল সে ফেলু। ফেলু শেখ।

শানটা তুলে কবরে ফেলে দিতেই মনে হল একদিকে ঠ্যাং বের হয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর ঠ্যাংটা ঢুকিয়ে দিল। পুব দিকটা এবার যথার্থই ফর্সা হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি লাফ মেরে ওদিকে চলে গেল। সে এখানেও হাঁটু গেড়ে বসল। শানটা জলের ভিতর থেকে টেনে তুলল। তারপর পা-টা ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে বুঝল আর কিছু পড়ে নেই। সব অদৃশ্য। কেবল সে একা জেগে আছে। আর গাছগাছালি। শকুনেরা উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু লাশটাকে শানের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া মানেই ওদের আহার থেকে বঞ্চিত করা। মনে হল, সেই রাজা শকুনটা এবার ফেলুকে তেড়ে আসবে। সে মাঠে নেমে গেলেই দলবল নিয়ে শকুনগুলো ওকে তেড়ে আসবে। সে এবার কিন্তু সত্যি ভয় পেয়ে গেল। গাছপালার নিচ থেকে সে বের হচ্ছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে সেই রাজা শকুনটা ওকে উঁকি দিয়ে দেখছে কিনা। এই দেখতে দেখতে সে দেখল পুবের দিকে সূর্য উঠে গেছে। গাছের নিচে সকালের রোদ। আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল। কেবল প্রথম প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন চষা জমিতে জল জমে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। সে হয়তো এই গাছের নিচে, হাসান পীরের দরগায় আরও অনেকক্ষণ ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, কারণ সেই এক ভয়, যেন মাঠে নেমে গেলেই শকুনেরা ওকে তাড়া করবে, যেমন এক দঙ্গল মাছি সব সময় ওকে তাড়া করছে, ওর ঘায়ের ওপর বসার জন্য ভনভন করে উড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে সে যায়, মাথার ওপর সেই ভনভন করে মাছিদের ওড়া। সে কতদিন এই মাছি খপ করে ধরে ফেলে মেরে ফেলেছে। তালুতে চিপে প্রতিশোধের চোখে তাকিয়ে থেকেছে। ওর ঠিক এই মাছিদের মতো মনে হচ্ছে এই শকুনেরা ওর দিকে এবার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসবে। এবং সে যেখানে যাবে, তাকে তারা তাড়া করবে। এমন সব আজগুবি ভয় ওকে মাঝে মাঝে এমন পেয়ে বসে যে সে আর স্থির থাকতে পারে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। পাষাণের মতো কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। সে হয়তো এই কবরে তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু সহসা ওর মনে হল সে তার বাগি গরুটার খোঁটা মাঠে পুঁতে দিয়ে এসেছে গতকাল সকালে। ওটা না খেয়ে আছে। এক খোঁটায় সে ঘুরে ঘুরে মরছে। অথবা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। কেউ নাই তার। না আন্নু, না ফেলু কাছে। ভিতরে ভিতরে ফেলু গরুটার জন্য কেমন মমতা বোধ করল। সে তার নিজের জানের কথা মনে রাখতে পারল না। এই যে এখন এত শকুন মাথার ওপর উড়ছে, মাঠে নেমে গেলেই তেড়ে আসতে পারে ভেবে সে যে নেমে যাচ্ছিল না মাঠে, এ সময় আর তা মনে থাকল না। সে বিহনে গরুর চোখ অন্ধকার। সে গতকাল বের হবার আগে গরুর চোখদুটো দেখেছে। দেখে ভুলতে পারছে না। একমাত্র পৃথিবীতে এই বাগি গরুটাই ওর ভিতরের দুঃখটা টের পেয়েছে। সেই গরুটা এখন তার কাছে, জানের মায়া বড় না ভালবাসা বড় বুঝতে দিচ্ছে না। সে এবার চোখ বুজে সোজা চষা জমির ওপর দিয়ে জল কাদা ভেঙে ছুটতে থাকল।

সে চোখ বুজে ছুটছে। ভয়ে সে পিছনে তাকাচ্ছে না। তাকালেই যেন সে দেখতে পাবে শকুনেরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে তাড়া করছে। এমন পুষ্ট খাবার সে লুকিয়ে রেখেছে শানের নিচে। পচে যাবে, মাটিতে মিশে যাবে, তবু সে

খেতে দেবে না। না কি সেই ঠাকুর, পাগল ঠাকুর যাঁর প্রাণ নিশীথে একাকী ভুবনময় ঘুরে বেড়ায়, ওর পিছনে শকুন লেলিয়ে দিয়েছেন! মানুষজন ভাবত, এই মানুষ সামান্য মানুষ নয়, পীর মানুষ, সে মানুষ প্রাণ ফিরে পেতে কতক্ষণ!

সে ভয়ে কতক্ষণ যে এভাবে ছুটেছিল! বেশ বেলা হয়ে গেছে। এখন আর শকুনেরা নাগাল পেতে পারে না। সে তার গাঁয়ে উঠে এসেছে প্রায়। পাশে সেই গ্রাম। ঠাকুরবাড়ির দিকে সে তাকাল। মানুষজন লেগেই আছে। সে বাড়িতে মানুষের যে কি কাম এত! সে বুঝতে পারে না। সে দেখল হাসিমের বাপ দুধ নিয়ে যাচ্ছে। ইসমতালি নিয়ে যাচ্ছে এক টিন গুড়, কেউ মধু দিয়ে আসছে, কেউ বাঁশ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। কত কাজ সে-বাড়িতে। সবাইকে কেমন কেনা গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তা রেখেছে। সে যে এমন একটা মজার কাজ করে ফেলেছে, যেন সে কোন মানুষ হত্যা করে নাই, সে হত্যা করেছে আজব একটা জীবকে, যার কোন হুঁশ নেই। সে যেমন ডাল কেটে, ঘাস কেটে ধার দেখে তেমনি সে আকালুকে জবাই করার আগে ধার দেখে এসেছে কোরবানীর চাকুটার। আর তখনই সে দেখল পয়মাল সেই যণ্ড। বাগি গরুটার পিছনে লেগেছে। গরুটা দুপা এমন ছুঁড়ছে যে লাথি খেয়েও নড়ছে না। হালার কাওয়া। তুমি এক ষণ্ড। আমার জীবের লগে পিরিত তোমার। সে সহ্য করতে পারছে না, ওর ভেতরে আগুন দপ করে জ্বলে উঠেছে। আবার পায়ের রক্ত মাথায়। আকালু তার বিবি নিয়ে পালায়, ওদের ষণ্ড ওর জীবকে জোর করে পাল খাওয়াতে চায়, এত বড় ষণ্ডের সঙ্গে পারে কি করে তার জীব। সে ফের টেনে ধরল চাকুটা। এবং বাতাসে আবার ইস্পাতের ফলাটাকে খেলাতে থাকল।

ষণ্ডটা ফেলুকে বুঝি দেখতে পাচ্ছে না। বাগি গরুটার পাছা মোটা এত বেশি যে সেখানে মুখ লুকালে ফেলুকে দেখা যায় না। ফেলুর কাছে শালা ষণ্ড এখন আকালু বনে গেছে। সেই তাজা চেহারা। রোদের ভিতর চকচকে ফেজ টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অভাগা গরুটা তার বিবি। যেন আন্নুর কোন ইচ্ছা ছিল না। সারা জীবন সে এই বাগি গরুর মতো পিছনে পা ছুঁড়ছে, আর আকালু সে-সব তুচ্ছ করে নাক উঁচু করে রেখেছে বিবির পিছনে। মেয়েমানুষ কত পারে! সে পারে নি বলে মানসম্মান নিয়ে শেষপর্যন্ত ভেগে গেছে। আন্নুর মতো ওর বাগি গরুটার জোরজার করে পাল-খাওয়া মুখ দেখে সে তার রোষ সামলাতে পারল না। চাকুটা তুলে সে

জানের মায়া না করে ষণ্ডটার গলার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবং অতর্কিতে গলকম্বলটা ফাঁক করে দিতেই ষণ্ডের হুঁশ হল, গোত্তা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে চার পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল। সবটা টেনে দিতে পারে নি। চার পায়ের ওপর শক্ত করে দাঁড়াতেই ষণ্ডটা দেখল ওর গলায় চাকু চালিয়ে দুশমনটা ছুটছে। গলগল করে রক্ত ওগ্‌লাচ্ছে নালিটা। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মহাজীবটা এবার ছুটতে থাকল। ফেলুও পড়িমড়ি করে বাড়ির দিকে উঠে যাচ্ছে।

ষণ্ডটা মাঠের ওপর দিয়ে ফেলুকে মেরে ফেলার জন্য তেড়ে যাচ্ছে।

লোকজন দেখতে পাচ্ছে, ফেলু ছুটছে মাঠের ওপর দিয়ে আর ষণ্ডটা ছুটছে পিছনে। ধর্মের ষণ্ড সামান্য এক মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

গেল গেল রব। সবাই যেখানে যত মানুষ আছে ফেলুর চিৎকারে ছুটে আসছে। আমারে বাঁচান, আমারে বাঁচান। এক হাত ওপরে তুলে সে ছুটছে। সে জানে তার রক্ষা নেই। সে ষণ্ডের চোখের ভিতর তার মরণ দেখে ফেলেছে। মহারোষে জীব ছুটছে। জীবের শেষ সময়। চোখের ওপর নীল রঙের পর্দা। এবং দুশমনটা সেই নীল রঙের একটা দৃশ্যের ভিতর কেবল ছুটে যাচ্ছে। সেও ছুটে যাচ্ছে। ফেলু পিছনে তাকাচ্ছে, আহা, এ-যে উঠে এল। আমারে বাঁচান। কেডা আছেন, আমারে বাঁচান গ, আমারে রক্ষা করেন।

মানুষজন কেউ এগোচ্ছে না। সবাই দাঁড়িয়ে বুঝি তামাশা দেখছে। না এমন মনে হল না। কিছু লোকজন ছুটছে। বড়বৌ রাতে ঘুমাতে পারে নি। সেও এই চিৎকার শুনে মানুষের সোরগোল শুনে ছুটে এসেছিল পুকুরপাড়ে। কে আর যাবে সামনে! মানুষে আর ষণ্ডে লড়াই। মরিয়া হয়ে ফেলু যেই না রুখে দাঁড়াবে ভাবল এবং ফাঁক বুঝে আর একটা চোখ গেলে দেবে ভাবল, তখনই দেখল ষণ্ডটা কেমন অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর চোখের ওপর থেকে। বস্তুত ষণ্ডটা তখন ওর যে চোখটা নেই সেদিকে আছে। মুখ ঘুরালেই সে দেখতে পেত কি রোষ জীবের। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কেবল চার পায়ের ওপর লাফাচ্ছে। আহা সে যদি সবটা টেনে দিতে পারত! সে আর পারল না। ষণ্ডটা ওর ওপর এসে দ্রুত লাফিয়ে পড়ছে। ওর যদি দুটো চোখ থাকত! আহা দুটো চোখ। ধর্মের মতো সে একচক্ষু জীব হয়ে গেছে। সবটা দেখতে পায় না। কিছুটা দেখতে পায়। কিছুটা যায়, কিছুটা জানে, কিছুটা বোঝে এবং শেষপর্যন্ত ফেলুর মতো একটা বাগি বাছুর মাঠে ছেড়ে দেয়। সে বলল

আল্লা এডা কি হইল। কারণ ষণ্ড তার প্রবল প্রতাপান্বিত দুই শিঙ নিয়ে এমন জোরে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যে সে জানে না পিছনে এক বড় কাফিলা গাছ আছে, নরম গাছ এবং সে তার সামনে দাঁড়িয়ে ষণ্ডের সঙ্গে লড়াই করার জন্য শেষবার প্রস্তুত হচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে কেউ ছুটে আসছে না। সে হায় হায় করে বাতাসে ছুরি শান দিতেই প্রবল প্রতাপান্বিত ষণ্ড শিঙ ঢুকিয়ে এক-বারে গাছের সঙ্গে গেঁথে নিজে চার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পেটের ভিতরে শিঙ ঢুকে কাফিলা গাছ ফুঁড়ে ওপাশে শিঙ বের হয়ে গেছে। সে কেমন একটা দীনহীন মানুষের মতো শেষবার ডাকল, আল্লা আমার এই আছিল কপালে! বলতে বলতে সে দেখল, তার পেটের ভিতর থেকে সব রক্ত উপচে ষণ্ডের মুখ রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। ষণ্ডের গলকম্বল ছিঁড়ে গেছে বলে গরম রক্ত এবং শ্বাসনলীর ভিতর থেকে রক্ত প্রবলবেগে বের হয়ে ফেলুকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

দুই জীব এখন দুই পরম আপনজনের মতো কাফিলা গাছের নিচে পড়ে আছে। ষণ্ডের প্রাণ নেই, ফেলুর প্রাণ নেই। আহা ফেলু তুমি একখানা মানুষ। তোমার জয় দিবার কেহ নাই হে। আমি লেখক তোমার হয়ে জয় দিলাম। ফেলু তুমি বড় মানুষ হে। তুমি জান লড়াই করতে। তোমাকে এ-ভাবে মরতে দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।

সব গ্রাম ভেঙে পড়েছে তখন এই মাঠে। ফেলুর বাড়ির সামনে। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা এমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কেন বুঝতে পারছে না। সবার ধারণা ষণ্ড ফেলুর পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে, তারপর বাগে পেলে যে সামনে পড়বে তারই পেট ফাঁসাবে। ষণ্ড ক্ষেপে গেছে। ওরা সবাই লাঠি, বাঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুকে ফেলে দিয়েছে এবং এবার এদিকে ছুটে আসবে। ধর্মের ষাঁড়। ওকে কিছু করতে নাই। তা একটা জান গেছে তো কি হয়েছে। তা ছাড়া ফেলুর তো এ-ভাবেই যাবার কথা। সুতরাং যাতে অন্যদিকে ছুটে না যায়, এবং তেড়ে গিয়ে অন্য কাউকে আঘাত না করে সেজন্য ওরা চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। অথচ বেশ সময় পার হয়ে গেছে, কেন ষণ্ডটা উঠে আসছে না! দু একজন এবার পা পা এগুতে থাকল। আরে এডা কি হইল! ষণ্ডটার গলা কাটা। ফেলুর চোখ খোলা। পেটের নাড়ি সব বের হয়ে আসছে। শিঙের ভিতর জড়িয়ে গেছে। ফেলু এক হাতে তখনও কোরবানীর চাকুটা শক্ত করে ধরে আছে।

লোকগুলো বলল, হা আল্লা!

ফেলু আর ধর্মের ষণ্ড এখন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে কাফিলা গাছটার নিচে। আকাশে সূর্য তেমনি কিরণ দিচ্ছে। ঠাকুরবাড়িতে তেমনি কেউ মধু, দুধ এবং বাঁশ নিয়ে যাচ্ছে। বড়বৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখছে। মানুষটা ফিরে আসে নি। মাঝরাতে সোনার কি যে আবার হয়েছিল! সে আবার আগের রাতের মতো ভয়ে নীল হয়ে গেছিল। জ্বর। সে কেবল বলেছে, আমি মরে গেলাম। জেঠিমা আমাকে কারা মেরে ফেলছে। জল। জল। ঐ ঐ আসছে, আসছে।

সবারই বিছানা থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেছে। সাদা পাথরে ফলমূল কেটে রেখে দিয়েছিল বড়বৌ। যদি তিনি আসেন। আসেন নি। সকালে উঠে সবাইকে ডেকে, বড়বৌ এখন পাগল মানুষের জন্য রাখা ফলমূল বিতরণ করে দিচ্ছে।

তখনই এ-গাঁয়ে খবর এল, ষণ্ডটা ফেলুর পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে।

ঈশম এসে তখন বলছিল, ঠাইরেন একটা কথা কই।

বড়বৌ সব ফলমূল ততক্ষণে বিলিয়ে দিয়েছে। হাতে তার খালি সাদা পাথরের থালা। সে, ঈশম কি বলবে, কোন গোপনীয় কথা নিশ্চয়ই, সুতরাং সে সবাইকে চলে যেতে বলল, কিছু বলবে!

—ফেলুডা না-পাক মানুষ। দাফনের টাকা অর জাতভাইরা কেউ দিব না কয়।

বড়বৌ বুঝতে পারল ঈশম দাফনের জন্য কিছু টাকা চায়। সে গোপনে এই টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এবং দাফনের নিমিত্ত যা কিছু করণীয় সে করবে।

বড়বৌ তার যা সঞ্চয় ছিল, সে থেকে কিছু দিয়ে দিল। বলল, সারাটা জীবন ফেলুর বড় কষ্টে গেছে।

—তা গেছে বড় মামী।

—অথচ দ্যাখো ফেলুর কি না ছিল। সেই চেহারা। এখন আমার চোখে ভাসে, ফেলু গোপালদি থেকে যে-বার হা-ডু-ডু খেলে শীল্ড নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোকে ওকে নিয়ে কত বড় উৎসব করেছিল। আর আজকে ওর দাফনের টাকা কেউ দিচ্ছে না।

ঈশম চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সহসা কি মনে হতেই বলল, বড় মামা ফিরা আইছে?

—না। আসে নি।

শশিভূষণও এ-সময় উঠোনে কি কাজে চলে এসেছিল। সে বলল, শুনেছেন বড়বৌদি, ফেলুর পেটে খোদাই ষাঁড়টা শিঙ ফুঁড়ে দিয়েছে।

—শুনেছি।

—বড় হারমাদ ছিল।

বড়বৌ কিছু বলল না।

—কর্তা ফিরেছে আপনার?

বড়বৌ মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। বলল, না।

—আজ ঠিক ফিরে আসবে। আজ নিয়ে দুদিন হল না?

—দুদিন। বলে শশিভূষণকে সে অনুরোধ করল, আপনি একবার যাবেন বিকেলে খুঁজতে? লালটু পলটুকে পাঠাবেন? ওরা তো আপনার কথা শোনে।

ঈশম বড়মামীর চোখ দেখলেই সব টের পায়। সে বলল, বড়মামী আমি যামু। বিকালে কোন কাজ হাতে রাখুম না। কেবল মাঠেঘাটে বড়মামারে খুইজা বেড়ামু।

—ঠিক পেয়ে যাবে। দেখ গিয়ে হয়তো কোন ঢিবিতে উঠে বসে রয়েছে। সেখান থেকে কি করে নামবেন বুঝতে পারছেন না। একমাত্র তুমি অথবা সোনা তাকে নামিয়ে আনতে পার। কি বলেন বড়বৌদি ঠিক না?

বড়বৌ এমন কথায় ম্লান হাসল।

কেউ আর এখন বড়বৌর কথার গুরুত্ব দিতে চায় না। তিনি নিরুদ্দেশে গেছেন, চলে যান বারবার, তাঁকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না, তিনি নিজেই চলে আসেন। সুতরাং শশিভূষণ বলল, আপনি অযথা ভাবছেন বড়-বৌদি! ভেবে তো কিছু হবে না!

ঈশম চলে গেল তখন। শশিভূষণ বলল, কখন বের হয়েছে, আপনি দেখেন নি বের হতে?

—না দেখি নি। কি যে কুয়াশা করল।

—কোনদিকে নেমে গেছে কেউ বলতে পারে?

—তাও জানি না। সোনাকে নিয়ে এত বেশি সবাই ব্যস্ত ছিলাম যে

ওদের হবিষ্যান্ন পর্যন্ত করাতে পারি নি। মানুষটা না খেয়ে কোথায় যে বের হয়ে গেল!

—আসবে। চলে আসবে ঠিক।

—সে তো আমিও জানি চলে আসবে। কিন্তু মন যে মানে না। না খেয়ে কোথায় যে উপবাসী মানুষটা বসে রয়েছে! বলতে বলতে বড়বৌর চোখ থেকে টপটপ করে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে গড়ল।

শশিভূষণও বড়বৌর এমন চোখমুখ দেখলে বড় কষ্ট পায়। যেন বোঝ-প্রবোধ দেবার মতো বলল, আচ্ছা পাঠাচ্ছি লালটু পলটুকে। আমি নিজেও খুঁজতে যাব। আপনি অযথা কাঁদবেন না।

কান্না ভাল নয় বড়বৌও জানে। কাঁদলে মানুষের কোন শুভ হয় না। সে চোখ আঁচলে মুছে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিচ্ছিল তখনই শচীন্দ্রনাথ এসে বলল, বড়দা রাতে ফিরা আইছে?

কারণ শচীন্দ্রনাথ জানে রাতে তিনি প্রায়ই ফিরে আসেন। সকালে অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। হয়তো পুকুরপাড়ে কিংবা চুপচাপ ঘরেই বসে রয়েছে। সুতরাং বড়বৌদি ওকে ঠিক খবর দিতে পারবে। সেজন্য প্রশ্ন করে জেনে নিল, তিনি এসেছেন কিনা। আসেন নি। শচীন্দ্রনাথকে আদৌ উদ্বিগ্ন দেখাল না। এখন কত নিয়মকানুনের ভিতর থাকতে হয়, তা না করে তিনি মাঠেঘাটে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে যা দিচ্ছে খেয়ে যাচ্ছেন। তার এটা ভাল লাগছে না। না খেলে মানুষটা এমন অনিয়মের ভিতরও এত বলশালী থাকে কি করে! কিন্তু বড়বৌর মনে হয় তিনি হাঁটছেন, হাঁটছেন চারপাশে যা কিছু রয়েছে, এই যে নীচতা হীনতা, সব অবহেলা করে হেঁটে যাচ্ছেন। কোথাও কিছু তিনি খাচ্ছেন না। কেবল উপবাসী থেকে সন্ন্যাস জীবনযাপন করছেন।

তখনই মনে হয় বড়বৌর, কোথাও গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। একটা নীল মতো মরুভূমি জায়গা। চারপাশে ধুধু বালুরাশি! কোন গাছপালার চিহ্ন নেই। একজন মানুষ নিয়ত তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দূরে, অতি দূরে গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি! প্রায় কোন মহামান্য সন্ন্যাসীর মতো এই মানুষ তখন মরুভূমি পার হয়ে দুঃখী মানুষের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছেন। বলছেন, ঐ ছাখো আকাশে কত আলো, পৃথিবীর গাছপালার ভিতর অথবা এই যে মরুভূমি তার ভিতর ঈশ্বরের কি অপার করুণা! তিনি হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন।

শ্বাস ফুস পাখিকে বলছেন, অনন্তকাল এই পৃথিবীতে তোমরা বিচরণ কর। তোমরা সুখে থাকো।

যখন তিনি এমন মানুষ তখন তার পৃথিবীতে আর কে শত্রু থাকবে। কে তার অনিষ্ট করবে! সুতরাং বড়বৌ লালপেড়ে একটা নতুন কোরা শাড়ি পরে বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল। বড়বৌ বলে তাকে হবিষ্যান্ন করতে হচ্ছে। সে সিঁদুর দিতে পারছে না কপালে। চুল আঁচড়াতে পারছে না। চুলে তেল দিতে পারছে না। সেও কেমন ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা ফিরে এলে সে আবার বড় করে কপালে সিঁদুর ফোঁটা দেবে। যা কিছু অলঙ্কার আছে পরবে। তখন মাথা নেড়া থাকবে মানুষটার। পরনে নতুন কোরা ধুতি। সে মৎস্যস্পর্শের দিন এমনভাবে সেজে আসবে যে মানুষটা তাকে দেবদাসী ভেবে চোখ বুজে ফেলবে। মানুষটা ফিরে এলে কি যে করবে না এবার! তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে থাকলে তাঁকে ঠিক কপিলাবস্তু নগরের সেই সন্ন্যাসী রাজকুমারের মতো মনে হবে। সে যশোধরা। এমন মনে হতেই কেন জানি বড়বৌর আর কোন দুঃখ থাকল না। সে এখন এ-ঘর ও-ঘর করে ছুটে ছুটে কাজ করছে।

সোনার কপালে হাত রেখে বলছে, কিরে তুই ভাল হবি না! কবে হবি! কবে যাবি আনতে তোর জ্যাঠামশাইকে। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। কত লোকজন আসবে কত বড় উৎসব হবে বাড়িতে আর তুই শুয়ে থাকবি, আমার ভাল লাগে!

আবেগের বশেই এসব বলে গেল বড়বৌ। তার ভাল লাগছে—সেই মুখ, সন্ন্যাসী রাজকুমারের মুখ তার চারপাশে এখন এক অদৃশ্য ছবি হয়ে আছে। তার চারপাশে ঘুরছে ফিরছে। মনে মনে বড়বৌর সঙ্গে তার মানুষ কথা বলছে। তার আর ভয় কি! সে কাঁদবে কেন! অতীতের সেই কপিলাবস্তু নগর, তার প্রাসাদ, রাজা শুদ্ধোদন এবং সেই সুন্দর স্বপ্ন মায়া দেবীর—মহারাজ রাতে এক সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। একটা ছোট্ট সাদা হাতি আস্তে আস্তে আমার কোলে নেমে এল। তারপর ধীরে ধীরে সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল দেখতে পেলাম না। বৈশাখী পূর্ণিমায় রাজকুমারের জন্মের দিনটি কল্পনা করতে বড়বৌর আজ খুব ভাল লাগছিল।

মনে হল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ঈশমকে কেউ ডাকছে। সে খুব ব্যস্ত ছিল বলে প্রথমে খেয়াল করে নি। সে একাই আজ একশ। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আবেদালি! সে আর কাউকে সঙ্গে পাবে আশা করে নি। হ্যাঁ, আর এক-জনকে সে পেয়েছে, সে মানুষের নাম অলিমদ্দি। অলিমদ্দি মুড়াপাড়ার ফর্দ অনুযায়ী ধারে পাঁচটা মুনিষ নিয়ে বাজার করে ফিরেছে। সুতরাং সে ছিল। আর আছে এখন যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকছে।

চোখে খুব একটা আজকাল ঈশম ভাল দেখছে না। আবেদালিই তার নজরে এনে দিল। চাচা ঐ হ্যাখেন আপনারে ডাকতাছে।

—কেডা আমারে ডাকে।

—মনে লয় হাজিসাবের মাইজলা বিবি।

ওরা দুজন আরও কাছে এগিয়ে গেল। বটগাছটা পার হলেই হাজি-সাহেবের অন্দরের পুকুরের ও-পাড়ে কদম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। সে কাছে এসে বুঝল, সেই ফেলুর ছলচাতুরি করে ধরে আনা বিবি। উজানে হাজিসাহেব গেছিলেন। ফেলু তার যৌবন দেখিয়ে তুলে এনেছিল বিবিকে। এ-সব এখন কত অতীতের কথা। কে আর এ-নিয়ে বাকবিতণ্ডা করে। সবই মানুষের ধর্ম ভেবে ঈশম সন্তর্পণে ও-পাড়ের ঘাটে চলে গেল। ঈশম বুড়োমানুষ বলে এ-গাঁয়ে সে প্রায় সবার কাছে আপনার জনের মতো। সে কাছে গেলে মাইজলা বিবি কোমর থেকে একটা ঘুনসি বের করে বলল, টাকা কটা দিলাম চাচা। অর কবরে দিয়েন।

ঈশম দেখল, একটা দুটো টাকা নয়। প্রায় পাঁচ কুড়ি টাকা। সে বলল, এত লাগব না।

মাইজলা বিবি চারদিকে তাকাচ্ছে। কেউ আবার দেখে ফেলছে কিনা। সে গোপনে টাকাটা দিতে এসেছে ঈশমকে। সে কাফিলা গাছটা পর্যন্ত যেতে পারে নি। তাকে হাজিসাহেব যেতে দেয় নি। সবাই দেখে এসেছে ষাঁড়টা এবং ফেলু অদ্ভুত এক দৃশ্য তৈরি করেছে কাফিলা গাছের নিচে। মাথাটা ফেলুর ঢলে পড়েছে ষাঁড়টার ঘাড়ে। ষণ্ডের মুখ কাত হয়ে আছে। এবং ষণ্ডের চোখ মরে গিয়ে নীল। কানা চোখটা দেখা যাচ্ছে না। ফেলুরও কানা

চোখটা আড়ালে পড়ে গেছে। যণ্ডের গলা কাটা আর ফেলুর পেট ফেঁসে গেছে। মাইজলা বিবি আড়ালে দাঁড়িয়ে মানুষটার জন্য চোখের জল ফেলেছে। কেউ যাচ্ছে না দাফনে। সে-ই ডেকে এনেছিল ঈশমকে। খবরটা দিয়েছিল। তারপর মানুষটার দাফনের টাকা হবে না ভেবে প্রথম দাফনের জন্য কিছু টাকা, এবং পরে মনে হল মাইজলা বিবির, এই তো তার মানুষ, যার রঙ্গরসে ভুলে উজানি নৌকাতে পা দিয়েছিল। হাজিসাহেব ফেলুকে দিয়ে ফাঁদ পাতিয়েছিলেন। ফেলুর সে-সব দুষ্কর্মের কথা এখন আর মনে হয় না। ফেলু তার কাছে বড়-মানুষ। সে তার সামান্য এই সঞ্চিত কটা টাকা দিয়ে কি করবে! সে বলল, রাখেন।

ঈশম বলল, না এত লাগব না। বলে সে হিসাব করল মনে মনে তারপর মাত্র গোটা পাঁচেক টাকা রেখে ফিরিয়ে দিল।

কিন্তু মাইজলা বিবি টাকা আর ফেরত নিল না। বলল, আমি যাই চাচা। সব টাকা রাইখা দ্যান। টাকায় অর কবরে একটা মাজার বানাইয়া দিবেন। বলে বিবি আর দাঁড়াল না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর ঠিক না। দেখতে পেলে হাজিসাহেব আবার পাঁচন নিয়ে তেড়ে আসবে। সে বলল, মর্জিতে যা লয় করবেন চাচা।

ঈশম এই মেয়ের মুখের দিকে আর যথার্থই তাকাতে পারছিল না। সারাজীবন, সারাজীবন বলতে প্রায় বিশ সালের ওপর হবে এই এক হাজিসাহেবের ঘরে নিঃসন্তান বিবি, দু কুড়ির কাছাকাছি বয়স। যা কিছু সঞ্চয় তার, সবই বোধহয় এটা-ওটা বেচে। যেমন দু কাঠা খেসারি কলাই গোলা থেকে বেচে দিলে কেউ টের পায় না। সারাজীবন, জীবন বিপন্ন করে যা কিছু সে পেয়েছে সব দিয়ে গেল। তাকে ইঁটের বায়না দিতে হবে তবে। এখানে তো এখন ইঁট পাওয়া যাবে না। কখন যে সে কি করে।

তবু সবাই দেখল, অদ্ভুত একখানা কাণ্ড; পরদিন নদীতে একটা ইঁটের নৌকা লেগে রয়েছে। এবং যেখানে জালালিকে কবর দেওয়া হয়েছে তার পাশে আর একটা কবর। কবরের চারপাশে ইঁট গেঁথে দিচ্ছে। কোথায় যে এত পয়সা পেল ঈশম, ঈশমকে বললে সে হাসে। সে বলল, মানুষ কখনও না-পাক হয় না। সে খুব ধর্মাধর্ম বোঝে না। সে কোরানশরিফ পাঠ করতে পারে না বলে বড় দুঃখ। সময় পেলে মসজিদে বসে সেই অর্থহীন শব্দ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। তার কাছে অর্থহীন এই জন্য যে আরবী ভাষায় সব

আয়াতের অর্থ সে বুঝতে পারে না, কেবল এক যেন ফকির ওকে হাত ধরে কোন নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। তারপর নদী সমুদ্রের মতো মনে হয়। অনন্ত জলরাশি, এবং একটা বড় নৌকা সে দেখতে পায়। সেই নোয়ার নৌকা। সেই নবি মানুষটা সবাইকে ডাকছে, যারা পুণ্যবান মানুষ, গরু ঘোড়া, হাতি মোষ, পাখি, কবুতর কত জীব নিয়ে সে নৌকায় তুলছে। ঈশম কখনও কখনও সেই নবির মতো চরে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন সে একটা বড় নৌকা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে সে নৌকায় তুলে নেবে পাগলঠাকুরকে, তারপর সোনাবাবুকে, ফেলু বেঁচে থাকলে সে বুঝি তাকেও নিত। কেয়ামতের দিন মনে হলে মহাপ্লাবনের কথা তার মনে আসে। সে তখন আর কিছু মনে করতে পারে না।

ফেলুর ইঁট দিয়ে বাঁধানো কবরটা দেখে হাজিসাহেব ছেলেদের ডাকল। বলল, তোমরা আমার কবর ইঁট দিয়া বাইন্দা দিয়। আর তার মাইজলা বিবি ঘাটে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর সেই মাজারে রাতে মোমবাতি জ্বালাতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু সে সন্ধ্যায় পারে না। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ যেন জেগে রয়েছে। ওকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু যখন এই অঞ্চল নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, কোন কাকপক্ষী ডাকে না, কেবল মাঝে মাঝে সে ঝোপে-জঙ্গলে কীট-পতঙ্গের আওয়াজ পায় তখন ধড়ফড় করে উঠে বসে। শিয়র থেকে ম্যাচবাতিটা তুলে নেয় হাতে। একটা মোমবাতি তুলে নেয় এবং নিশীথে কালো বোরখা পরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সে এই কবরে নেমে আসে। কবরের বেদিতে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। সে ডাকে মিঞা আমি আইছি। মোমবাতি জ্বালাতে আইছি। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। ফেলুর হয়ে সে শোক করে। কেউ জেগে নেই বলে সে মাথা নুইয়ে রাখে কবরের পাশে। এবং নামাজের ভঙ্গীতে বসে থাকে। যেন সে নামাজই পড়ছে।

সারারাত্রি ধরে কেউ কেউ খবর পায় এক বোরখা পরা বিবি এই কবরে হাঁটাহাঁটি করে। হাতে তার মোমবাতি। সবাই আবার কোন অশরীরীর গন্ধ পায় চারপাশে। এটাই রক্ষা করেছে মাইজলা বিবিকে। সে বের হয়ে যায়। কারণ সে এক ঘরে একা থাকে। ঝাঁপ বন্ধ থাকে। হাজিসাহেব ছোট বিবির বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকেন। পাঁচ ওক্ত নিয়মিত নামাজ পড়েন। ধর্মাধর্মে তাঁর কোন ফাঁকি নেই।

আর মাইজলা বিবি কেমন নিশুতি রাতে কবরের গন্ধে পাগল বনে

যায়। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জালাতে পারলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। কবরের পাশে বসলেই মনে হয় মানুষটা কবর থেকে উঠে এসেছে। এবং ওর সেই মুখ চোখ; একেবারে যৌবনকাল তার। সে যৌবনকালের ফেলুকে নিয়ে তখন একেবারে একা। মাইজলা বিবির চোখে জল, অস্ফুট গলায় বলে, আমি আর পারি না মিঞা! বাইচ্যা থাকতে তোমারে পাইলাম না মিঞা। আমার যে কি কষ্ট!

হাজিসাহেব ফেলু মরেছে জেনেই মাইজলা বিবির পাহারা তুলে দিয়েছেন। হাজিসাহেবের আর কোন ডর নাই। মাইজলা বিবি শোক করতে করতে আবার সেই গানটা গায়, সখি সখি গলায় দড়ি ওলো সখি ললিতে!

বড়বৌও তখন আশায় আশায় রাত জাগে। মানুষটা যেমন সহসা ফিরে আসে তেমনি আসবে। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠের দিকে তার অপলক দৃষ্টি। জ্যোৎস্না রাত বলে অনেক দূর সে অস্পষ্ট কিছু দেখার চেষ্টা করে। মেঝেতে ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ এখন ঘুমুচ্ছে। ওরা জানে বৌদি ঘুমাবে না। ওদের রাতের হবিষ্যান্ন করিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আলাদা পাথরে দাদার জন্য সব রেখে দিয়েছে। তিনি ফিরে না এলে সকালবেলা সবাইকে হাতে হাতে বিলিয়ে দেবে সব। সোনাকে দিতে পারে না। ওর অসুখ এখনও নিরাময় হয় নি। বড়বৌ বলে রেখেছে সোনাকে, ওর অসুখ নিরাময় হলেই, সে অসুখের যে কদিন যা কিছু খেতে পায় নি সব তাকে খাওয়াবে। সোনা সেজন্য সকালে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে দেখতে পায় জেঠিমা পাগল জ্যাঠামশায়ের জন্য যা রেখেছিলেন, যেমন নারকেল, বাঙ্গি, কমলা, তরমুজ সব হাতে হাতে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন। ওকে ছুটো একটা কমলার কোয়া দিয়ে যান। সোনা চাদরের নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। ওর শুধু রসটা খাবার কথা। কিন্তু সে চুরি করে সবটাই খেয়ে ফেলে।

জেঠিমা কাছে এলেই ওর কেবল জানতে ইচ্ছা হয়, জ্যাঠামশাইকে কে কে খুঁজতে বের হয়েছে।

ঈশম কাজের ফাঁকে দিনমান খুঁজছে। সে বস্তুত সময়ই পাচ্ছে না। আত্মীয়-কুটুম সব একে একে চলে আসছে। ওদের থাকবার জন্য বাঁশ পুঁতে বড় বড় লম্বা চালা ঘর তুলতে হচ্ছে। চোয়াড়ি হবে। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। দান

ধ্যান হবে সামান্য। পরগনার যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব নিমন্ত্রিত হবে। সুতরাং ঈশম বলতে গেলে সময়ই দিতে পারছে না। কেবল সকালের দিকে শশিভূষণ লাঠি হাতে বের হয়েছিল। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের ডেকে বলেছিল, তোরা খবর দিতে পারিস কিনা দেখ। পাগল কর্তা নিখোঁজ। তা তিনি তো এমনই ছিলেন। না বলে না কয়ে বের হয়ে যান। ছু চার দিন পরে ফিরে আসেন। কখনও দশ পনের দিনও হয়ে যায়। একবার মাসাধিককাল কোন খোঁজ ছিল না। তবু চিন্তার কারণ। আজ বাদে কাল বুড়ো কর্তার এত বড় কাজ! তখন মানুষটা কাছে থাকবে না কি করে হয়। তোরা খোঁজ নিতে পারিস কিনা ছাখ।

মাস্টারমশাইকে খুশী করার জন্য সবারই ভীষণ উৎসাহ। ওরা ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে মাঠে মাঠে এমন কি যত ঝোপজঙ্গল আছে সেখানে খুঁজে খুঁজে দেখেছে। এবং ছু ক্রোশের মতো পথ হেঁটে কেউ কেউ খবর দিতে এসেছে, স্যর পাইলাম না। কোনখানে নাই। ওরা এলে বড় বৌদিকে শশিভূষণ ডাকল, বলল, জানেন বৌদি ওর নাম করুণা। ওদের বাড়ি ব্রাহ্মন্দী। ওকে খুঁজে দেখতে বলেছিলাম।

—তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

—রায়বাড়ির। আমি অর্জুন রায়ের ছেলে।

শশিভূষণ বলল, সবাইকে বলেছি। আমার তো ছাত্র কম নয়। কিরে তুই!

—আমি স্যর খবর দিতে আসলাম। আমার বা'জি কইল, কেউ দেখে নাই এমন মানুষ।

বড়বৌ বলল, তখন খুব কুয়াশা করেছিল।

—আমার চাচারা মাঠে আছিল। ওদিক দিয়া গ্যালে এমন মানুষ নজরে না আইসা যায়!

—ওর নাম আবতুল, বৌদি।

বড়বৌ ওদের ছুজনকেই দেখল। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছে। আবছুল সোনার সঙ্গে পড়ে। বয়স খুব বেশি নয়। তবু ছুটে এসেছে মাস্টারমশাইকে খবর দিতে। বড়বৌ বলল, তোমরা কাল আসবে। আমার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ। কাল তোমরা খাবে। আমি ওঁর হয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণ করলাম।

তারপর শশিভূষণ বলল, কিরে তুই! কি খবর। তোদের গাঁয়ের পাশে যে বড় গজারি বন আছে সেখানে খুঁজেছিস।

—সব খুঁইজা দেখছি। কেউ খবর দিতে পারে নাই স্তর। সবাই কয়—এমন মানুষ হাঁইটা গেলে না চিনে কে! তাইন আমাদের দিকে যায় নাই। কেউ দেখে নাই।

সবাই একই খবর দিয়ে গেল। আবদুল আবার সময় বলল, সোনা কৈ! তার নাকি অসুখ হইছে স্তর।

—দেখা করবি? যা ভিতর বাড়িতে যা।

আবদুল খুব সন্তর্পণে এমন বড় বাড়ির ভিতর ঢুকে বলল, কি ঠাকুর অসুখ হইছে তোমার।

—তুই! তুই যে!

—আমি বুঝি কিছু খবর নিয়া আসতে পারি না।

সোনা বলল, কি খবর!

—মাস্টারমশয় পাগল কর্তারে খুঁইজা আনতে কইছিল।

—পাইলি? সোনার মুখ ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাল।

—না পাইলাম না। কত খোঁজলাম।

সোনাকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কাতর সে। অসুখে ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। কথা বলতেও ওর কষ্ট হচ্ছিল। তবু বলল, আমার মনে হয় মাস্টারমশয় ঠিক কইছে। তাইন উচ্চ একটা টিবিতে বসে আছেন। নামতে পারছেন না। তোদের বাড়ির পাশে কোন টিলা আছে?

আবদুল ওর লুঙ্গি দিয়ে মুখ মুছে কিছুক্ষণ কি ভাবল। গরমে সে ঘেমে গেছে। সোনা ওকে বসতে বলতে পর্যন্ত পারছে না। এই বারান্দায় আবদুল উঠলে সব অশুচি হয়ে যাবে। আবদুল এটা টের পায় বলেই ওপরে উঠছে না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওর শরীরে এসে রোদ পড়েছে। সামনে এমন একটা জায়গা নেই যে ছায়া ছায়া ভাব, যেখানে দাঁড়িয়ে আবদুল কথা বলতে পারে, ঘামতে হয় না। সোনার বড় অস্বস্তি লাগছিল।

কিন্তু আবদুলের ওসব খেয়াল নেই। সে সোনার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কার কার বাড়ি, কোন মাঠে, অথবা গাছের ডালে ডালে যদি তিনি বসে থাকেন সে সারা বিকেল তার চারপাশে যতকিছু আছে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। এবং বা'জিকে বলে সে ছুটে এসেছে খবর দিতে, না পাওয়া গেল না।

সোনা বলল, আমি ভাল হলে খুঁজতে বের হব। ঠিক তাঁকে পেয়ে যাব দেখবি।

আবদুল বলল, আমারে সঙ্গে নিবা।

সোনা এখন আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলে আবদুলই বলল, কাইল দই চিড়া খাইতে আইতাছি। তোমার জেঠিমা খাইতে কইছে।

সোনা যেন এতক্ষণে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। সে বলল, ঠিক আসবি কিন্তু। তা নাহলে জেঠিমা খুব কষ্ট পাইব।

আবদুল আর কিছু বলল না। ওর চারপাশে ছোট ছোট কাচ্চাবাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ছুঁয়ে দেবে বলে সে বলল, যাই ঠাকুর। কারণ সে জানে, ওর আর বয়স কত, তবু জেনে ফেলেছে সে এই ছোট ছোট শিশুদের ছুঁতে পারে না। কি সব সুন্দর ডল পুতুলের মতো মুখ। ওর এইসব শিশুদের বড় আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। বিশেষ করে সোনার ছোট বোন ছবিকে। ফ্রক গায়ে, ববকাটা চুলে ঢলঢল মুখে আবদুলকে দেখছিল আর সোনার দিকে তাকিয়ে বলছিল, দাদা ও তোমার স্কুলে পড়ে! তোমার বন্ধু! কতটুকু মেয়ে, কি সুন্দর কথা বলছিল।

সোনা বলল, আমার ছোট বোন ছবি।

আবদুল বলল, কি গ বইন আমার কোলে উঠবা? বলেই সে আবার কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। বলল, নারে ঠাকুর যাই। বেলা বাড়ছে। বাড়ি তাড়াতাড়ি না ফিরলে চিন্তা করব।

—কিছু খাইলি না?

বড় জেঠিমাকে সে ডেকে বলল, অরে কিছু খাইতে দ্যান। কতদূর থাইকা আইছে।

ছিঃ ছিঃ কি যে ভুল হয়ে গেল। বড়বৌ তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে ছুটে গিয়ে শশিভূষণকে বলল, ওদের একটু খেতে দিচ্ছি, ওদের বসতে বলুন, ওরা কতদূর থেকে আসছে খবর দিতে।

আরও সব দলবল আসছিল। দুজন তিনজন একসঙ্গে। ওরা এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কারণ কেউ কোন খবর আনতে পারে নি। পাঁচ দশ ক্রোশ জুড়ে যে অঞ্চল, যে অঞ্চলে পাগল মানুষ সবার কাছে পীরের মতো অথবা তিনি যখন হেঁটে যান, পুণ্যবান মানুষেরা ভাবে ধরণী ক্রমে শীতল হচ্ছে, কোন দুঃখ আর জেগে থাকবে না। সেই পয়মন্ত হাতির মতো,

লক্ষ্মীরূপা, করুণা বর্ষণ করবেন তিনি। পাগল মানুষ হেঁটে গেলেই সবাই এমন টের পেয়ে যায়।

বড়বৌ সব ছাত্রদের জন্য দু কাঠা মুড়ি বের করে দিল। নারকেল কোরা করে দিল এক গামলা। আর এক হাঁড়ি গুড় বের করে দিল। প্রায় বাল্য-ভোগের মতো ব্যাপারটা দাঁড়াল। ওদের বার-বাড়িতে ডালায় ডালায় সাজিয়ে দিল। লালটু-পলটু এসেছে। ওরাও ছুটে গেছে, এবং জল, যা ওরা চাইছে এনে দিচ্ছে। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, কোথায় যে গেলেন তিনি!

শশিভূষণ বলল, সকালে বড়বৌদি দেখেছে তিনি দরজার পাশে বসে আছেন। তারপর এত মানুষের চোখে ধূলা দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশে গেলেন!

বড়বৌ সব শুনেও কোন কথা বলছে না। যখন গেছেন আবার ফিরে আসবেন। যে-বারে হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশে গেলেন, কেউ এসে কোন খবর দিতে পারে নি। অথচ এক বিকেলে সোনা এসে খবর দিয়েছিল হাতিটা উঠে আসছে। সব মানুষেরা এসে জড় হয়েছিল অর্জুন গাছটার নিচে। আশ্বিনের কুকুর ঘেউঘেউ করে ডাকছে। একবার হাতিটার দিকে ছুটে যাচ্ছে আবার উঠে আসছে বাড়িতে। প্রথমে হাতিটা বিন্দুবৎ ছিল। চোখের নজরে আসে না। এত বড় মাঠের ওপারে কড়া রোদের ভিতর একটা বিন্দু ক্রমে বড় হচ্ছিল, হতে-হতে কখন যে হাতি হয়ে গেল।

সুতরাং যেন এ-বাড়িতে একজন মানুষ এই অসময়ে নিরুদ্দেশে গেছেন বলেই যা কষ্ট। এবং এত খোঁজাখুঁজি। অন্য সময় হলে কেউ এত ভাবত না। বড়বৌ জেগে থাকত শুধু। যেমন সে প্রতিবার জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কখনও-কখনও কিছু চিঠি, বিয়ের পরই যে-বার মণীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে কিছু চিঠি দিয়েছিল বড়বৌকে সেই সব চিঠি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়ে। পড়তে-পড়তে কোন-কোন দিন রাত কাবার করে দেয়। বড়বৌর এতটুকু কষ্ট হয় না তখন।

তিনি আসবেন। ফিরে আসবেন। কাজের বাড়ি। এখন আর এ-নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুধু এমন একটা দিনে তিনি বাড়ি নেই ভেবে ভেতরটা বড়বৌর ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

শশিভূষণ পরদিন সকালে-সকালে স্নান করল। ওর কাজ শুধু আপ্যায়ন। সবাই এসে এ-সংসারে যার খোঁজ প্রথমে করে—সে মণীন্দ্রনাথ। শশিভূষণ সকাল

থেকেই টের পাচ্ছিল, একটা কথাই তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার বলতে হবে। না তিনি বাড়ি নেই। নিরুদ্দেশে গেছেন। যেমন যান মাঝে-মাঝে তেমনি গেছেন।

এবং এই এক প্রশ্নের উত্তর সারাদিন ওকে দিয়ে যেতে হবে।

—কখন গেলেন?

—সকালের দিকে।

—কেউ দেখে নি কোন দিকে গেছেন?

—না। কুয়াশা ছিল।

—এদিকে জানতাম তিনি বাড়িতেই থাকতেন। বেশি দূরে যেতেন না।

—যেতেন না।

—অন্য কিছু কি হয়েছিল?

—অন্য কিছু কি আর হবে। তবে পাগল মানুষ তো আর শ্রাদ্ধে বসতে পারবেন না। বুড়ো কর্তা মেজ ছেলেকে শ্রাদ্ধের মালিক করে গেছেন।

—পাগল মানুষ কাছে ছিলেন তখন?

—তা ছিলেন।

—এই তো গণ্ডগোলের ব্যাপার। উনি তো পাগল বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা ছিলেন না। সব বুঝতেন। হয়তো খুব কষ্ট হয়েছে মনে।

—হয়তো তাই।

—শুনেছি সংসারে এই বুড়ো মানুষটার ওপরই যত রাগ ছিল।

—তাও শোনা যায়।

—হয়তো সে-জন্য শ্রাদ্ধে বাড়ি থাকলেন না। অভিমান করে দূরে সরে রয়েছেন। সব কাজকাম চুকে গেলেই আবার বাড়ি ফিরে আসবেন।

—আমারও তাই মনে হয়।

কোনরকমে দায়সারা উত্তর দিয়ে আবার যারা গোপাট ধরে উঠে আসছেন তাঁদের দিকে ছুটে যাওয়া।

—কবে বের হয়ে গেলেন।

—বুড়ো কর্তা মারা গেলেন রাতে। সারাদিন সবার সঙ্গে শ্মশানেই ছিলেন। বিকেলের দিকে দাহ শেষ। রাতে সোনার ভীষণ ভয় পেয়ে জর। তিনি সারা রাত ঘরের পৈঠায় বসে। ভোরের দিকে বড়বৌদি দেখেন, নেই। পলটু

খুঁজতে গেল, লালটু গেল। কাছে কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি জবাব শেষ করতে হবে। কারণ বোধ হয় পাঁচদোনার বড় শরিকের ছোটকর্তা দলবল নিয়ে উঠে আসছে।

—মণি এখন কেমন আছে?

—ভাল আছে।

—ডাকেন একবার মণিরে দেখি।

—উনি বাড়ি নেই। এদিকে আসুন। ফরাস পাতা লম্বা চালাঘরে।

—না, এখানে বসব না।

—ঈশম, ঈশম এদিকে এস। ওঁদের নিয়ে যাও। যেখানে শ্রাদ্ধ হচ্ছে সেখানে ওঁদের নিয়ে যাও। চোয়াড়ির পাশে চেয়ার পেতে দাও।

—মহাভারত কে পড়ছে?

—সূর্যকান্ত।

—মহামহোপাধ্যায় সূর্যকান্ত। না কাঠালিয়ার সূর্যকান্ত।

—মহামহোপাধ্যায় সূর্যকান্ত।

ঈশম ষাঁড় বাছুর নিয়ে যাচ্ছে বৃষকাঠে ষাঁড়টা সে বেঁধে রাখবে। সে কাছে এসে বলল, আসেন কর্তা।

—যাক বাঁচা গেল। আবার দখিনের মাঠে সারি-সারি মানুষ। ওরা কারা। শশিভূষণ কপালে হাত তুলে, দূরের মানুষ লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। সে এ-অঞ্চলে চার-পাঁচ বছরের ওপর রয়েছে। নানা কারণে এ-অঞ্চলের মানুষেরা তার কাছে এসেছে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যাপারেই ওরা আসত। সে প্রায় সবাইকেই চেনে। হাতে মোটামুটি সবার একটা লিস্ট আছে। লোকজন খাবে প্রায় হাজার হবে। তারপর আছে অলিক ভোজন। গরীব-দুঃখী মানুষেরা এখনও উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা গোপাটে সারি-সারি মাদার গাছের নিচে কলাপাতা কেটে বসে রয়েছে। কর্তাবাবুদের খাওয়া হলে ওরা খাবে।

শশিভূষণ বলল, ভিতরে যান।

যাদের ভিতরে পাঠাবার সে তাদের ভিতরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যারা ফরাসে বসবে সে তাদের ফরাসে বসাচ্ছে। যাদের দাঁড়িয়ে থাকার কথা, সে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখল।

শশিভূষণও সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিল। বসার বিন্দুমাত্র সময় পায় নি।

সকাল থেকে দই-ক্ষীরের ভাঁড় আসছে-তো-আসছেই। সার বেঁধে ঠিক, সেই পালকি কাঁধে বেহারা যায় হুঁ হোম না—তেমনি ওরা দই অথবা ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে সারি সারি চলে আসছে। শশিভূষণ বার-বাড়িতে দাঁড়িয়ে লাঠি তুলে ইশারা করছে শুধু। কোথায় গিয়ে নামানো হবে সে দেখিয়ে দিচ্ছে।

শ্যামাজ্যাঠা এসেছেন লাধুরচর থেকে। তিনি এসেই প্রথম খবরটা দিলেন। বললেন, চন্দ্রনাথের মেলায় ত্রিকূট পাহাড়ের নিচে পাগল ঠাকুরকে কারা দেখে এসেছে! গৈরিক বসন পরনে। একটা বড় বটগাছের নিচে তিনি বসে রয়েছেন। সামনে ধুনি জ্বলছে। পাশে কীর্তন করছে কিছু লোক। যে দেখেছে সে কাছে যেতে পারে নি। তাকে যেতে দেওয়া হয় নি। সে দূরে দাঁড়িয়ে প্রণিপাত সেরেছে।

একটু থেমে শ্যামাজ্যাঠা বললেন, সে ভেবেছিল এসেই খবর দেবে তোমাদের। ফাল্গুন মাসের মেলায় সে যেতে পারে নি। পরে তীর্থ করতে বের হয়ে ফেরার পথে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গেছে। লোকজনের ভিড় কমে নি। কিছু সাধুসজ্জন ব্যক্তি তখনও গাছের নিচে কুটির বানিয়ে বসে আছে।

শশিভূষণ বলল, সে কবে ফিরে এসেছে।

—কাইল ফিরা আইছে।

—ওর নাম কি?

—তারে আমি চিনি না। আমাদের গাঁয়ে মহাদেব সাহা আছে, ও শুইনা আইছে।

শশিভূষণ বলল, ঠিক দেখেছে তো?

—না দেখলে কয়? মণির মতই হুবহু দেখতে।

—কবে দেখেছে?

—চাইর-পাঁচ দিন আগে। কাইল আইছে। মণি কত জায়গায় যায় গিয়া, এবারে হয়তো চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চইলা গেল।

কথাটা মুহূর্তে সাড়াবাড়ি রটে গেল। বড়বৌ শুনে মাথার ঘোমটা আরও টেনে শ্যামাজ্যাঠার সামনে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল।

শ্যামাজ্যাঠা বলল, ভাল আছ বৌমা!

মাথায় ঘোমটা বড়বৌর। কথা বলতে পারছে না। শুধু মাথা সামান্য নিচু করে রাখল। এ-সবই ভাল থাকার কথা। তবু বলতে হয় বলে যেন

বলা, মণি ত আর মানুষ না বৌমা। মনুষ্যকুলে দেবতার জন্ম। সে কেন তোমার ঘরে আটকা থাকব।

বড়বৌ এবার লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, অত দূরে তো উনি কখনও যেতেন না।

—গেল। ইচ্ছা হইল, চইলা গেল।

বড়বৌ জানে, সে না ফিরে পারবে না। যেখানে যত পাহাড়-পর্বত থাকুক, দেবতার নির্দেশ থাকুক, সন্ত মানুষের আড্ডা থাকুক, মানুষটা যখনই বড়বৌর মুখ, চোখের ওপর দেখে ফেলবে তখনই সব ফেলে ফিরে আসবে।

বড়বৌ বলল, একবার ভাল করে খোঁজ নিলে হত না।

—আমি কাইল মহাদেবেরে নিয়া যামু ভাবছি। নিজের কানে না শুনলে মন মানব ক্যান। পরশু তোমারে খবর দিয়া যামু।

ভূপেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ সবাই জড় হয়ে বলল, ঈশম যাউক খবর আনতে। আপনে মহাদেবরে একটা চিঠি লিখা দ্যান। একেবারে য্যান খবর ঠিক পাইলে নারাণগঞ্জে চইলা যায়। সেখান থেকে চাঁটগাঁ মেলে। এসব কাজে দেরি করা ভাল না। তাইন ত এক জায়গায় বেশি দিন থাকেন না।

শশিভূষণ বলল, ঈশমের পক্ষে এ-কাজ একা করা কঠিন। বরং আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

শচীন্দ্রনাথ বলল, তবে ত খুব ভাল হয়।

এমন সময় লালটু এসে খবর দিল, শশিভূষণকে, জেঠিমা আপনারে ডাকে।

—বল যাচ্ছি। সে এই বলে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেল। বেতের একটা বড় লাঠি আছে ঘরে। কবে একবার ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের মেলায় গিয়েছিল, মোটা হলুদ রঙের বাঁকানো লাঠি নিয়ে এসেছিল এক আঁটি। শশিভূষণ পছন্দ মতো একটা চন্দ্রনাথের লাঠি নিয়ে রেখেছিল। যাবার সময় এটা সঙ্গে নেবে ভাবল। কিন্তু লাঠিটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখার জন্য দক্ষিণের ঘরে ঢুকতেই দেখল, বড়বৌ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনি যাচ্ছেন?

—ঈশম এত কথা বলতে পারবে না। আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, ওঁর হাতে কিছু কালো-কালো দাগ আছে; তা সে দেখেছে কিনা।

—কালো দাগ!

—কেন, লক্ষ্য করেন নি।

—না তো?

—হাত কামড়ে ফালা-ফালা করে ফেলত এক সময়। হাতে সে সব বড়-বড় দাগ আছে। সব মিলে গেলেও ওটা দেখে নেবেন।

শশিভূষণ বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। পেলে একেবারে ধরে নিয়ে আসব। আপনি কান্নাকাটি করবেন না।

—না রে ভাই। আমার কান্নাকাটি কবেই শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এখন শুধু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি মানুষটার জন্য আর কাঁদি না। তারপরই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে-যেতে বলল, ধনকে বলছি আপনাদের খাবার দিতে। আপনারা খেয়ে নিন।

সোনা দেখল বড়জেঠিমা লম্বা-ঘোমটা টেনে ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ এ-বাড়িতে এসেছে যিনি জেঠিমার গুরুজন। যার মতো লম্বা ঘোমটা বড় জেঠিমাকে দিতে দেখে ভারি কৌতূহল হল সোনার। সে ডাকল, জেঠিমা।

—এখন ডাকে না বাবা। কত কাজ। তোর জ্যাঠামশাইকে আনতে যাচ্ছে মাস্টারমশাই। ওঁদের এখন খাবার দিতে হবে। তোর মা কোথায় রে?

জ্যাঠামশাই এত দূরে যেতে পারেন ওদের ফেলে—সোনার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে বলল, মা কোথায় জানি না জেঠিমা। আমার খিদে পেয়েছে। খাব। কেউ আমাকে খেতে দিচ্ছে না।

বড়বৌ জানে সোনা কি খেতে চায়। দই-ক্ষীর খেতে চায়। বড় অভাগা মনে হয় সোনাকে। সে দই-ক্ষীর কিছু খেতে পাবে না। সে-ঝোল-ভাত খাবে। সকালে হেলাঞ্চার ঝোল দিয়ে ভাত দেওয়া হয়েছে। ওর খিদেটা চোখের খিদা। সে জেঠিমার কাছেই একটু যা অনিয়ম করার অধিকার পায়। বড়বৌ তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা-ওটা খেতে দেয়। আজ সে একটু মুড়ি দিয়ে ক্ষীর খাবে। সবাই যেমন খাচ্ছে। কিন্তু তাকে কে দেয়। বাড়িতে উৎসব হলেই ওর কিছু-না-কিছু অসুখ হয়। সে তখন চুপচাপ বসে থাকে। কখন জেঠিমা আসবে অপেক্ষায় থাকে। জেঠিমা এলেই যেন সে খেতে পাবে।

বড়বৌ বলল, না বাবা, আজ খাবে না। আজ তোমাকে আমি কিছু দেব না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। বলেছি তো ভাল হলে সব পাবে।

তবু সোনা ঘ্যানঘ্যান করছে দেখে বড়বৌ আর দাঁড়াল না। বড্ড খাই-খাই হয়েছে সোনার। সে এতটা দায়িত্ব নিতে পারছে না। ক্ষীর-দই দু-ই সোনার পক্ষে অপকারক। সুতরাং সে আর দাঁড়াল না। ধনকে খোজার জন্য বড় ঘরে উঁকি দিল।

আর তখনই সোনা অবাক চোখে দেখল ফতিমা আস্তে আস্তে এদিকে পা টিপে-টিপে আসছে। ওর নানী আসছে লাঠি ভর দিয়ে। ওর নানী সোজা হতে পারে না। একেবারে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। বুড়োকর্তার কাজকাম হচ্ছে, মানুষজন খাবে, সামসুদ্দিনের মা কিছুতেই বাড়িতে বসে থাকতে পারছিল না। অলিজান বার-বার বলেছে, আপনে, এই শরীর নিয়া যাইবেন কি কইরা।

—যামু, ঠিক চইলা যামু। সে ফতিমাকে বলল, বইন, আমার লগে ল।

ফতিমা এসেছে গতকাল। ওদের গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে কবে। কথা ছিল আসবে না। কিন্তু ফতিমা বাড়ি আসার জন্য কান্নাকাটি করেছে; নানীকে দেখার ইচ্ছে ওর যে কত। বস্তুত ফতিমার সেই বাবুটির জন্য বড় মায়া। সে যত বড় হচ্ছে, বাবুটির জন্য কেমন এক কোমল ভালবাসা বুকের ভিতর গড়ে উঠছে। সে নিজেও বুঝতে পারে না, মাঝে-মাঝে তার বাড়ি ফিরে আসতে এত ইচ্ছা হয় কেন, শহর ভাল লাগে না কেন। কতক্ষণে সে রেলগাড়িতে চড়ে নারাণগঞ্জে চলে আসবে। তারপর স্টিমারে বারদী এবং তিন ক্রোশের মতো পথ হেঁটে আসতে হয়। ওর তখন যেন পথ ফুরায় না। চারপাশের গাছপালা পাখি ফেলে সে ছুটে আসে, আসতে-আসতে যখন সেই অর্জুন গাছটা দেখতে পায় তখন সে ছুটতে থাকে। এবারেই প্রথম সে ছুটতে পারছে না। সে যে বড় হয়ে যাচ্ছে, সে যে ফতিমা, শাড়ি পরেছে সুন্দর করে, কপালে কাঁচের টিপ, দুই বিনুনি বাঁধা মেয়ে, একেবারে কচি কলাপাতা রঙের, যেন সবুজ ধান্য অবুঝ হয়ে আছে। সে ধীরে-ধীরে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরছে। সকালে সে পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে, সোনাবাবুকে অর্জুন গাছের নিচে দেখা যায় কিনা। দেখলেই সে মাঠে নেমে আসত কিছুটা। হাত তুলে ইশারা করত। তারপর সেই গাঁয়ের ছোট্ট নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু গল্প করা। কি যে এত গল্প, ফতিমা নিজেও বোঝে না। ঢাকা শহরে সোনা কবে যাবে মাঝে-মাঝে এমন বললে, সোনা চুপ করে থাকে, কবে সে যেতে পাবে জানে না! ফতিমার দুঃখ, বার-বার এক দুঃখের প্রকাশ, ওর একা-একা ভাল

লাগে না। সে একদিন স্বপ্ন দেখেছে, বড় একটা টিবির মাথায় সে, সোনা, এবং পাগল জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন।

ফতিমাকে দেখেই সোনার মনে হল ফতিমা ঠিক অমলা পিসির মতো বড় হয়ে গেছে। সে আর সোজা তাকাতে পারছে না।

সোনা বলল, ফতিমা, তুই বড় হয়ে গেছিস!

—যান। ফতিমা ফিক করে হেসে ফেলল।

—হাঁরে, দিদিকে বলে দেখ। সোনা সামসুদ্দিনের মাকে সাক্ষী মানল।

ফতিমা ওসব কথায় গেল না। বলল, আপনের অসুখ! কি হইছে সোনা-বাবু? আপনারে দেখতে আইছি।

—জর। টাইফয়েডের মতো হয়েছিল।

—আপনি বড় রোগা হয়ে গেছেন।

—তাই বুঝি! তুই কতদিন থাকবি?

—বা'জি কইছে দুই-চার দিন পর আসব।

—তুই তখন চলে যাবি?

—পাগল। আমি কমু অসুখ হইছে আমার। যামু না। বলেই আবার বোকার মতো ফিক করে হেসে দিল।

—তোদের পরীক্ষা হয়ে গেছে?

—হবে। স্কুল খুললেই হবে।

—ইংরেজিতে কত পেয়েছিস?

—বাষট্টি।

অন্যান্য বিষয়ের কথাও সে বলল। প্রায় যেন এখন সোনা ওর সমবয়সী নয়। অনেক বড়। আর ফতিমাও ছোট্ট মেয়ের মতো জবাব দিয়ে যাচ্ছে। কোন কুণ্ঠা নেই। বস্তুত ফতিমা বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলেই খুশি।

সোনা বলল, আরবিতে কত পেয়েছিস?

—আমি সংস্কৃত নিয়ে পড়ছি সোনাবাবু।

—কত পেলি?

—আটানব্বই।

—বলিস কি!

—আমি ফার্স্ট হয়েছি সোনাবাবু। বা'জি আমারে এই শাড়িটা কিনা দিছিল। বা'জি কইল তুই কি নিবি ফতিমা, কি চাই? ফার্স্ট হইলে তরে

যে কইছিলাম কিছু দিমু। আমি কইলাম, আমাকে একটা শাড়ি কিনা দিবেন। আমি শাড়ি পরমু। এই শাড়িটা পইরা আইছি। আমারে ভাল লাগছে না দেখতে! বলে কেমন এক শিশু-সরল মুখ নিয়ে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন সে বাবুকে খুশি করার জন্য শাড়ি পরে এসেছে! খুশি করার জন্য ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে।

সোনা বলল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ফতিমা। তুই দেখছি আস্তে-আস্তে জেঠিমার মতো কথা বলতে শিখে যাচ্ছিস। তোকে দেখতে অমলাপিসির মতো লাগছে। বলেই সোনার মন হল শহরে থাকলে বুঝি সবাই অমলা-পিসির মতো হয়ে যায়। ফতিমাও হয়ে গেছে। সে তো এখন কত কিছু জেনে ফেলেছে। সে বলল, আমি ভাল হলে একদিন তোদের বাড়ি যাব। তারপর তুই আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে বের হব।

—জ্যাঠামশাই বাড়ি নাই?

—না।

—সোনাবাবু, আপনি কবে ভাল হবেন? মা চলে যাবে। বা'জি এসে মাকে নিয়ে যাবে। নানীকে বলে আমি থেকে যাব। আপনি কবে ভাল হবেন? আমি ঠিক যাব। কেউ টের পাবে না।

সোনা চুপ করে থাকল। মা এদিকে আসছে। মা এসেই বলল, কি রে ফতিমা, তুই! তোর দিদি! বস। তুই কত বড় হইয়া গ্যাছস। কি গ পিসি, তোমার নাতিন ফুলপরী সাইজা আইছে দেখছি।

—ভাবছি, আপনেগ বাড়ি রাইখা যামু নাতিনরে। তাই ফুলপরী সাজাইয়া আনছি। কি গ সোনাবাবু, পছন্দ লাগে?

সোনা বলল, মারব তোমাকে বলে দিচ্ছি দিদি।

ধনবৌ বলল, কি কও সোনা। এমন কথা কইতে নাই।

—তবে দিদি আমারে ক্ষ্যাপায় ক্যান।

এত সব কথায় ফতিমা ভারি লজ্জা পাচ্ছিল। সে মাথা নিচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ফতিমা সোনাবাবুর দিকে আর কিছুতেই তাকাতে পারছে না। তাকালেই যেন সে সোনাবাবুর কাছে ধরা পড়ে যাবে। সে যে সবুজ ধান্য অবুঝ হয়ে আছে, তা ধরে ফেলবে সোনাবাবু।

দিন-দশেক পর শশিভূষণ এবং ঈশম ফিরে এল। ওরা মহাদেব সাহার লোককে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এত বড় মানুষকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজতে যাওয়া ভাগ্যের কথা। ওরা এসে খবর দিল, না, পাওয়া গেল না।

বড়বৌ, শচীন্দ্রনাথ, এমন কি বাড়ির সবাই, ওরা ফিরে আসছে দেখতে পেয়েই পুকুরপাড়ে নেমে গেল। সেখানেই শশিভূষণ সবাইকে বলল, না, তিনি সেখানে নেই। যাকে সন্দেহ করে খুঁজতে যাওয়া তিনি ছ-সাত দিন আগে কামাখ্যা দেবী দর্শনে চলে গেছেন।

—তিনি কে? বড়বৌ সহসা লোক-লজ্জার মাথা খেয়ে একদল লোকের সামনে এমন প্রশ্ন করে বসল।

—কেউ কিছু এমন খবর দিতে পারল না। বিশ্বনাথের মন্দিরে কিছু পাণ্ডাদের কথাটা বললাম। ওরা বলল, তিনি তো মৌনী-বাবা। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। প্রথম দিন এসেই পিপুল গাছের নিচে বসেছিলেন। ওঁর কি চেহারা! রাজপুরুষের মতো চেহারা। সংসারবৈরাগ্যে যেন তীর্থে চলে এসেছেন।

—ওঁর হাতে কোন কালো-কালো দাগ ছিল?

শশিভূষণ বলল, ওরা কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল ত্রিকূট পাহাড়ের নিচে তিনি চুপচাপ পিপুল গাছের নিচে বসে ছিলেন। পরনে যতদূর মনে পড়ে লাল-কাপড়।

শচীন্দ্রনাথ বলল, ওঁর গালে অশৌচের দাড়ি থাকার কথা।

—না, তেমন কোন অশৌচের দাড়ি ছিল না। মাথা মুণ্ডন করা। রাশি-রাশি লোক ওঁকে দেখেই ভিড় করেছিল। বোধ হয় তিনি এত মানুষের ভিড় দেখেই সেখান থেকে পালিয়েছেন।

—কিন্তু বললেন যে, কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছেন।

—ওটা ওদের অনুমান। কেউ কিছু ঠিক বলতে পারছে না।

সবাই বাড়ি উঠে এল। মানুষটার খোঁজ পাওয়া না গেলে যা হয়, বড়বৌ আবার সেই সংসারে কাজের ভিতর ডুবে গেল। তিনি ফিরে আসবেন। যখন নিরুদ্দেশে গেছেন তখন ফিরে আসবেন

তারপর এল ভূপেন্দ্রনাথ। সে সঙ্গে নিয়ে এল এক বড় তান্ত্রিক। তিনি নখের ওপর এক মায়া দর্পণ সৃষ্টি করবেন। তাতে মানুষটা কোথায় বসে আছে অথবা হাঁটছে দেখা যাবে। সবচেয়ে যে প্রিয় মানুষ তার নখে সবচেয়ে ভাল ছবি ফুটে ওঠে। সে আরও কিছু খবর নিয়ে এল এ সময়। দেশভাগের খবর। শরৎ বসু মশাই ময়মনসিং-এ মিটিং করে গেছেন। তিনি এই দেশভাগের বিরুদ্ধে। পণ্ডিতজী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল খুব এগিয়ে গেছেন। কেবল এখন মহাত্মাজীর ওপর সব নির্ভর করছে।

তান্ত্রিক থাকবেন দু'দিন। তাঁর খাদ্যদ্রব্যের বিরাট তালিকা। নিশি রাতে তিনি তন্ত্র আরাধনায় বসবেন। সুতরাং তন্ত্রাচারের যা-যা দরকার তার একটা ফর্দ করতে করতে বললেন, তবে মহাত্মাজী বাইচা থাকতে দেশভাগ হবার নয়। যা কিছু আশা এখন আমাদের তাঁর ওপর।

শশিভূষণ বলল, যেভাবে চারপাশে দাঙ্গা হচ্ছে, কি যে হয় কিছু বলা যায় না।

তান্ত্রিকমশাইর জটা খুলে দিলে মাটিতে এসে পড়ছে। সোনা, লালটু এবং শোভা আবু অথবা কিরণি এবং গ্রামের ছেলেরা ভয়ে আর ওদিকে যাচ্ছে না। চোখ বড়-বড়। টেপা কুলের মতো লম্বা চোখে কাজল এবং ভস্মমাখা শরীর। লাল রঙের আলখেল্লা এবং বড় কমণ্ডলু, হাতে ত্রিশূল। ওঁর মুখে বম-বম্ ভোলানাথ শব্দ। শশিভূষণের বড় রাগ হচ্ছিল। কারণ এই মানুষটা তার ঘরেই রাত কাটাবে আজ। ওর কেমন ভয় ধরে গেল প্রাণে। অথচ মুখে কিছুই বলতে পারছে না। ভূপেন্দ্রনাথের ওপর মনে-মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে। ভূপেন্দ্রনাথ যে দেশভাগের ব্যাপারে এত কথা বলে যাচ্ছে তার কথার আর একটাও জবাব দিচ্ছে না। দিলেই যেন বলতে হয়, এগুলো যে আপনার কি হয় করে! যত সব আজে-বাজে লোক ধরে আনা।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, বোঝলেন মাস্টারমশাই, এবারে ঠিক দাদার খোঁজ পাইয়া যামু।

শশিভূষণ একটা ইংরেজি বই পড়ছিল। সে সেটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। এখন নানা রকমের তিনি কথা বলবেন। এই জটাজুটধারী তান্ত্রিক মানুষ সম্পর্কে এমন ইমেজ তৈরি করবেন যে, সে আর বসে শুনতে পারবে না। মাথা তার গরম হয়ে যাবে। সে সেজন্য তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়ে গোপাটের দিকে বের হয়ে গেল।

—একেবারে ম্লেচ্ছ। লেখাপড়া শিখলে এই হয়। যেন ভূপেন্দ্রনাথের এমন বলার ইচ্ছা।

তান্ত্রিকের কথামতো বড়বৌ সকাল-সকাল স্নান করেছে। হোমের বিবিধ-ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়েছে। লালপেড়ে শাড়ি এবং কপালে বড়বৌ আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে। তাকে সেই মানুষের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।···হোমের নানাবিধ আচারের পর বড়বৌর নখে ঘি মেখে আগুনের ওপর কিছুক্ষণ ধরে তিনি বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছেন মা?

—না।

—ভাল করে দেখুন।

—না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

খুব গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠলেন, ভাল করে দেখুন। দর্পণের উত্তর দিকটায় ছায়ামতো কিছু ভেসে উঠছে কিনা দেখুন।

সবাই গোল হয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনে সব গ্রামের লোক ভেঙে পড়ছে। বড়বৌ ঘামছে। রোদ এসে ওর কপালে পড়েছে। সিঁদুর গলে গিয়ে সারা মুখ লাল। বড়বৌ কাঁপছিল। দেখতে পাচ্ছেন?

—দেখতে পাচ্ছি।

—কি দেখতে পাচ্ছেন?

—তিনি হেঁটে যাচ্ছেন।

—কোন দিকে?

—উত্তরের দিকে।

—তারপর কি দেখছেন?

—একটা গাছের নিচে বসলেন।

—এখন কি করছেন?

—কিছু না।

—কিছু দেখতে পাচ্ছেন আর?

—কিছুই না। হ্যাঁ, একটা আমবাগান মনে হচ্ছে।

—আর কিছু?

—চারপাশে কত লোক বসে রয়েছে।

—আর কিছু?

—সবাই ওঁর কাছে কিছু চাইছে।

—কাউকে কিছু বলছেন না?

—না।

—এবারে দর্পণের পশ্চিম দিকে তাকান। কেউ ওর দিকে হেঁটে আসছে মনে হয় না?

—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

—সে কে?

—আপনার মতো মুখ।

—না-না, আমার মতো মুখ হবে কেন? ভাল করে দেখুন।

বড়বৌ কিছু আর বলতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সবাই ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে শুইয়ে রাখল।

সোনার মনে হল, এক লাথি মারে সবকিছুতে! সে খুব সন্তর্পণে ভিড়ের ভিতর থেকে ওর কমণ্ডলু চুরি করে নিয়ে ঘাটের জলে লুকিয়ে রাখল। খোঁজ এবার। দেখাও বাবু তোমার কত হিম্মৎ, নিরুদ্দেশে গেছে কমণ্ডলু। বের কর খুঁজে।

বিকেলের দিকে কমণ্ডলু খুঁজতে গিয়ে তান্ত্রিক মানুষ দেখে ওটা ওর থলের ভিতর নেই। কে নিল! সারা বাড়ি হৈচৈ খোঁজা খুঁজি। সারা বাড়িতে কেউ বলতে পারল না কমণ্ডলু হেঁটে-হেঁটে কোথায় চলে গেছে। সোনা বলল, আমি বলতে পারি মাস্টারমশাই।

—কোথায়?

—দাঁড়ান। বলে সে নিজের নখ নিজে দেখে বলল, মনে হয় কমণ্ডলু হেঁটে যাচ্ছে।

—কোনদিকে?

—পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে।

—তারপর

—টুপ। জলে ডুবে গেল।

মাস্টারমশাই এবং সোনা উভয়ে হেসে উঠল। যা, বের করে দিয়ে আয়। নয়তো আবার তোকে ছোটকর্তা মারবে।

সোনা বলল, আমার একা যেতে ভয় লাগে।

—কোথায় ডুবিয়ে রেখেছিস?

—আমগাছটার গোড়ায় যে ঘাট তার ডান দিকে শ্যাওলার নিচে।

শশিভূষণ কমণ্ডলু তুলে এনে তান্ত্রিকমশাইর সামনে রেখে চুপি-চুপি বলল, ওটা হেঁটে যাচ্ছিল।

—কোন দিকে?

—ঘাটের দিকে। ধরে এনেছি।

তান্ত্রিক মানুষটি টের পেয়ে মুখ গম্ভীর করে ফেলল।

শশিভূষণ বলল, এবারে ভাগেন কর্তা। অনেক তো দেখালেন মজা আর মজা দেখাতে হবে না।

পরদিন সকালে সবাই দেখল মানুষটি নেই। দুপুররাতে চলে গেছে কাউকে না বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ ভয় পেয়ে গেল। কোথায় কি অনিয়ম হয়েছে, তিনি রেগে গেলেন। তিনি না বলে চলে গেলেন! এসব মানুষের রোষে পড়লে নানাভাবে অমঙ্গল দেখা দিতে পারে সংসারে। সেজন্য সারাদিন সে বিমর্ষ থাকল।

তার কিছুদিন পরই সোনা বের হল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে। সবশেষে সে একবার চেষ্টা করে দেখছে।

সে সকাল-সকাল দুটো খেয়ে নিল। মাকে সে কিছু বলল না। সে দুটো বঁড়শি নিল। নদীর জলে মাছ ধরতে যাচ্ছে বলে বের হয়ে গেল। কারণ এখন নদীতে জল কম। সোনা বঁড়শিতে ভাল মাছ ধরতে পারে। এখন বেলে মাছেরা বর্ষার জল পেলেই উঠে আসবে। খুব বড় নয়। ছোট-ছোট বেলে। সে বঁড়শি এবং একটা ঘটি সঙ্গে করে মাঠে নেমে গেল। ওর শরীরের সেই রুগ্ন ভাবটা কেটে গেছে। এখন সে খুব তাজা। সামনে সব মাঠ আছে। মাঠে পাট গাছ ওর বুকসমান। দু'দিন যেতে না যেতেই সব পাট ওর মাথার ওপর উঠে যাবে। উঠে গেলে তাকে কেউ আর দেখতে পাবে না। তাজা পাট গাছের নিচে সোনার রুগ্ন ভাবটা একেবারে মুছে যাবে।

গোপাটে নেমেই মনে হল ফতিমা এখনও ঢাকায় যায় নি। ফতিমাকে সে সঙ্গে নিতে পারে। কিন্তু ফতিমা হয়তো যাবে না। সে বড় হয়ে গেছে। ফতিমা বড় হয়ে গেছে। সে একা-একা কোথাও এখন চলে যেতে পারে, কিন্তু ফতিমা পারে না। তবু কেন জানি সে যে জ্যাঠামশাইকে মাছ ধরার নাম করে খুঁজতে বের হচ্ছে সেটা একবার ফতিমাকে না জানালে যেন নয়। আমি যাচ্ছি। কারণ, কেন জানি সোনার অসুখের ভিতর বার-বার মনে হয়েছে সে না গেলে

জ্যাঠামশাই ফিরে আসবেন না। তাকে দেখলেই জ্যাঠামশাই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে উঠে আসবেন। এই যে সোনা, আমি। একদিন সবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি, কিন্তু তোকে দেখে আর থাকতে পারলাম না। চল বলে তিনি সোনার কাঁধে হাত রাখবেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে সোনা জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফিরছে। জেঠিমা সোনাকে নিশ্চয়ই তখন আশীর্বাদ করবে। সোনা, তুমি বড় ভাল ছেলে তুমি দীর্ঘজীবী হও। সোনাকে কেউ আদর করে বললে সে সবকিছু তার জন্য করতে পারে। আর এ তো তার পাগল জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাইকে সে বন-জঙ্গলে ঢুকে ডাকলে তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন না। ঠিক হাসি-হাসি মুখটি নিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। এসে গেছিস! আমি তোর জন্যই বসেছিলাম। আরও কত কিছু ভাবে সোনা। মনে হয় তার জ্যাঠামশাইকে কেউ তেমন করে খোঁজে নি। খুঁজলে একটা মানুষকে পাওয়া যায় না এটা তার বিশ্বাস হয় না। সে থাকতে না পেরে একা-একা ট্যাবার পুকুরপাড়ে চলে যাচ্ছে। কারণ সোনার বার-বারই যে ঝোপ-জঙ্গলের কথা মনে হয়েছে সেটা ট্যাবার পুকুরপাড়, সেই বৃক্ষ, বৃক্ষ তুমি কার? রাজার। এখন কার? তোমার। আমার হলে তুমি বল আমার পাগল জ্যাঠামশাই কোথায় বসে আছেন? তাঁকে তুমি খুঁজে আনো। চল, তুমি আমার সঙ্গে তাঁকে খুঁজবে।

তবু সেই গাছটির কথা মনে হলে, গাছ তো নয়, বৃক্ষ। বড় ডালপালা মেলে দিয়েছে আকাশে। আর সেই অজস্র শকুন, কোনটা উড়ছে, কোনটা মগডালে বসে ঘুমোচ্ছে। কোনটা শিকার কোন দিকে, বাতাসে গন্ধ আসছে কিনা, এই ভেবে গলা বার করে বসে আছে। সোনার দৃশ্যটা মনে হলেই ভয় হয়। কত বড়-বড় সব হাড়, মানুষের অথবা মাছের। সে হাড় ঠিক চিনতে পারে না। বড় হাড় হলেই মানুষের মনে হয়। সেই সব হাড়, মরা ডাল ডিঙিয়ে যেতেই তার যা ভয়। ফতিমা সঙ্গে থাকলে কিছুতেই ভয় থাকে না। সারা মাঠে পাট গাছ। এদিকের জমিতে আগে চাষ করা হয়েছে বলে সে কখন টুপ করে ডুবে গেল পাটের জমির ভিতর। এবং গিয়ে যখন দাঁড়াল অন্য পাড়ে, ঠিক সামনে সেই পেয়ারা গাছ ফতিমাদের। সে কারো সাড়া পাচ্ছে না। কেমন নিঝুম বাড়িটা। নিঝুম থাকারই কথা। ওর নানী চলাফেরা করতে পারে না। ঘরের ভিতর চুপচাপ বসে থাকে। চোখে ভাল দেখে না। অথবা সারা বিকেল মাদুরে শুয়ে ঘুমোয়। ধন্দু শেখ সারাদিন মাঠে থাকে। ওদের বাড়িটার পরে

হাজিসাহেবের বাড়ি। কেউ বড় আসে না এ-বাড়িতে। কারণ সংসারে যে মানুষ থাকলে কথাবার্তা বলা যায় তেমন মানুষ বলতে এক ফতিমা। সে সারাক্ষণ বই নিয়ে একটা আলাদা ঘরে শুয়ে থাকে পড়ে। কখনও-কখনও ডাক দিলে সে নানীকে সাড়া দেয়। এদিকে এমন সে মনোযোগী হয়ে পড়েছে যে নানী থাকলে বিরক্ত হয়। আমি তো নানী এ-ঘরে বসে আছি। তুই আমারে বারে-বারে ডাকলে পড়া হয়! ফলে নানী তাকে ডাকে না। সোনা সে-ঘরটা চেনে। সে চুপি-চুপি ডাকল, এই ফতিমা।

ফতিমা চিত হয়ে পড়ছিল। ওর ওই বয়সে চুল কত বড়। সে বুকের ওপর বই রেখে পড়ছে। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সে পড়ায় ফাঁকি দেয় না। কিন্তু সোনাবাবুর মুখ জানালায় উঁকি দিতেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সে তার পড়ার কথা ভুলে গেল।

ফতিমা বলল, আপনে, সোনাবাবু!

—আমি ভাবলাম তর লগে একবার দেখা করে যাই।

—কই যাইবেন?

—জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে যাচ্ছি।

—একলা!

—কে আর যাবে সঙ্গে। সবাই খুঁজে দেখেছে, পায় নি। এবার আমার পালা।

—আমাকে সঙ্গে নেবেন?

—যাবি তুই! তোর নানী বকবে না?

—টের পাইলে ত। বলেই খড়ম পায়ে নেমে এল। ফতিমার এটা শহরে থেকে হয়েছে। সারা দিন লাল রঙের খড়ম পরে থাকে। নীল রঙের স্ট্র্যাপ খড়মে। সে হাঁটলেই কেমন খট-খট শব্দ হয়। সোনার এটা কেন জানি পছন্দ হয় না। মেয়েরা জুতো পরে সে সেটা মুড়াপাড়ায় দেখেছে। অমলা কমলা জুতো পরত। সেবারই যে গেল ওরা, আর ওদের যাওয়া হল না। কি যে কারণ সোনা জানে না। আর নৌকা আসত না মুড়াপাড়া থেকে। ওরা যেতে পারত না। পরে সে যা শুনেছে তা সত্যি নয়—কারণ সে বিশ্বাসই করতে পারে না। এত বড় বাড়ির আদায়পত্র কমে গেছে। মহালে তেমন আদায়পত্র নেই। বাবুদের বড় বড় কারবার ছিল। ঋণসালিশি বোর্ড ওদের আদায়পত্র কমিয়ে দিয়েছে—সে বিশ্বাস করতে পারত না। ওর কেন

জানি মাঝে-মাঝে অমলাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে এতটুকু ছেলে অমলার কাছে কি লিখবে। কিছু লিখতে গেলেই মা বকবে। এসব কি পাকামি তোমার সোনা। তুমি চিঠি লিখছ অমলাকে।

ফতিমা বলল, এদিক দিয়া আসেন।

ফতিমা খালি পায়ে পা টিপে টিপে একবার নানীর ঘরে উঁকি দিল। দেখল নানী একটা মাদুরে কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। সূর্য মাথার ওপর না উঠতেই নানী খেয়ে নেয়। সেও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। ওর সামনে তারপর থাকে অফুরন্ত সময়। সে মাঝে-মাঝে পেয়ারা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। দূরে অর্জুন গাছের নিচে কোন ছায়া-ছায়া কিছু দেখা দিলেই তার মনে হয় সোনা বাবু দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন আর স্থির থাকতে পারে না। জন্মাষ্টমীর মিছিলে সোনাবাবুর জন্য যা-যা কিনে রেখেছিল, সেইসব দিতে চলে আসে। এবার সে কিছু আনতে পারে নি। কেবল এসেছিল সোনাবাবুকে দেখতে পাবে এই ভেবে! ফতিমা যত বড় হচ্ছে কেন জানি এই গাছপালা পাখির ভিতর সোনাবাবুর সুন্দর নীল রঙের জামা, লম্বা-লম্বা হাত-পা বড় তার ভাল লাগে। আর চন্দনের গন্ধ শরীরে—সে এখান থেকে চলে গেলেও তার মনে হয় নাকে গন্ধটা লেগে রয়েছে। এমন পবিত্র গন্ধ সে যেন আর কোথাও পায় না। সুতরাং সে এই সুযোগ ছেড়ে দিলে আর সময় হবে না, মনে-মনে সেও জানে বড় হয়ে গেলে আর মাঠে-ঘাটে একা নেমে আসতে পারবে না।

ওরা মাঠে নামতেই পাট গাছের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। জমির আলে ওরা ছুটছে। শাড়ি পরায় ফতিমাকে সোনার চেয়েও লম্বা মনে হচ্ছে। পাট গাছের নিচে থাকলে তারা টের পাবে না কোন দিকে যাচ্ছে। সুতরাং মাঝে-মাঝে গাছ ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে ওরা ঠিকমতো যাচ্ছে কিনা। সেই খাল। দালানবাড়ির খাল। তারপর কিছু ধানের জমি। ধানের জমির ওপর দিয়ে গেলে ওরা ধরা পড়ে যাবে, ওরা একটু ঘুরে আলে-আলে পাটের জমি ভেঙে উঠে যেতে থাকল।

ফতিমা ডাকল, এই সোনাবাবু।

সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ফতিমা ধীরে ধীরে হাঁটছে। আয়। দেরি করিস না?

—এত তাড়াতাড়ি ছুটছেন ক্যান?

—ফিরতে দেরি হলে মা বকবে।

—কেউ বকবে না। কি সুন্দর পাটগাছ, না সোনাবাবু?

—খুব সুন্দর। তুই আয়।

—আপনের লগে আমি হেঁটে পারি! আপনে পুরুষমানুষ না?

সোনা এবার দাঁড়াল। সত্যি ফতিমা কেন পারবে? সে বলল, তুই নাকে নথ পরে থাকিস না কেন?

—নথ পরলে আমাকে দেখতে ভাল লাগে?

—খুব ভাল লাগে না। তবে না পরলে খারাপ লাগে। তোর পায়ে মল নেই। ঝুমঝুমি শব্দ হয় না আগের মত।

—এখন বড় হয়েছি না! ঝুম-ঝুম বাজলে লোকে টের পাবে সোনাবাবুর লগে ফতিমা যায়। লোকে পাপ ভাবতে পারে।

সোনা বলল, অঃ পাপ! তা চলে আয়। পাপ ভাবলে পাপ। আমরা তো কিছু পাপ করছি না।

—আমার হাত ধরবেন সোনাবাবু।

—তোর হাত। দেখি কেমন।

সোনা হাতটা নিয়ে দেখল। এগুলো লাল-লাল কি মেখেছিস ছিট-ছিট?

—মেহেদি পাতার রং।

—মাখলে কি হয়?

—কি আবার হবে! বাড়ি এলেই মাখতে ইচ্ছা করে।

সোনা বলল, তোর বাবা বকে না?

—বকবে কেন?

—তুই চোখে বড় লম্বা কাজল দিয়েছিস। তোর চোখ ছোট। বড় চোখে কাজল মানায়। ছোট চোখে মানায় না।

ফতিমার কেমন ভিতরে-ভিতরে দুঃখ হল। অভিমানে সে বলল, হাঁটেন। তাড়াতাড়ি ফিরতে হইব। বলেই ওরা দেখল সেই গাছের নিচে এসে গেছে। গাছের নিচটা পার হয়ে যেতেই যা ভয়। তারপর লতা-পাতার ঝোপ। বৃষ্টি হওয়ায় ঝোপজঙ্গল সবুজ হয়ে গেছে। ওরা দু'জনই জোরে-জোরে ডাকল, জ্যাঠামশাই আছেন? আমি সোনা।

ফতিমা বলল, জ্যাঠা আছেন! আমি ফতিমা। আপনাকে নিতে এসেছি।

কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘুরে-ফিরে ওরা কোথাও ডেকে-ডেকে সাড়া পাচ্ছে

না। ওরা দু'জন দু'দিকে খুঁজছে। কারণ এই অঞ্চলে খুঁজে আবার ওরা ছুটতে আরম্ভ করবে। কারণ যদি হাসান পীরের দরগায় ওঁকে পাওয়া যায়। ওখানে গেলেই দরগার ভিতর অথবা যেসব ভাঙা মসজিদ এবং পাঁচিলঘেরা কবরের ঘর আছে সেখানে খুঁজে দেখলে পাওয়া যেতে পারে। ফতিমা ডাকতে-ডাকতে পুকুরের উত্তর পাড়ে চলে গেছে। সোনাবাবুর ডাক সে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে না। সে ভাবল ডাকবে, সোনাবাবু, আপনে আর বেশি দূর একা-একা যাইয়েন না। কিন্তু অভিমান ওর ভিতরে বাজছে। কেবল অবহেলা। সে সুন্দর করে আজকাল চুল বাঁধতে শিখেছে। সে কপালে সেই কাঁচপোকা পরে থাকে। যা সোনাবাবু এক বর্ষায় ওর জন্য ধানক্ষেত থেকে তুলে রেখেছিল। এখনও সেই কাঁচপোকা কি উজ্জ্বল। সে যে এমন সুন্দরভাবে সেজে বসে থাকে তার জন্য কোন টান নেই সোনাবাবুর। একবার বলল না, কি রে ফতিমা, সেই কাঁচপোকাটা তুই এত যত্ন করে রেখে দিয়েছিস? সে ভাবল, না, আর ডাকবে না। অথবা কথা বলবে না। সে এসেছে পাগল মানুষটাকে খুঁজতে। তাকে খুঁজেই চলে যাবে।

কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল কোন সাড়া নেই সোনাবাবুর। কি ব্যাপার! কোন ডাক শুনতে পাচ্ছে না। কেমন নিঝুম হয়ে গেছে বনটা! বনের ভিতর সোনাবাবু হারিয়ে গেছে ভেবে ফতিমার বুক কেপে উঠল।

এখন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গরম। সাপ-খোপের আড্ডা এই প্রাচীন বনে। কত-কালের এই সব বনজঙ্গল কে জানে। বড় কড়ুই গাছের কত সব মৃত ডাল! আর চারপাশে এত বেশি লতাপাতা যে, একটু দূরে গেলেই কিছু দেখার উপায় নেই। সে এবার অভিমানের মাথা খেয়ে সামনের যত ডালপালা ফাঁক করে ডাকতে থাকল, সোনাবাবু, আপনে কোনদিকে?

না, কেউ উত্তর দিচ্ছে না।

ফতিমা আরও দক্ষিণে ছুটতে থাকল, সোনাবাবু, আপনি কথা বলছেন না কেন?

সব নিঝুম এমন কি পাতার খস্‌খস শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এত যে শকুন বসে রয়েছে মগডালে ওরা পর্যন্ত পাখা নাড়ছে না। কেবল কক্‌-কক্ একটা শব্দ হচ্ছে। তক্ষকের ডাকের মতো শব্দটা ওকে চারপাশ থেকে গিলতে আসছে।

—সোনাবাবু, আমি এখন কি করি!

কক্‌-কক্ শব্দটা থেমে গেছে। অন্য এক দ্রুত শব্দ। সে দৌড়াচ্ছে। যেন বালিকা বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে। পাগলের মতো ডাকছে, আমি সোনাবাবু আপনার ওপর কোন রাগ করি নি। এই দেখুন, আমাকে দেখুন। আপনি কেন যে ওদিকে খুঁজতে গেলেন!

না, সে আর পারছে না। ছুটে ছুটে ক্লান্ত। এ-পাশের ঝোপটা নড়ছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। না কিছু নেই। দুটো ছোট্ট বানর বসে রয়েছে ডালে। ওরা লাফালাফি করছে।

—আমি মরে যাব সোনাবাবু। আপনি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব। বলে শিশুর মতো দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকল ফতিমা।

সোনা আর পারল না। সে ঝোপ থেকে উঠে এসে ফতিমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল।—তুই বোকার মত কাঁদছিস!

—আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন? বলতে-বলতে হেসে ফেলল।

ওরা দু'জন এত কাছাকাছি, আর কি সুন্দর উভয়ের চোখ—এখন মনেই হয় না যাবতীয় পৃথিবীতে কোন গণ্ডগোল আছে। ওরা পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের নিচে বসল। তারপর ধীরে-ধীরে সোনা বলল, আমার জন্য তোর খুব মায়া।

ফতিমা বলল, আপনাকে বেশি দিন না দেখলে মনটা আমার কেমন করে। বলে আবার হাত দুটো ঘাসের ওপর বিছিয়ে দেখাল, দু'হাতে দুটো পদ্মফুল এঁকেছি সোনাবাবু। দেখেন কি রকম দেখতে।

—বাড়িতে বসে-বসে বুঝি এই করিস?

—নোখে লাল রং দিয়েছি আপনি দেখবেন বলে।

কি অকপট আর সরল ওরা। ওদের এই ভাললাগার ব্যাপার গাছের নিচে দুটো ছোট্ট পাখির মতো, অবিরাম কাছাকাছি থাকা, একটু দেখা, তারপর ছোটা, ছুটে-ছুটে সেই মানুষটাকে খোঁজা, যে বনের ভিতর ভালবাসার খোজে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সোনা বলল, এ বনে জ্যাঠামশাই নেই। হাসান পীরের দরগায় যাবি?

—চলেন।

—ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

—তা হউক।

ওরা দরগার মাটিতেও পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজেছিল। কোথাও কেউ

সাড়া দিচ্ছে না। সে কবরের পাশে পাশে ডেকে গেল, না কোন সাড়া নেই। ওরা দেখল, তখন কিছু কালো মেঘে আকাশ সহসা ছেয়ে ফেলল। এবং বৃষ্টি পড়তে থাকল। বর্ষা এসে গেছে এদেশে। একটা লোক দূর দিয়ে যাচ্ছে। সে বলতে-বলতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ওর মাথায় এক অদ্ভুত রঙের নিশান। সে একা। সে বলতে-বলতে যাচ্ছে, আমরা বাংলাদেশের মানুষ এবার আলাদা হয়ে যাব।

সোনা বলল, কি বলছে রে লোকটা?

ফতিমা এ-সব ব্যাপারে সোনার চেয়ে বেশি খবর রাখে। সে অসহায় চোখে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল। বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। ওরা সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে আর অনবরত একজন মানুষকে খুঁজছে—যিনি এক অদ্ভুত ভালবাসার মায়ায় এই সব গাছপালা পাখির ভিতর নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াতেন।

সোনা সেই রাতে বাড়ি ফিরে এসে সব শুনেছিল। শশিভূষণ পড়ে পড়ে সবাইকে শোনাচ্ছেন। ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া থেকে কাগজ নিয়ে এসেছে—তাতে লেখা, লর্ড মাউণ্টব্যাটনের বেতার বক্তৃতা—আমার আলোচনার মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা ছিল, মন্ত্রী-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মেনে নিয়েছেন এবং আমার মনে হয়, ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে এরচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী-মিশনের কিংবা ভারতের ঐক্যরক্ষার অনুকূলে অন্য কোন পরিকল্পনা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। কিন্তু কোন একটি বৃহৎ অঞ্চল, যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাদের বলপ্রয়োগে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যবিশিষ্ট গভর্নমেণ্টের অধীনে বাস করতে বাধ্য করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বলপ্রয়োগে বাধ্য না করবার যে উপায় আছে, সেটা হল অঞ্চল বিভক্ত করে দেওয়া।

শশিভূষণ বলল, শেষপর্যন্ত পার্টিশানই ঠিক হল!

শচীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ছিল। বলল, কিছু বললেন?

—তা হলে কপালে পার্টিশান আমাদের?

—তাই মনে হয়। শচীন্দ্রনাথকে বড় ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

সোনা যে সারাদিন বাড়ির বাইরে ছিল কারো খেয়াল নেই। কারণ

দুপুরেই এ-সব খবর নিয়ে এসেছিল ভূপেন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ বাড়ি ছিল না। শচীন্দ্রনাথ বাড়ি এলে শশিভূষণ পড়ে-পড়ে শোনাল। সারাটা দিন বাড়িতে এ-নিয়ে একটা উত্তেজনা গেছে। ঈশম বসে বসে কেবল শুনছে। সে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে এইটুকু বোঝে, দেশ ভাগ হলে, এ-দেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে। বাংলাদেশের নাম পাকিস্তান—ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। আর একটা অংশ হিন্দুস্তানে চলে যাবে। এটাও ওর মনে কেমন একটা দুঃখের ছাপ বহন করছে। এত বড় বাংলাদেশের নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। এটা সামু করছে। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে যেন সে বলত, কি লাভ তর, দেশটারে ভাগ করে দুই দেশের কাছে ইজারা দিলি!

এ-ব্যাপারটা সোনা ঠিক বুঝতে না পেরে সে কিছুটা শুনে উঠে গেল। ওর এ-সব শুনতে ভাল লাগে না। ছোটকাকার মুখ কি গম্ভীর! মেজ জ্যাঠামশাই সারাদিন কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন বিছানায়। গ্রামের লোকজন সব আসছে যাচ্ছে। ওদের মুখ ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

মা বলল, সোনা, তর বঁড়শি কই? মাছ পাইলি?

সে বড়শি নিয়ে গেছে, সঙ্গে একটা পেতলের ঘটি ছিল মাছ রাখার—সে এখন এ-সব কোথায় ফেলে এসেছে মনে করতে পারে না। তবু যতটা মনে পড়ছে ফতিমাদের বাড়িতে সে ঘটি এবং বঁড়শি রেখে গল্প করছিল। ওদের বাড়িতে থাকতে পারে। কাল সকালে সে অথবা ঈশম গিয়ে নিয়ে আসবে। সে মাকে বলল, মা, মাছ পাই নাই। ফতিমাদের বাড়ি গেছিলাম। ওর নানীর খুব অসুখ। দেখতে গেছিলাম। সোনার আজকাল কারণে-অকারণে দুটো একটা মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হয়েছে। ধনবৌ সোনাকে আর কিছু বলল না। কারণ তারও মনটা ভাল নেই।

পরদিন ফতিমা নিজেই এসেছিল ঘটি এবং বঁড়শিটা নিয়ে। সোনা ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অর্জুন গাছটার নিচে চলে গেছে। সে বলল, দেশ ভাগ হলে আমরা চলে যাব।

—কোনখানে যাইবেন?

—তা জানি না। মাস্টারমশয় কইছে ওদের দেশটা হিন্দুস্তানে পড়বে! বাবা-জ্যাঠামশাই কেউ থাকবে না।

—কেন থাকবে না! ফতিমার বুকটা কেমন কেঁপে উঠল।

—জ্যাঠামশাই খেতে বসে বলেছেন, এদেশে থাকলে নাকি আমাদের মান-সম্ভ্রম থাকবে না।

ওরা আর উভয়ে কোন কথা বলতে পারল না। গাছের নিচে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামনে সেই ফসলের জমি, জমিতে শুধু পাট গাছ—কি সজীব! আর এই পরিচিত পুকুর, শাপলা ফুল, অর্জুন গাছ, ঠাকুরদার চিতার ওপর শানবাঁধানো বেদী এবং বর্ষাকালে নদীর জল সোনাবাবুর বড় প্রিয়। শীতের মাঠ, তরমুজের জমি সব ফেলে চলে যেতে পারবেন সোনাবাবু! কষ্ট হবে না। মায়া হবে না এসব ভালবাসার সামগ্রী ফেলে যেতে! ফতিমার চোখ দেখলে এখন শুধু এমনই মনে হবে। সে এমনই যেন সোনাকে বলতে চায়।

সোনার ইচ্ছা করছিল না কথা বলতে। সোনার ভারি অভিমান হচ্ছে ফতিমার ওপর। ওর বাবা এবং ওরা সবাই মিলে জিদ না ধরলে এমন হত না। সে বলল, আমার কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য কষ্ট হবে। তিনি এখনও এলেন না। কোথায় যে গেলেন। আমরা চলে গেলে যদি তিনি আসেন, তুই বলে দিস আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। বলবি ত!

ফতিমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য সোনাবাবুর কষ্ট হবে। ওর জন্য কষ্ট হবে না সোনাবাবুর। কিন্তু চোখ ঝাপসা বলে সে সোনাবাবুর দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়লে তিনি নির্বিকার থাকবেন। খুব বেশী বললে হয়তো বলবেন, তোর আবার কান্নার কি হল। সুতরাং সে মুখ ফিরিয়ে রাখল। এবং সামনের নদীর জল পাটের জমি দেখতে দেখতে বলল, জ্যাঠামশাই ফিরে এলে আমরা তাঁকে ঠিক পৌঁছে দেব সোনাবাবু। তাঁকে আমরা ধরে রাখব না।

তারপরই দেশভাগের ছবি চারপাশে ফুটে উঠতে থাকল—বর্ষাকাল এসে গেল। চারপাশে সব বড় বড় নৌকায় লাল-নীল রঙের পতাকা, কত রঙ-বেরঙের চাঁদামালা, কাগজের ফুল, এবং নতুন লুঙ্গি পরে, নতুন জামা গায়ে মাথায় ফেজ টুপি পরে ছেলেরা, মেয়েরা নাকে নোলক পরে, নদীর চরে নৌকা ভাসিয়ে সারি সারি চলে গেল—ওরা চলে গেল। সোনা মার হাত ধরে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। ছবি মার কোলে। মেজদা বড়দা চুপচাপ খেজুর গাছটার নিচে বসে দেখছে। জেঠিমা দাঁড়িয়ে আছে তেঁতুলগাছের নিচে। নরেন দাস, শোভা আবু, দীনবন্ধুর দুই বউ এবং হারান পাল সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। এতটুকু হাসি নেই কারো মুখে। শচীন্দ্রনাথ বাড়ির

ভিতর। তিনি এই উৎসবের দিনে চুপচাপ শুয়ে আছেন। মাস্টারমশাই বসে বসে দুঃখী মানুষের মতো একটা দেশাত্মবোধক গান গাইছিলেন—বঙ্গ আমার জননী আমার। মনে হয় তিনি বসে বসে বাংলাদেশের জন্য গানটা গাইতে গাইতে শোক করছিলেন।' সোনা চোখ বুজে গানটা শুনছিল আর মাস্টারমশাইর মুখ, বড় জ্যাঠামশাইর মুখ মনে পড়ছিল। এবং বাংলাদেশ ভাবতে সে বোঝে, ঈশম, ফতিমা, পাগল জ্যাঠামশাই আর সে নিজে, এই দেশ যখন বাংলাদেশ, তবে ভাগ কেন। সোনার চোখেও জল এসে গেল।

ঈশম দাঁড়িয়েছিল। সে নির্বিকার। সে সকাল থেকে কোন কথা বলছে না। সারা সকাল আশ্বিনের কুকুর ঘেউঘেউ করে ডাকছে। কুকুরটা কেন জানি সকাল থেকেই ঈশমের সঙ্গ ছাড়ছে না। কুকুরটা এর ভিতর কিছু টের পেয়ে গেছে।

আর মাটির নিচে দুই মানুষ। জলের নিচে দুই মানুষ। পাগল মানুষ আর ফেলু। ওরা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের কঙ্কাল মাটিতে ঢেকে গেছে। কি সাদা আর ধবধবে কঙ্কাল এই মানুষের। বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না। বড়বৌ জানালা খুলে এখনও দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুদ্দেশ থেকে মানুষটা তার আজ হোক কাল হোক ফিরবেই।

দেশভাগের কিছুদিন পর মুড়াপড়া থেকে ভূপেন্দ্রনাথ ফিরে এল। সেটা ছিল এক আশ্বিনের সকাল। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এলেই এ-সংসারের জন্য কিছু না কিছু চাল ডাল তেল নুন সবজি মাছ আসে। বড় মাছ নিয়ে আসে, ভূপেন্দ্রনাথ। আখের দিনে আখ, আনারসের দিনে আনারস। বাড়ির ছেলে-পেলেরা নৌকা এলেই ঘাটে চলে যাবার স্বভাব। সব কিছুর ভিতর তাদের চোখ সেই আখ অথবা আনারসের দিকে। সুতরাং এই ভেবে সবাই ছুটে গেলে দেখল ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা থেকে ধীরে ধীরে নামছে। কিছুই সে এবার আনে নি। খালি নৌকা। সে নেমেই বলল, তোমরা ভাল আছ! কেমন রোগা দেখাচ্ছে। ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ মুখ। জীবনের সব শান্তি যেন কারা কেড়ে নিয়েছে। দুশ্চিন্তার ছাপ চোখেমুখে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় দিনের পর দিন মানুষটা অনিদ্রায় ভুগছে।

সে এসে সকাল সকাল স্নান করে সন্ধ্যাআহ্নিক করল। তারপর সামান্য জলযোগ করার সময় শচীকে ডেকে পাঠাল।

শচী এলে বলল, তোমারে একটা কথা কই। বাবুগ লগে পরামর্শ

করলাম। তারা বলল, যত সকাল পার দেশ ছাইড়া পালাও। তোমার কি মনে লয়?

শচী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সে জানে তার মানসম্ভ্রম, পারিবারিক মানসম্ভ্রম আর থাকছে না। তবু এই দেশ এবং মাটির জন্য সবার মতো ভিতরে একটা ভীষণ হাহাকার আছে। ছেড়ে যেতে যে কি কষ্ট! ভূপেন্দ্রনাথ শচীর মুখ দেখে সব টের পাচ্ছে। সে বলল, তোমার কষ্ট হইব জানি। বিদেশ-বিভুঁইয়ে কি কইরা আহার সংগ্রহ করবা সেটাই বড় চিন্তা। তবে কি জান, গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি। তোমরা অন্তত এই শরীরটা গঙ্গার পারে দাহ করতে পারবা।

শচী বলল, মাস্টারমশাই বলছিলেন, ওদের দেশে জমি জায়গা কিছু রাইখা দিতে।

সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ বলল, তবে তোমার মত আছে দেখছি। চন্দ্রনাথের মতও তাই। দুশ্চিন্তা নিয়া বেশিদিন বাঁচা যায় না। হাজিসাহেবের বেটাদের খবর দ্যাও। জমি-জায়গা বাড়ি-ঘর সব বিক্রি কইরা দিমু।

খুব স্থির গলায় এসব বলছিল ভূপেন্দ্রনাথ। গলা এতটুকু কাঁপছিল না। গলা কাঁপলে ভিতরে ভিতরে সে যে কত দুর্বল হয়ে পড়ছে ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়ে গেলেই যেন সে আর ভূপেন্দ্রনাথ থাকবে না। সোনার মতো বালক হয়ে যাবে। তার কথার তখন কেউ দাম দেবে না। সে নিজেকে খুব শক্ত করে রাখল।

এই বিক্রিবাট্টার খবর শুনে দীনবন্ধু ছুটে এল। মাইজাভাই, আপনারা চইলা যাইবেন হিন্দুস্থানে?

—আর কি করা!

—আমরা-অ তবে যামু।

—তুই যাইবি! ল তবে।

—এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত-মান থাকব না।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, আমরা যাইতাছি নবদ্বীপ। শশিমাস্টার সব ব্যবস্থা করব। নবদ্বীপ যাইতে তর অমত নাই ত?

দীনবন্ধু এসেই হাঁকডাক ছেড়ে দিল। আর অমত। এখন পালাতে পারলে বাঁচি। নরেন দাস শুনে ছুটে এল। সে বলল, আপনারা চইলা গেলে আমরা থাকি কি কইরা?

মাঝিবাড়ি থেকে এল শ্রীশ চন্দ। প্রতাপচন্দের দুই ছেলে ছুটে এসে বলল, দেশ ছাইড়া গিয়া কি ভাল হইব?

দীনবন্ধু বলল, থাকতে গেলে হিন্দু হইয়া থাকন যাইব না। মুসলমান হইতে হইব। যদি তা পার থাক।

এ-ভাবে প্রায় বার্তা রটি গেল গ্রামে—সবাই এসে খবর নিল। জলের দরে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে ঠাকুরবাড়ির ভূপেন্দ্রনাথ। খবর পেয়ে যারা কিনবে তারা চলে এল। প্রতাপ চন্দের ছোট ছেলে এসে বলল, আপনে জমিজমা যারে খুশি বিক্রি করেন, বাড়িটা কইরেন না। যা দাম হয় আমরা কিনা রাখমু।

শচীর তাই ইচ্ছা। দাম কম হলেও এ-বাড়ি সে কখনও মুসলমানের কাছে বিক্রি করতে পারে না। যেন বিক্রি করলেই যেখানে ঠাকুরঘর সেখানে মসজিদ উঠবে, যেখানে মাঘ-মণ্ডলের ব্রতকথা বলত ছোট ছোট বালিকারা সেখানে কোরবানি হবে—এইসব ভাবতেই তার চোখেমুখে এক তীব্র ক্ষোভ ফুটে উঠল। সে বলল, তাই হবে। হলও তাই। প্রতাপ চন্দ ওদের বাড়ি পুকুর এবং সেরা দশ বিঘা জমি হাজার পনের টাকায় কিনে নিল। কিছু টাকা সঙ্গে দেবে—বাকি হুণ্ডি করে পাঠাবে। বর্ডারে বড় কড়াকড়ি। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না। ভূপেন্দ্রনাথ তাতেই রাজী হয়ে গেল।

সোনা দেখল এক সকালে কিছু মানুষজন এসে ঘরগুলোর ওপরে উঠে টিনের স্ক্রু খুলে দিচ্ছে। আর টিনগুলো রাখছে আলাদা করে। ওর বার বার মনে হয়েছে জ্যাঠামশাই শেষপর্যন্ত তার মত পাল্টাবে। কিন্তু যখন দেখল টিনগুলো খুলে নেওয়া হচ্ছে, একটা ঘরে সব আসবাবপত্র নিয়ে আসা হয়েছে, কিছু কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে তখন সে নিজেও কেমন একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল বাড়িটার চারপাশে। অর্জুন গাছটা তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘর ভাঙা হচ্ছে বলেই গরীব কিছু মানুষজন সকাল থেকে বাড়ির চারপাশে ভিড় করে আছে। যা পারছে ফাঁক পেলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারছে না। ঈশমদা ধরে আনছে ঘাড় ধরে। চোখে মানুষটা কম দেখে আজকাল, অথচ একটা সামান্য জিনিস কেউ না বলে নিয়ে গেলে ঠিক ধরে আনছে। এতসব যখন হচ্ছে, মা যখন বড় বড় বস্তার ভিতর তার সব প্রিয় জিনিস ভরে ফেলছেন, যে কোনদিন মুড়াপাড়া থেকে নৌকা চলে আসতে পারে বড় বড়, এবং সব সামগ্রী নিয়ে রওনা দিতে হবে

পারে—তখন সে সারাটা সকাল খেয়ে না খেয়ে সেই অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

হাতে ওর একটা ধারালো ছুরি। সে প্রথম ঠিক ওর বুক সমান উঁচু জায়গায় গাছের কাণ্ডের ছালবাকল কেটে কেটে তুলে ফেলল। প্রথন ফোটা ফোটা কষ বের হচ্ছে। সাদা রঙের দুধের মতো কষ গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। বাবা, জ্যাঠামশাই পুকুরপাড়ে বসে আছে। উত্তরের ঘর দক্ষিণের ঘর এক এক করে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কেউ দুটো জানালা কিনে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ একটা দরজা কিনতে এসেছে। আলাদা আলাদা দাম দিয়ে যাচ্ছে সবাই। কেবল মনজুর পুবের ঘরটা আস্ত কিনেছে। দরজা-জানালা এবং টিন-কাঠের বেড়া এইসব সে একসঙ্গে কিনেছে বলে খাবারদাবার এবং অন্যান্য তৈজসপত্র সে ঘরে তুলে রাখা হয়েছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে দিলে কথা আছে মনজুর ঘরটা ভেঙে নিয়ে যাবে।

এক একটা টিন যখন খুলছে তখনই মনে হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের এক একটা পাঁজর বুক থেকে কেউ তুলে নিচ্ছে। ওরা সেদিকে তাকাতে পারছ না বলেই পুকুরপাড়ে এসে বসে আছে। ঈশমই সব দেখাশোনা করছে। এবং দরদাম করে গুনে গুনে টাকা দিয়ে যাচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের হাতে। সে টাকা গুনে নিচ্ছে না। গুনতে তার ভাল লাগছে না। গ্রামের কেউ কেউ চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। অন্যমনস্ক হবার জন্য তাদের সঙ্গে সে তার ছোটবেলার গল্প করছে।

আর সোনা সেই সকাল থেকে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কি যে করছে কেউ টের পাচ্ছে না। লালটু তাকে দু'বার খেতে ডেকেছে, সে খেতে আসে নি। সে নিবিষ্ট মনে কিছু করে যাচ্ছে।

ভূপেন্দ্রনাথও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে। যখন বাড়ি ঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে সবাই বিমর্ষ হয়ে আছে তখন সোনা অনবরত গাছের কাণ্ডে খুঁটে খুঁটে কি লিখে যাচ্ছে। শশিভূষণ খড়ম পায়ে বাইরে বের হয়ে এল। সে স্কুলে যাবে আজ একবার। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। সেক্রেটারিকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে। এখন আশ্বিন মাস বলে পূজার বন্ধ। জল চারপাশে। পাট কাটা হয়ে গেছে সব। আর কিছুদিন পরই যখন হেমন্তকাল আসবে সব জল নেমে যাবে মাঠ থেকে। মাঠে জল থাকতে থাকতে এ-দেশ থেকে রওনা হতে হবে। শশিভূষণ ডাকল, লালটু আছিস!

লালটু এলে বলল, একটু তেল নিয়ে আয়। মাখি। আজ সে সবার সঙ্গে

স্নান করল না! রান্না হতে দেরি হবে। সে স্কুল থেকে এসেই খাবে। ঘাটে স্কুলের নৌকা লেগে রয়েছে। সে সোজা সেক্রেটারির কাছে গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে আসবে। শশিভূষণ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে।

এ-সংসারে শুধু একজন একেবারেই কোন কথা বলতে পারছে না। সে সবার অলক্ষ্যে কাঁদছে। সে হচ্ছে বড়বৌ। এই দেশ ছেড়ে চলে গেলে মানুষটা যদি ফিরে আসে তখন সে কোথায় যাবে। এসেই চিনতে পারবে না—এই বাড়ি তার। ঘরবাড়ি কিছু নেই। শুধু কিছু পরিচিত গাছ। অর্জুন-গাছটা দেখলেই চিনতে পারবে সে ঠিকমতো পথ চিনে উঠে এসেছে। কিন্তু যখন দেখবে ঘর বলতে কিছু নেই, পুবের ঘর বলতে শুধু মাটি আর একটা কামরাঙা গাছ তখন সে নিশ্চয়ই ভাববে কোন জাদুবলে সে এসব দেখছে। যেমন সে স্মৃতির ভিতর মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত জাদুবলে দেখতে পায় শূন্য এক র‍্যামপার্ট এবং কিছু ইংরেজ সৈন্য কুচকাওয়াজ করছে মাঠে, সে তেমনি দেখতে পাবে সেই পুবের ঘর, ঘরের দরজায় বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে বড়বৌ, বাড়িতে পিঠে-পায়েস হয়েছে, যত্ন করে বড়বৌ সব ভিন্ন ভিন্ন রেখে দিয়েছে। দেখতে পাবে তসরের জামা গায়ে দিয়ে দিচ্ছে বড়বৌ, ধুতি কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছে এবং নাভির মতো কোমল অংশে হাত রাখতে রাখতে চোখ বুজে ফেলেছে। এসব দেখলেই সে এই বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াবে—কোথাও তাকে যে যেতে হবে সে কথা মনে থাকবে না। তখন এই মাঠে এবং ঘাসে অথবা ফুলে মানুষটা বুঝি বন্দী হয়ে যাবে।

সোনা তখনও লিখছিল। কি যে লিখছিল তখনও কেউ জানে না। সে বড়-বড় টান দিচ্ছে ছুরির ধারালো জায়গা ধরে। তারপর খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলছে কাঠ। যেন সে গাছটায় ক্রমান্বয় সব গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতের মতো কষ নেমে মাটি এবং ঘাস ভিজিয়ে দিচ্ছে। এই ক্ষতস্থান ঝড়-বৃষ্টি অথবা কোন মানুষ শত চেষ্টা করেও যেন মুছে না দিতে পারে। ওর হাত লাল হয়ে গেছে। জায়গায়-জায়গায় হাত ওর সামান্য কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে হাত দিয়ে। সে কিছু ভ্রূক্ষেপ করছে না। গাছের মাথায় এক সেই নীলবর্ণ পাখি। মেজজ্যাঠামশাই সেই নীলবর্ণের পাখির সন্ধানে যাচ্ছেন সীমান্তের ওপারে। ওখানে গেলেই সব তিনি পেয়ে যাবেন। যা তিনি এদেশে হারিয়েছেন বর্ডার পার হয়ে গেলেই তিনি আবার বুঝি তা খুঁজে পাবেন। কিন্তু সোনার মনে কি যে এক অহেতুক ভয়। পাগল জ্যাঠামশাই

ফিরে এলে তারা যে এখানে নেই জানবে কি করে! জ্যাঠামশাই ফিরে এলে কি করে বুঝতে পারবে ওরা হিন্দুস্থানে চলে গেছে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। কারো কথা তিনি বুঝতেও পারেন না। একমাত্র সে জানে সে অথবা বড় জেঠিমা কিছু বললে তিনি বুঝতে পারেন। সেজন্য সে সেই সকাল থেকে লিখে চলেছে। কপালে ঘাম। মুখে এসে সূর্যের তাপ লাগছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। সে সেই এক নীল রঙের জামা গায়ে দিয়ে আছে। নীল রঙের জামা ওর খুব পছন্দ। আর এক নীলবর্ণ পাখি মাথার ওপর দেখছে, সোনা লিখছে, সুন্দর হস্তাক্ষরে, যেন কত মায়ায় সে তার ভালবাসার কথা লিখে যাচ্ছে। সে বড়-বড় করে লিখে রাখছে। জ্যাঠামশাই উঠে এলে যখন দেখতে পাবে বাড়ি বলতে কিছু নেই, সব খালি, শূন্য খাঁখাঁ করছে উঠোন, যেন কোন প্লাবন এসে সব ধুয়ে-মুছে নিয়েছে তখন তিনি নিশ্চয়ই একবার এই অর্জুন গাছের নিচে এসে দাঁড়াবেন। দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন—বড়-বড় হস্তাক্ষরে লেখা। সোনা লিখে রেখে গেছে—জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা। নিরুদ্দিষ্ট জ্যাঠামশাইর জন্য সে অর্জুন গাছের কাণ্ডে তাদের ঠিকানা রেখে গেল।

ঈশম অনেক উঁচুতে ডাঙায় দাঁড়িয়েছিল। সামনে মেঘনা নদী। আশ্বিনের আকাশ ওপরে। আশ্বিনের কুকুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে সেই নৌকাগুলো—বিন্দু বিন্দু হয়ে ভাসছে। ঠিক কাগজের নৌকার মতো ছোট হয়ে গেছে। সে খুব উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগোবার আর পথ নেই। সে নদীর পাড়ে পাড়ে এতদূর এসেছে। ছোট নদী থেকে বড় নদীতে। ভূপেন্দ্রনাথ বার বার ওকে ফিরে যেতে বলেছে ইশারায়—সে ফিরে যায় নি। সে পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। কুকুরটা পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। কুকুরটাই একমাত্র অবলম্বন ঈশমের। ঈশম আর আশ্বিনের কুকুর ওদের এগিয়ে দিতে যাচ্ছে। যেন সঙ্গে সঙ্গে যতদূর যাওয়া যায়। ঘাটে নৌকা ভাসালে পাশাপাশি গ্রামের অনেকে এসেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এসেছে। তারপর ওরা দাঁড়িয়ে থেকেছে পাড়ে। ওরা আর নৌকা জলে ভাসলে এদিকে আসে নি।

ঈশমেরও আসার কথা নয়। ভূপেন্দ্রনাথ ওকে হিসাবপত্র করে যা প্রাপ্য সব দিয়েছে তার। সঙ্গে আরও একশত টাকা দিয়েছে। যে ক'দিন সে একটা কাজ দেখে না নিতে পারছে সে ক'দিন অন্তত এই দিয়ে তার চলে যাবে। তরমুজের জমিটা হাজিসাহেবের মেজ ছেলে কিনে নিয়েছে। ঈশমের ভিতরে ভারি কষ্ট এই তরমুজের জমির জন্য। সে একটা কথাও বলতে পারে নি। যা দিয়েছে ভূপেন্দ্রনাথ, যত্ন করে আঁচলে গিঁট বেঁধে কোমরে গুঁজে রেখেছে। ঘাটেই ভূপেন্দ্রনাথ বলে ছিল, আর কষ্ট করে নারাণগঞ্জে গিয়ে কি হবে। সে তাতেও কিছু বলে নি। কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আর নৌকা জলে ভাসলে অনেক দূরে সহসা দেখল শশিভূষণ গাছপালার ফাঁকে কে হেঁটে আসছে পাড়ে পাড়ে। শশিভূষণের নৌকা আগে। তিনটে বড় বড় নৌকায় সব নিয়ে এদেশ থেকে রওনা হয়েছে ওরা। শশিভূষণ সোনা ধনবৌ বড়বৌ আগের নৌকায়। শশিভূষণই প্রথম দেখেছিল পাড়ে পাড়ে—পাড় স্পষ্ট নয়. তবু কে যেন ওদের নৌকা অনুসরণ করে এগুচ্ছে। শশিভূষণ সোনাকে ডেকে বলল, কে হাঁটছে রে পাড়ে পাড়ে?

সোনা ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। —ঈশমদা! আমাদের কুকুরটা সঙ্গে।

শশিভূষণ এবার পিছনের নৌকায় ভূপেন্দ্রনাথকে বলল, দেখেছেন!

—কি? ভূপেন্দ্রনাথ চারপাশে তাকাতে থাকল। চারপাশে নদীর চর এবং ধানখেত। মাঝখানে নদীর জল টলটল করছে। আশ্বিন মাস বলে জল নেমে যাচ্ছে মাঠ থেকে। নানারকম পাখি নদীর চরে। সে বিলের এক ঝাঁক পাখি দেখতে দেখতে বলল, কি বলছেন?

—ঈশম এখনও আসছে পিছু পিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ পাটাতনে উঠে দাঁড়াল। তারপর সতর্ক নজর রাখতেই বুঝল ঈশম নদীর পাড়ে পাড়ে যে গ্রাম অথবা বালির চর আছে তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। সে ঈশমকে এবার ইশারায় বাড়ি ফিরে যেতে বলল। ঈশম হাত তুলে যেন বলছে, ঠিক আছে। সে সময় হলেই ফিরে যাবে! সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারল, ঈশম যতক্ষণ পারে ততক্ষণ হাঁটবে। এবং ঠিক দামোদরদির মাঠ পার হলে সে আর এগুতে পারবে না। সামনে বড় বাঁওড় পড়বে। সে জল ভেঙে ওপারে যেতে পারবে না। ওকে তখন ফিরে যেতেই হবে। ভূপেন্দ্রনাথ সেজন্য আর কিছু না বলে যেমন ক্লিষ্টমুখে বসেছিল তেমনি আবার বসে থাকল।

সোনার ভারি কষ্ট। ওর ঈশমদাদা এতদূরে যে সে কথা বলতে পারছে না। এখান থেকে সে যত জোরেই কথা বলুক শুনতে পাবে না। সে, সে কেন শুধু, ওরা সবাই সব নিয়ে যেতে পারছে, শুধু পারছে না পাগল জ্যাঠা-মশাই, ঈশম আর ফতিমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ওদের নিয়ে যেতে পারলেই আর কোন কষ্ট থাকত না। কিন্তু তারপরই সোনার মনে হল সে যা কিছু ফেলে যাচ্ছে, তা আর সে ফিরে পাবে না। আবার এদেশে সে আসতে পারবে কবে জানে না। সে বড় হলে ঠিক চলে আসবে। কারণ যত দূরেই থাক, সে তরমুজের জমি, নদীর জল, মালিনী মাছ ভুলে বেশি দিন থাকতে পারবে না। সোনার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কেন জানি বার বার ডাকতে ইচ্ছা হল, ঈশমদাদা, আপনি ফিরে যান। আমরা আবার ফিরে আসব।

কিন্তু সে জানে এ-কথা অতদূরে পৌঁছাবে না। সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকল। বৈঠার জল ছপছপ শব্দ করছে। সামান্য হাওয়া লেগেছে পালে। আর ক্রমে নদীর দু'পাড় উঁচু হয়ে যাচ্ছে। উঁচু হতে হতে সে দেখল অনেক উঁচুতে একটা মানুষ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এক বিন্দু ঘাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না!

ঈশম জানত না সেই বিন্দু বিন্দু নৌকা থেকে এখনও একজন ওকে দেখছে। যতক্ষণ দেখা যায় দেখছে। এত উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে যে সোনার মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছিল তিনি না নিচে পা হড়কে পড়ে যান। পড়ে গেলে অনেক নিচে পড়ে যাবেন। বড় নদী বর্ষায় পাড় ভাঙতে ভাঙতে ভাঙে নি। ফাটল চারপাশে। আগামী বর্ষায় জল যখন বেগে নেমে যাবে এই সব গ্রাম মাঠ ভেঙে নদীর অতলে হারিয়ে যাবে। ফলে পাড় এত খাড়া যে তাকাতেই সোনার ভয় হচ্ছিল।

আর তখন সামনে সেই নদীর বাঁওড়। ওরা বাঁওড়ে পড়ে গেলে ঈশম আর কিছু দেখতে পেল না। ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। তবু সে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মাথার ওপর সূর্য উঠে গেছে। ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যাবে। একমাত্র সঙ্গী তার এই আশ্বিনের কুকুর। সকাল থেকে না খেয়ে আছে। সে বাজারে ঢুকে কিছু মুড়কি কিনে নিজে খেল এবং কুকুরটাকে দিল। এখন সে কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। ঘরে যে পঙ্গু বিবি আছে সে-কথা পর্যন্ত তার মনে নেই। নদীর পাড়ে সে কিছুক্ষণ একা বসে থাকল, একা একা হাঁটল। এ-ভাবে সে ওদের বিদায় দিয়ে নদীর পাড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকবে ভাবতে পারে নি। সে এখন আবার হাঁটছে।

তরমুজের জমিতে ফিরে মনে হল কারা ওর ভাঙা ছইটা আলের কিনারে ফেলে রেখেছে। ওর ভীষণ রাগ হল। মাথার ওপরে আকাশ। অজস্র নক্ষত্র এবং বালিয়াড়িতে নদীর জল বাতাসে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে ভেবেছিল এসেই এখানে বসে এক ছিলিম তামাক খাবে। কিন্তু সে যখন দেখল ওর সেই ভাঙা ছই একপাশে পড়ে আছে, আর হুঁকা কলকে, আগুন রাখবার পাতিল, কিছু খড় সবই গাদা মারা তখন রাগে হতাশায় ওর বুক ফেটে গেল। সে বলল, হায় আল্লা! তারপরই মনে হল এ-জমি তার নয়। এ-জমি হাজিসাহেবের মেজছেলের! ওদেরই কাণ্ড। ওরা এসে ঈশমের যা কিছু চিহ্ন সব ঠেলে ফেলে দিয়েছে। সে এখানে আর কোনদিন নেমে আসতে পারবে না, তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আল্লার করুণা দেখতে পাবে না ভাবতেই চোখ ফেটে জল এসে গেল। সে খুব কম চোখের জল ফেলেছে। সে মনে মনে নিষ্ঠুর। কিন্তু আজ প্রথম তার এটা কি হল। ওর একমাত্র বিবি, যে যৌবন ভাল করে আসতে না আসতেই পঙ্গু অসাড় হয়ে গেল, অথবা ঝড়ে জলে তার যে জীবন গেছে, দুঃখ ছিল অনন্ত, কোনদিন সে এমনভাবে মুষড়ে

কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য না। বিবির গলা এমনিতেই অস্পষ্ট। সে হয়তো ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে এবার মাতুরের পাশে বসে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, দিয়া আইলাম তাইনগ। নদীর পাড়ে ছাইড়া দিয়া আইলাম।

ঈশম তবু একা একা কথা বলছে, কি স্বপ্ন হে-পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার ফসল ফালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়!

ঈশম আবার নিজেই মনকে বুঝ-প্রবোধ দেয়।—কার কি হইছে। আমার কষ্ট হইছে। আরে আল্লা—আমি কি কাম কাজ জানি না। আমার খাওয়নের অভাব আছে। আল্লার দুনিয়ায় কেউ না খাইয়া থাকে না। বলেই সে এবার মাথায় হাত রেখে যেমন আদর করে মাঝে মাঝে তেমনি বলল, তুই ভাল হইলে তরে লইয়া নদীর হে পারে যামু গিয়া। এই দ্যাশে আর থাকমু না।

বিবির শরীর বড় ঠাণ্ডা মনে হল। হিম ঠাণ্ডা। শক্ত। আরে তুই এমন ঠাণ্ডা মাইরা আছস ক্যান? কি হইছে তর!

কিন্তু না। কোন কথা না। সে তাড়াতাড়ি মাথাটা কোলের ওপর তুলতে গিয়ে দেখল একেবারে শক্ত। প্রাণ নেই। সে আবার ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। সে কাউকে ডাকল না। এ-ঘরে আলো আসতে পারে না। সে ঘরের সব বেড়াগুলো খুলে ফেলল। এখন কি আলো ঢুকছে ঘরে! নীল কাঁথার নিচে বিবি। সেই প্রথম পঙ্গু হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন তাকে একা অন্ধকারে ফেলে—সে যেন নিরুদ্দেশে ছিল। আর কি আশ্চর্য, ফিরে আসার পর সে যেন এই প্রথম আলোতে মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিবি। ঠোঁটের কোণে সামান্য মিষ্টি হাসি। বয়স আর বাড়ে নি বিবির। সেই শৈশবের মুখ। সে শরীরে পঙ্গু হয়েছিল। মুখে যে লাবণ্য ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। কাল তার মুখের ওপর জরা আনতে পারে নি। তার সুন্দর মুখচোখ এত বেশি তাজা ছিল ঈশম জানত না। ওর অন্ধকারে মনে হত বিবি তার শুকিয়ে যাচ্ছে। বিবি তার মরে যাবে। ঘরের দরজা এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। জল-ঝড়ে যাতে বিবির কষ্ট না হয় তেমনি করে ঘরটা ঈশম তুলেছিল। এখন মনে হচ্ছে একবার আলো জেলে সে কেন দেখল না—বিবির বয়স বাড়ে নি। এমন আশ্চর্য ঢলঢলে মুখ দেখে বিবির জন্য মায়া পড়ে গেল। সে কোন লোক ডাকল না। ডাকলেই সে আর বিবির পাশে বসে থাকতে পারবে না। ওর মুখ দেখতে পাবে না। তাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে।

আবেদালি যাচ্ছিল মাঠে। সে মাঠে যেতে দেখল ঈশমচাচা ঘরের সব বেড়া খুলে চাচির পাশে বসে রয়েছে। এখন ধান পেকে গেছে মাঠে। মাঠে কোথাও কোথাও জল-কাদা। চারপাশে আবার সেই সোনালী ধান। ধানের গন্ধ সর্বত্র। আর এ-সময় চাচা চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে! কাজকামের মানুষ। কর্তারা সব চলে গেছে। গেলেও মানুষটার কাজের শেষ নেই। চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়। সে কেমন কৌতূহল বোধ করল। তা ছাড়া কর্তাদের সে নারাণগঞ্জে তুলে দিয়ে এসেছে—ওদের যেতে রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা, বিলের দু বিঘা জমি কাকে দিয়ে গেল, ঈশমচাচা কি পেল, এতদিনের পুরানো বিশ্বস্ত মানুষ ঈশম, তাকে কিছু না দিয়ে কর্তারা যাবে না। সে এতসব জানার জন্য যখন ঘরটার পাশে উঠে গেল তখন দেখল পাগলের মতো চাচা চাচিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। আবেদালিকে দেখেও কোন কথা বলছে না। চাচিকে সে কাঁথা দিয়ে শিশুর মতো ঢেকে রাখছে।

এমন ঘটনায় আবেদালি তাজ্জব বনে গেল। দিনদুপুরে মড়া কোলে নিয়ে বসে রয়েছে, কথা বলছে না! সে সবাইকে ডেকে আনল। চাচির ইন্তেকাল। সবাই প্রায় জোর করে বিবিকে টেনে নামাল ঈশমের কোল থেকে। ঈশম আর দাঁড়াল না। সে হেঁটে একা একা কবরখানায় চলে গেল। সারি সারি কবর। শেষ দুটো কবর জালালি আর ফেলুর। পাশেই ওর বিবির কবর হবে। জায়গাটা এত নির্জন যে পাশাপাশি মাটির নিচে সবাই মিলে সুখেই থাকবে। সে মনে মনে আল্লার কাছে তার বিবির জন্য দোয়া মাগল। আবার কাশফুল ফুটেছে চারপাশে, মসজিদে আবার সেই তিন সারিতে দাঁড়িতে থাকা মানুষ। মনজুর ইমামের কাজ করছে। এবং সেইসব পাখি তেমনি আকাশে উড়ছিল। শরতের আকাশ আর কবরের ওপর কাশের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। সে বিবিকে মাটির নিচে রেখে কিছুদিন আর এ-দেশে থাকল না। থাকতে ভাল লাগল না। সহসা সব কিছু তার কাছে কেন জানি অর্থহীন হয়ে গেছে।

সে যেতে যেতে উত্তরে চলে গেল। উত্তরে যেসব মেমানদের বাড়ি আছে তার, তাদের বাড়ি উঠে নিজের পরিচয় দিল। যৌবনে সে একবার এ-অঞ্চলে এসেছিল। যারা যারা তাকে চিনত, তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। কেউ বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছে। কেউ তাকে চিনতে পারল না। এতদিনে ঈশমের মনে হল তার সত্যি বয়েস হয়েছে। একটা কাজকামের দরকার—কিন্তু কোথায় করে! তেমন সে বাড়ি পাবে কোথায়! সে ঠাকুরবাড়ির বাঁধা লোক ছিল

বলে তার অঞ্চলের জাতি ভাইরা ওকে বিধর্মী ভাবত। তা'ছাড়া সে তো আর যেখানে সেখানে কাজ করে নিজের মান খোয়াতে পারে না। এ-ভাবে যে ক'দিন চলে যায়। একটা তো পেট, কোনরকমে ঠিক চলে যাবে। আসার আগে মনজুর, হাজিসাহেবের বড় বেটা ইসমতালি সবাই ওকে থাকতে বলেছিল। কাজের মানুষ। এমন মানুষ পাওয়া ভার। সে সবাইকে বলেছে—আর না। আর কাজ না। এই বলে সে সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বস্তুত ঈশম আর প্রাণে সাড়া পাচ্ছে না। কেবল মনে হয় তার জীবনের সব ঐশ্বর্য ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। এখন একটু ঘুরে-ফিরে অথবা কোন বড় মাঠে চুপচাপ একা বসে আল্লার করুণার কথা ভাবা। তবু কাজের মতো কাজ পেলে সে করতে পারত। তেমন কাজ তাকে আর কে দেবে!

সে একদিন দেখল, কিছু লোক সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছে। পাশাপাশি কোথাও মেলা থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই মেলা! সে প্রশ্ন করে জানতে পারলে, ওরা মেলায় যাচ্ছে না। ওরা যাচ্ছে সদরে। সদরে জিন্নাহ্-সাহেব আসছেন বক্তৃতা দিতে। দূর দূর গ্রাম থেকে নাস্তা গামছায় বেঁধে মানুষ যাচ্ছে জিন্নাহ্সাহেবকে দেখতে। ঈশম যেত যেতে ভাবল, একবার সেও চলে যাবে নাকি। এত বড় মানুষ আসছেন, তিনি দুঃখী মানুষের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখেছেন। আলাদা দেশ করে দিয়েছেন। এবারে তোমরা বাপুরা নিজেদের মতো করেকর্মে খাও। তারও ভারি ইচ্ছা সেই মানুষকে দেখে। সদরে গেলে সে সামসুদ্দিনের বাসায় থাকতে পারবে। কিন্তু সামসুদ্দিন কোথায় থাকে, ঠিকানা তার জানা নেই। শহরে গেলে নিশ্চয়ই সে মানুষটার নাগাল পাবে না। সে আর একা একা এতদূর যেতে সাহস পেল না।

ফতিমারও ভারি ইচ্ছা ছিল যায়। কত লোক দূর দূর থেকে শহরে আসছে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দেখা যায় অজস্র অগণিত মানুষ, মাথার ওপরে ফেস্টুন উড়ছে, লাল-নীল পতাকার মতো সব রঙ-বেরঙের ইস্তাহার, যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে মানুষের মাথার ওপর। সকাল থেকে অগণিত মানুষ যাচ্ছে আর যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠছে পাকিস্তান জিন্দা-বাদ। আল্লাহু আকবর। কায়েদ-ই-আজম-জিন্দাবাদ। রাস্তায় রাস্তায় তোরণ, গাছে গাছে আলো এবং মিনারে মিনারে অপরূপ লাবণ্য—ফতিমা দুপুর থেকে সাজছে। সেও যাবে। কিন্তু কি যে হল, সে তার বা'জানের মুখের দিকে তাকাতেই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সকালে সে বা'জানের

যে উল্লাসের মুখ দেখেছে, এই বিকেলে তার বিপরীত। সামসুদ্দিনের মুখ থমথম করছে। সে কি যেন টের পেয়ে গেছে। টের পেয়েই সে বলেছে ফতিমাকে, তোমার যেতে হবে না। মেয়েরা কেউ যাবে না। ফতিমার এত ইচ্ছা যাবার অথচ যেতে পারছে না। সে তাঁর বাবাকে অন্তত একেবারের জন্য অনুরোধও করতে পারছে না। সে যাবে আর আসবে। একবার দেখেই সে চলে আসবে। কিন্তু বাপের মুখ দেখে ফতিমা সেটুকু পর্যন্ত বলতে সাহস পাচ্ছে না।

সামসুদ্দিন সকাল থেকে নানাভাবে এই মহান দেশকে কিভাবে সামনে নিয়ে যেতে হবে এবং তার বক্তৃতায় কতটা বাংলাদেশ থাকবে, কতটা সারা পাকিস্তান থাকবে, সে কতটা কার হয়ে বলবে, বলা উচিত—এসব যখন ভাব-ছিল, তখন হক-চৌধুরী গোপনে একটা খবর দিয়ে গেল। সে পাগলের মতো হক-চৌধুরীর মুখের ওপরই না না করে উঠেছিল। তার সামনে বড় আয়না। গায়ে আচকান। সে নিজেকে আয়নায় প্রথমে চিনতে পারল না। চিনতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। সে কেমন বিষণ্ণ গলায় ডাকল, ফতিমা।

ফতিমা বলল, যাই বা'জান।

ফতিমা কাছে এলে বলল, একবার ফোন করে দেখ তো, কাদেরসাহেব আছেন কিনা?

ফতিমা ডায়াল ঘোরাল। সে দু'বারের চেষ্টায় কাদেরসাহেবের বাড়ির সঙ্গে সংযোগ করতে পারলে বলল, তিনি বাড়ি নাই বা'জান।

—ঠিক আছে। বলেই সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে দেখল পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার এসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে ইশারায় ওপরে চলে আসতে বলল।

—কি চাই বল?

—কায়দ-ই-আজম এইমাত্র ঢাকায় এসেছেন। এ-মুহূর্তে আপনার কি মনে হচ্ছে?

—কি যে মনে হচ্ছে বলতে পারছি না।

—কিছু অন্তত বলুন।

—আজ বলব না। কাল আসবে, বলব।

পত্রিকার রিপোর্টারটি কাল যখন এল সামসুদ্দিন তাকে চা খেতে বলল সঙ্গে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে যেন বলা, তুমি কাল আমাকে কিছু বলতে বলেছিল!

আসতেই এই সুসময়ে তার চোখ কেমন চিকচিক করে উঠেছে। সে ভুলতে চাইছে, যা সে ফেলে এসেছে। তার দিকে আর ফিরে তাকাবে না। অথচ কেন যে সে এমন কষ্ট পায়, কেন যে সে বাড়ি যাবার পথে দেখে ফেলেছে, ঠাকুরবাড়ির ঘর-দরজা কিছু নেই। খালি খাঁখাঁ করছে পাড়াটা। দীনবন্ধু নেই, নরেন দাস চলে গেছে, সব খালি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে—ওর এসব মনে পড়লেই কষ্টটা বাড়ে। ফতিমা আর যায় না। সে বড়দিনের বন্ধে কিছুতেই তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে নি। গ্রাম থেকে ফিরে এসে যখন সে আলিজানকে বলত, দেখা যায় না। খাঁখাঁ করছে। হুহু করে বাতাস বইলে ঠাকুরবাড়ির পাইক খেলার কথা মনে হয়। তখন ফতিমা কিছুতেই কাছে থাকে না। ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। মেয়েটা সফিকুরকে ভারি পছন্দ করছে। সফিকুরের কথা শুনলে ছুটে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়। আনজু এলে ও যে এত ফিসফিস করে কি কথা বলে! চোখের সামনে তার মেয়েটা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। এ-বয়সে সাদি না দিলে গাঁয়ে এতদিনে মুখ দেখাতে পারত না। কিন্তু সামু এখন দেশের বড়-মানুষ। তার মেয়ে বড় ইস্কুলে পাঠ নেয়। কত রাজ্যের কাগজ আসে বাড়িতে। দেশ বিদেশ থেকে লোক আসে দেখা করতে—সে সময়ই পায় না। মেয়েটা কখন কোন ফাঁকে বড় হয়ে যাচ্ছে এত। সে বলল নাইমুদ্দিনসাহেব, আমরা একসঙ্গে আজ উঠে দাঁড়াব।

নাইমুদ্দিন সামুকে চেনে। সামুভাই কি যেন ভাবছিল এতক্ষণ। এমন দৃঢ়চেতা বাঙালী, মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী ক'টা আছে হাতে আঙুল গুনে যেন বলা যায়। সে বলল, ডর নাই সামুভাই। আপনার পিছনে আমরা আছি। সারা বাংলাদেশ আছে। আপনার তবে ডর কি!

সামু বলল, আসেন। ভিতরে গিয়া বসি।

সামুর ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সে গাড়িতে বসে চারপাশ থেকে যেন কেবল শুনতে পাচ্ছে—উর্দু ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উর্দু ই হবে···উর্দু ই···।

সে হলের ভিতরও এমন এক সুধীসমাজের মধ্যে বসেছিল যারা জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা আবেগভরে শুনে যাচ্ছে। ওরা কেবল শুনে যাচ্ছে। কিছু বলছে না। আর জিন্নাহসাহেবও সময় বুঝে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা,

যেন তাঁর মুখে অন্য কোন কথা নেই, তিনি যেন বাঙালীকে সেই সুদূর সিন্ধু দেশের উপত্যকা থেকে ছুটে এসেছেন কেবল বলতে, উর্দু ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সে আর পারল না। সে চিৎকার করে বলে উঠল—না। তা হবে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

থমথম করছে সারা হল। কে, কে এমন কথা বলছে! মানুষটার দিকে তাকিয়ে সুধীসমাজ মাথা নিচু করে রাখল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কেউ আর বলতে পারছে না। গভর্নর-জেনারেলের মুখের ওপর এমন কথা কে বলতে পারে!

সামু আর দাঁড়ায় নি। সে মনে মনে জানে এটা হতে পারে না। সে কিছুক্ষণ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর দেখাদেখি কাদেরসাহেব বের হয়ে এলেন। এবং কিছু তরুণ এসে তাকে ঘিরে ধরল। বলল, আমরা আছি সামু-ভাই, আপনার ভাবনার কিছু নাই।

তারপর সামু জানে চুপচাপ বসে থাকার সময় আর হাতে নেই। দেশের স্বাধীনতার পর আর এক সংগ্রাম গ্রামে মাঠে আরম্ভ হয়ে গেছে। সে দেখল জিন্নাহসাহেব যখন বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন চারপাশ থেকে অযুতকণ্ঠে গলা মিলিয়ে কারা যেন বলছে, না না না। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না।

সামুর মুখের ওপর লাইটপোস্টের আলো এসে পড়েছে এতক্ষণে। কিছু বোগেনভেলিয়ার পাতা ডাল মাথার উপর। সেই আলোর ভিতর থেকে সে যেন সংগ্রামের অন্য আলোর সন্ধান পেল। সে আবার গ্রামে মাঠে চলে যাবে—বাংলার জনতার রায় নেবে। সে যখন গভীর রাতে ফিরল হাতের কাজ সেরে, তখন দেখল মেয়েটা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুমোয় নি। বাপের জন্য জেগে বসে আছে।

ফতিমা বলল, বা'জান, ফিরতে এত দেরি হয় ক্যান?

সামু খেতে বসে মেয়েকে বলল, কাজ আম্মা অনেক। আজ কি তারিখ রে ফতিমা?

ফতিমা বলল, এগার তারিখ। সারাটা জীবন কাজ কাজ কইরাই গ্যালেন।

—কি করি ক! কাজ থাকলে তারে ফেলতে নাই। বলে সে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বাড়ি যামু। তুই যাইবি?

বাড়ি যাবার নামে প্রতিবার সে যেমন মুখ উদাস রাখে, আজও তেমনি

বাপের দিকে উদাসভাবে তাকাল। সে কিছু বলল না। যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে বাপের খাওয়া দেখছে—আর কিছু শুনছে না, শুনলে পাপ, দুঃখ তার বাড়ে, যতটা পারল অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করল।

—কাদেরসাহেবের গাড়িতে যামু! গাড়ি নদীর পার পর্যন্ত যায়। বাড়ির কাছে পাকা রাস্তা গেছে।

ফতিমা দেখল বা'জান কেবল কথাই বলছে। কিছু খাচ্ছে না। মা সব গরম করে দিয়েছে। তবু খাচ্ছে না। ভাত নাড়াচাড়া করছে শুধু। এত রাতে কেউ খেতেও পারে না। ফতিমা এসব দেখে বলল, কিছুই ত খাইলেন না।

—ক্যান! বেশ ত খাইলাম।

—কি আর খাইলেন। এডারে খাওয়ন কয়!

সামু একটা সানকিতে মুখ কুলকুচা করে উঠে গেল। সামু উঠে গেলে থালাটা নিয়ে ফতিমা টেবিলে গিয়ে বসল। অলিজান ফতিমাকে কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করে নিজেও খেতে বসে গেল। ওরা টেবিলের ওপর খাচ্ছে। ফতিমার, বা'জানের যা অবশিষ্ট ছিল ওতেই পেট ভরে গেল। ফতিমা মাছ খেতে ভালবাসে বলে অলিজান আরও একটুকরো মাছ বেশি দিয়েছে। সে মাছ খাচ্ছিল নিবিষ্ট মনে। সে বা'জানের দিকে তাকাতে পারছে না। তাকালেই আবার বা'জান বলবে—কিরে ফতিমা, কিছু কইলি না। সে না তাকালেও জানে, বা'জান খেয়ে উঠলেই বলবে, ফতিমা যাইবি ত! সুতরাং যখন জবাব দিতেই হবে, সে মাছের কাঁটা মুখে রেখেই বলল, আমি যামু না বা'জান, আমার শরীর ভাল না।

মেয়েটার এই এক স্বভাব হয়ে গেছে। বাড়িতে কিছুতেই যেতে চায় না। বাড়ির কথা, সোনালী বালির নদীর চরের কথা বললেই ফতিমা এ-কথা সে-কথা বলে এড়িয়ে যায়। এবং সব সময়ই পড়া, স্কুল, খাতাপত্র, গল্পের বই এসবের ভিতর ডুবে থাকে। কথা ফতিমা এমনিতেই কম বলে, যত বড় হয়ে উঠছে, তত যেন ওর উচ্ছ্বাস আরও কমে যাচ্ছে। কথা তার সঙ্গে অথবা বিবির সঙ্গে —এ-বাদে একজন এলে আজকাল মনে মনে খুশি হয় ফতিমা। ওর নাম সফিকুর। ওর বোন আনজু ফতিমার সঙ্গে পড়ে। অথচ কেন জানি মেয়েটা যত বড় হয়ে যাচ্ছে, তত কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে সামুর। দু'দিন পরই মেয়েটাকে কেউ নিয়ে যাবে—তার তখন বড় একা মনে হবে—বাপের প্রাণ বড় আনচান করবে! সেজন্য সামু মেয়েটা যত পড়ছে, যত ভাল ছাত্রী হয়ে

উঠছে তত সে উৎসাহ পাচ্ছে। শাদিসমন্দের কথা ভাবছে না। যেন মেয়েটা পড়ুক—এখনই কি শাদিসমন্দের কথা! সে বলল, গ্যালে দেখতে পারতি ঠাকুরবাড়ির অর্জুন গাছটা কত বড় হইয়া গ্যাছে। তর মালতীপিসির কথা মনে পড়ে?

ফতিমা মুখে সুপুরির কুচি ফেলে বলল, খুব। একটা পান সে বা'জানকে সেজে দিল। পানটা বা'জানের হাতে দেবার সময় বলল, পিসির আর কোন খোঁজখবর হইল না।

মালতীর কথা বলে সামু কেন জানি সহসা বিমর্ষ হয়ে গেল। এই এক যুবতী তাকে বারেবারে কোথাও টেনে নিয়ে যায়—বুঝি সেই শৈশবকাল, ধান-খেত এবং পাটখেতের আল অতিক্রম করে বকুল ফুল কুড়াতে যাওয়া। সে আজকাল বাড়ি গেলে কি যেন তার পাশে থাকে না—হিন্দুপাড়া খালি খাঁখাঁ করছে। এসব ওকে পীড়ন করলে নিজের কাছেই যেন কোন কৈফিয়ত পায় না। সে কেন যে সহসা তার মেয়েকে মালতীর কথা বলতে গেল। মেয়ে বড় হয়েছে তার। সব বোঝে। মালতী সম্পর্কে সে একটা দুর্বলতা সারাজীবন বয়ে বেড়াচ্ছে, মেয়েটা বড় হতে হতে বুঝি তা জেনে ফেলেছে। সামু সেজন্য বলে ফেলেই একটা গোপন দুর্বলতা ফাঁস করে দিয়েছে এমন চোখেমুখে তাকালে, ফতিমা হেসে বলল, এখন আর পড়াশোনা করতে হইব না। শুইয়া পড়েন।

সামু যেন কত বাধ্য সন্তান ফতিমার। সে চাদরটা টেনে শুয়ে পড়তে পড়তে শিশুসরল মুখ করে ফেলল। এখন দেখলে চেনাই যাবে না কার্জন হলে এই মানুষই সিংহের মতো গর্জন করে উঠেছিল, না হতে পারে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। কেবল ফতিমা বোঝে, যতই বা'জান হাসি-খুশি মুখ করে রাখুক, ফতিমা বুঝতে পারে, চোখের ভিতর দিয়ে তাকালে বুঝতে পারে—বা'জান আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। দেশভাগের ঠিক আগে যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত পীড়ন বোধ করছে। ভিতরে মানুষটার কি হচ্ছে না হচ্ছে অলিজান পর্যন্ত টের পায় না। বরং যতক্ষণ বাড়ি থাকে মানুষটা ততক্ষণ এই সংসারই যেন তার সব। অলিজানের সুবিধা-অসুবিধা, ফতিমা পাশ করলে কোন কলেজে ভর্তি হবে, সংস্কৃত নিয়ে পড়ার ইচ্ছা মেয়েটার, ওদের সুখদুঃখ এই সার মানুষটার, সেই মানুষটাই কেমন অভিমানী মন নিয়ে বলে ফেলল ফের, তর মালতীপিসি কি

আর এ-হ্যাশে আছে! হিন্দুস্থানে গেছে গিয়া! সোনার হ্যাশ, সোনার সিংহাসনে রাজরানী হইয়া বইসা আছে!

আর তখন মালতী বুঝি সোনার সিংহাসনে দুলে দুলে পাল্কি কাঁধে বেহারা যায় হোঁ হোঁম না, তেমনি যেতে যেতে হাঁক পেল, আপনেরা সকলে নামেন গ মা-জননীরা। স্টেশনে আইসা পড়ছি, নামেন।

দলটা হুড়মুড় করে স্টেশনে নেমে পড়ল। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে প্ল্যাটফরমের বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

স্টেশনের বড়বাবু হাসলেন। নিত্য এমন হচ্ছে। কোত্থেকে হতচ্ছাড়া সব রিফুজি এখানে চাল চোরাচালানের জন্য চলে আসছে। এই যে দলটা স্টেশনে নেমেই ছড়িয়ে পড়েছে, ছুটছে এলোপাতাড়ি—এরা সবাই চাল চোরা-চালানের। স্টেশনে স্টেশনে এই দলটা ট্রেন থামলেই লাফিয়ে পড়বে। আর সতী-সাবিত্রীর মতো মুখ ঢেকে পালাবে। ছুটবে যতক্ষণ না প্ল্যাটফরম পার হওয়া যায়। মালতীও দেখাদেখি ছুটছিল। সে নতুন এই কাজে। সে হারুর বৌর পিছনে পিছনে ছুটছে। অভিনয়টা মালতী ধরতে পারে নি।

তখন বেলা দুপুর। তখন হাটে সবে দূর থেকে করলা এসেছে, ঝিঙে এসেছে। হাটে গরু-মহিষ এসেছে। রাস্তার চারপাশে বড় ভিড়। বড় বড় ট্রাক দাঁড় করানো আছে রাস্তার ওপর। শহরের জন্য সব্জি বোঝাই হচ্ছে। এবং সব্জির নিচে কর্ডন এলাকা থেকে চাল বোঝাই হচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে না। সব্জির নিচে মিহি চাল শহরে চলে যাচ্ছে।

মালতী কতক্ষণ পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে জানে না। হারুর বৌ দেখল মালতী সীমানা ছাড়িয়েও ছুটেছে। সে হিহি করে হেসে দিল। অতটা ছোটার কথা নয়। বাবুরা অতদূর যেতে বলেনি ছুটে। কেবল প্ল্যাটফরম পার হয়ে কিছুদূর ছুটে যেতে হবে। যেন বাবুদের কোন দোষ নেই। দোষ থাকার কথা নয়। বাবুরা জানে সব। নিতাইর বাপ সব ব্যবস্থা করে রাখে।

হারুর বৌ হাসতে হাসতে ডাকল, আর কৈ যাস! ইবারে থাম।

মালতী বলল, পুলিশে ধরলে! বিনা টিকিটে এতদূর এসে পড়েছে। জেল-হাজত হতে কতক্ষণ!

—আ ল তর যে কথা! নিতাইর বাপ বাবুগ খুশি করতে গেছে।

—তবে স্টেশনে তোরা সবাই ছুটলি ক্যান?

—হ্যাখাতে হয় না ল, হ্যাখাতে হয়। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকেন। অগ

করণের কিছু নাই য্যান, অবলা জীবের মত মুখ কইরা রাখে। কিছু জানে না মত দাঁড়াইয়া থাকে। যাত্রা দেখছস মালতী, কেষ্টযাত্রা!

মালতী হাঁপাতে হাঁপাতে দেখল ওরা একটা ভাঙা বাড়ির সামনে সবাই জড় হয়েছে। সে হারুর বৌকে বলল, যাত্রা দেখি নাই আবার!

—এডা হল যাত্রার সঙ। আমরা যাত্রা করলাম। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকল—অবলা জীব সব ছুইট্যা যাইতাছে অরা কি করতে পারে। নিতাইর বাপের লগে বাবুগ লগে সলাপরামর্শ কইরাই এডা আমাগ করণ লাগে।

মালতী বুঝতে পেরে পায়ের নিচে মাটি পেল। ভাঙা বাড়িটার পাশে বড় একটা আমলকী গাছ। গাছে ফল নেই। গাছটা সামান্য ছায়া দিচ্ছিল। মালতী ছায়ার নিচে বসল। দলে ওকে নিয়ে আঠারজন। একমাত্র নিতাইর বাপ এ-দলে পুরুষমানুষ। সেই বাবুর হয়ে কাজ করে। সে এ-পয়সা বাদেও মহাজনের কাছ থেকে আল্‌গা কিছু পয়সা পায়। সে দলের মোল্লা।

নিতাইর বাপ সবাইকে কেমন শাসনের গলায় বলল, এখানে বস। কেউ কোথাও যাবে না। সবাই জিরিয়ে নাও। আজ হাটবার। তোমরা ইচ্ছা করলে কিছু কেনাকাটা করে খেয়ে নিতে পার। আমরা রাত দশটার ট্রেন ধরব। বড়বাবু বলেছে, তখন চক্রবর্তীমশাইর দলের ডিউটি। ওরা লালগোলা থেকে আসবেন।

নিতাইর বাপ আর কিছু বলল না। সে হাটবার বলেই হাটে ঘুরতে ফিরতে চলে গেল। মালতী এখান থেকে স্টেশনের মালগুদাম দেখতে পাচ্ছে। বড় বড় খাঁচায় মুরগী। একশ হাজার মুরগী খাঁচার ভিতর। এই সব মুরগী শহরে চালান হচ্ছে। একটা মানুষ পরনে লুঙ্গি মাথায় পাকা চুল—মানুষটা মুরগীর ঝুড়িগুলোর ভিতর খাবার ফেলে দিচ্ছে। মুরগীগুলো মাঝে মাঝে বড় বেশি চিৎকার করছিল—এখানে বসে মালতী সব শুনতে পাচ্ছে। ট্রেনে রাত জেগে আসতে হয়েছে বলে মালতীর এইসব দেখতে দেখতে ঘুম পাচ্ছিল। আমলকী গাছের ছায়া বড় ঠাণ্ডা। মালতী সামান্য সময়ের জন্য চোখ বুজল।

গঞ্জের মতো এই জায়গায় জেলার বড় হাট। হাটের ভিতর মানুষের শব্দ গমগম করছিল। দুপুর বলে রোদের তাপ ভয়ঙ্কর। আর দীর্ঘদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না। শীত পড়ার আগে একবার এ-অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে বড় মাঠের ভিতর বৃষ্টির জন্য সব কৃষকদের হাহাকার ভেসে বেড়াচ্ছিল। সুতরাং অভাব-অনটনের জন্য চাষা মানুষেরা শেষ সম্বল মুরগীর আণ্ডা পর্যন্ত বেচে দিচ্ছে।

গরু-বাছুর বলতে আর চাষার ঘরে কিছু নেই। অনটনের জন্য ওরা ওদের শীর্ণ গরু-বাছুর নিয়ে হাটে এসেছে। গাই-গরু-বলদের হাট পার হলে মোষের হাট—নিতাইর বাপ হাটটা ঘুরেফিরে দেখছিল। এবং বাজারে চালের দাম কত, আর মহাজনেরাই বা কত দাম নিচ্ছে—স্রে হেঁটে হেঁটে সব যাচাই করে নিচ্ছিল।

মালতী কিসের শব্দে চোখ খুলে তাকালে দেখল, একটা আমলকী ঠিক ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে। সে আমলকীটা তুলে তাড়াতাড়ি আঁচলে বেঁধে ফেলল। তার পাতানো বাপ নিশীথের কথা মনে পড়ছে। নিশীথের কথা মনে এলেই রঞ্জিতের কথা মনে আসে। জোটনের কথা মনে আসে। সেই দুঃসময়ের কথা তার মনে হয়। রঞ্জিত এদেশে এসেই কি এক অসুখে ভুগে ভুগে মরে গেল। মরে গেল না কেউ মেরে ফেলল ওকে, সে বোঝে না। মানুষটা তার আদর্শ ছেড়ে দিতেই আর বড়মানুষ থাকল না। ক্ষীণকায় হয়ে গেল। বাঁচার সব উৎসাহ নিভে গেল। তবু সে মানুষটাকে সারাক্ষণ স্বামীর মতো আদরযত্ন করেছে! রঞ্জিত কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তাকাতো তখন। তুমি আমাকে মুক্তি দাও মালতী। এমন একটা চোখমুখ ছিল তার। মুক্তি তাকে দিতে হয় নি। রঞ্জিত নিজেই এ-পারে এসে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল! অথবা কখনও কখনও মনে হয় বিধবা মালতীর এ-সব ভাল নয়, স্বামীর সখ, স্বামীর সখ হইলেই মানুষটা আর তার বাঁচে না। তখন মনে হয় সে রঞ্জিতকে নিজেই মেরে ফেলেছে। ভাগ্যে যার স্বামী বাঁচে না তার কেন আবার স্বামী সোহাগিনী হওয়া! আর যার কথা মনে হয় সে সামু। সামুরে, তর কথাই ঠিক। দেশ তুই পাকিস্তান কইরা ছাড়লি। এসব মনে হলেই মালতীর কষ্টটা বাড়ে। সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না! তার একা থাকলে ভয় করে। সে নিশীথকে ধরে এনেছে। এখন থেকে নিশীথ তার বাপও বটে। নিশীথ বড় দুর্বল মানুষ। অলস প্রকৃতির! ঠিক গাভিন ছাগলটার মতো। ছাগলটা আজকালই বাচ্চা দেবে। সুতরাং ওর তাড়াতাড়ি চাল নিয়ে ট্রেনে উঠে বাড়ি ফেরা দরকার। সে ডাকল, অ বৌ।

হারুর বৌ জিলিপি কিনে এনেছিল হাট থেকে। সে বাড়িটার ভাঙা সিঁড়িতে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। একটা জিলিপি উঠে এসে মালতীর হাতে দিল।

মালতী জিলিপি খেতে খেতে বলল, আমার মনটা ভাল না বৌ।

—ক্যান ভাল না! সেই ভদ্দরলোকের কথা মনে পড়ছে?

মালতী থুথু ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সিংহের দুই চোখ যেন। শুধু খেলা দেখানো বাকি। চোখে মালতীর নীল রঙের উজ্জ্বল এক আভা। তীক্ষ্ণ রোদের তাপে চোখের মণিদুটো বড় হিংস্র দেখাচ্ছিল।

—অ মালতী, তুই এমন করতাছস ক্যান?

—আমার কি ইচ্ছা হইছিল বৌ জানস?

—কি কইরা জানমু।

—ইসছা হইছিল তার গলাটা কামড়ে ধরি।

হারুর বৌ কুসুম বুঝতে পারল রাতে সেই বাবুর অন্ধকারে চুরি করে ইতরামো করার বাসনা মালতীকে এখনও কষ্ট দিচ্ছে। অসম্মান ভেবে মালতী সারা পথ আর কারো সঙ্গে কথা বলে নি। ওর চোখ দেখলে এখন মনে হয় হিংস্র এক প্রতিশোধের আশায় সে আছে।

কুসুম বলল, গরীবের আবার মানসম্মান! গরীবের আবার ছোট-বড়!

কুসুম গম্ভীর গলায় কথাটা বলল। কুসুম গম্ভীর গলায় কথা বললে বাবুমানুষের মতো কথা বলে। এবং এই কথার দ্বারা সে নিজের সম্মানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে চায়—অসম্মান সেও সহ্য করতে পারছে না—কিন্তু দু'বেলা অনাহার আর সহ্য হচ্ছিল না। কুসুম গর্ভবতী, কুসুম চাল চোরাচালানের জন্য বের হয়ে পড়েছে।

কুসুম, গর্ভবতী কুসুম পা ছড়িয়ে বসল। ওর ছোট্ট ব্যাগ থেকে পান-সুপারী বের করে একটু পান, চুন এবং সাদাপাতা খুব আয়াস অথবা আরামের মতো মুখে ফেলে দিতে থাকল। এইটুকু সুখ—চারদিকে যখন রোদে খাঁখাঁ করছিল, চারিদিকে যখন অভাব-অনটন—তখন কুসুমের এইটুকু সুখ। মালতী জিলাপিটা আলগা করে মুখে দিয়েছিল। সে কুসুমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এক টুকরো সুপারী দ্যা বৌ। তারপর ওরা পরস্পর মুখ দেখে এক সময় চুপ করে গেল।

বিকেলের দিকে সেই মহাজন মানুষটি এসে সকলকে বড় আদর করে গদ্দিতে নিয়ে গেল। নিতাইর বাপ দলটার মোল্লা। সুতরাং নিতাইর বাপ আগে আগে হাঁটছিল। মাছ এবং আনাজের হাট পার হয়ে সরু এক গলি। আশেপাশে গেরস্থ মানুষের সংসার। ব্যবসা আছে বলে বোঝা যায় না। মালতী কুসুম এক এক করে চাল নিয়ে সেই আমলকী গাছটার নিচে এসে বসল।

মালতীর তিনটি থলে। কাঁধের থলেটা বড় এবং ডানহাতের থলেটা মাঝারি

আর প্রায় ত্রিশ সের হবে তিন থলে মিলে। কুসুম এত চাল বইতে পারবে না। সে কিছু কম নিয়েছে। শরীর ওর আর দিচ্ছে না। পাগুলো হাতগুলো ক্রমশ শীর্ণ হয়ে আসছে। মালতী থলের ভিতর হাত রাখল—চালের উত্তাপ আছে—সে চালের ভিতর থেকে দুটো একটা আবর্জনা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল যেন এই চাল কত ভালবাসার জিনিস, এই অন্ন বড় দামী এবং সোনার মতো ভালবাসা এই অন্নের জন্য সে ভেতরে-ভেতরে পুষে রেখেছে। অন্যান্য সকলে চাল আগলে বসে আছে। এখন আর এই চাল ফেলে কেউ কোথাও যাবে না। সকলে ভাল করে বেঁধে নিচ্ছিল—যেন ওরা সকলে জেনে ফেলেছে ওদের ট্রেনে চড়ে যাবার সময় নানা প্রকারের হুজ্জুতি হবে—যেন ওদের সেই নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে দিলে গলায় সোনার হার-পরা এক বাবু পান চিবুতে-চিবুতে এসে সকলের থলে গুণে চাল ওজন করে, কেজি-প্রতি একশ চাল মেপে দিয়ে তিনি চলে যাবেন। নিতাইর বাপ পিছনে চাল চোরা-চালানের হকার হয়ে লাঠি ঘুরাবে। সে বাবুর বরকন্দাজের মতো এই চালের পিছনে কত নাচবে-কুঁদবে।

সুতরাং নিতাইর বাপ দলটার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ক'টা থলে গুণল। ওর মুখে বড় একটা আব, চোয়াল বসানো, দাড়ি-কামানো নয় বলে মুখ অমসৃণ—সে এ-দলের মোল্লা, তার কত দায়িত্ব—সে প্রায় সারাক্ষণ স্টেশন এবং এই আমলকী গাছ, পুরানো জীর্ণ বাড়ির সিঁড়িতে ছোটাছুটি করছে। লালগোলা থেকে যদি চক্রবর্তীবাবু না আসে তবে মুশকিল—যার-যার দল নিয়ে যার-যার খেলা। অপরের হাতে পড়ে গেলেই—পুলিশ, থানা এবং কিছু অবিবেচক মানুষের মতো মাটে-ঘাঠে সংগ্রাম—সুতরাং নিতাইর বাপ সকলকে প্রথমে বলল, হ্যা গ মা-মাসীরা—বাড়তি পয়সা কত রাখলে?

মালতী বলল, আমার হাতে কিছু নাই নিতাইর বাপ।

—নাই ত বাবুদের পূজা দিমু কি দিয়া?

—আমারে আগে কইতে হয়। সব টাকায় চাল কিনা ফেলছি।

—ভাল করছ। নিতাইর বাপের ত একটা কপিলা গাই আছে।

—তোমার কপিলা গাই আছে আমি কইছি! মালতী রুখে উঠল।

নিতাইর বাপ মদন মালতীর দিকে এবার ভয়ে তাকাতে পারল না। ট্রেনের সেই মালতী পথ-ঘাট চিনে সেয়ানা হয়ে গেছে। মালতীকে বাবুযাত্রীর সঙ্গে বচসা করার সময় মদন বড় বেশি সতর্ক করে দিয়েছিল। এখন সতর্ক

করতে গিয়ে ফের অনর্থ কারণ মালতীর বড়-বড় চোখ—যেন সিংহের খেলা দেখানো বাকি, এবারে সে ট্রেনের ভিতর অথবা অন্য কোন মাঠে সিংহের খেলা দেখাবে। মালতী দড়ি দিয়ে থলের মুখ শক্ত করে বাঁধছিল। ওর শক্ত শরীর এবং পিঠের নিচু অংশটা দেখা যাচ্ছে। সাদা থানের ভেতরে ছিট কাপড়ের সেমিজ। মালতী সাদা থানের ভিতর ঘাড় গলা মসৃণ রেখেছে এখনও। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল বলে আমলকীর ছায়া হেলে পড়েছে। কিছু-কিছু মানুষ হাট-ফেরত গাঁয়ে ফিরছে। চাষা-বৌ মুরগী বগলে ফিরছে। ঝুড়িতে আণ্ডা নিয়ে ফিরছে পাইকার। মালতী গলা তুলে এসব দেখল। তারপর উঠে গিয়ে বলল হারুর বৌকে—আমারে একটা টাকা দে বৌ। নিতাইর বাপের (গোলামের) কথা শুনলে গা জ্বইলা যায়।

কুসুম কাপড়ের খুঁট থেকে টাকা খুলে দিল মালতীকে।

তখন অন্য এক বৌ দলে বচসা করছিল। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। আর তখন হাটের মাঠে বড় বড় হ্যাজাক জেলে দেওয়া হয়েছে। মালতীর ক্ষুধায় পেট জ্বলছিল সুতরাং মুখে গন্ধ। দুর্গন্ধের মতো। সুতরাং মুখে বার বার থুথু উঠছে। দশটার ট্রেনে উঠলে পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে। মদন আর একবার এসে সকলকে বলছিল, তোমরা মা-মাসীরা কিছু খেয়ে নাও। চিড়া-মুড়ি যা হোক কিছু। ট্রেন আসতে লেট হবে।

মালতী কিছু ছোলার ছাতু এনেছিল সঙ্গে। সে বাটিতে জল এনে ছাতুটা ভিজিয়ে খেল। বাটিটার গায়ে নিশীথের নাম। ছাতু খাবার সময় নিশীথের মুখ মনে পড়ছিল এবং ছাগলের মুখ পাশাপাশি। বাচ্চা ছাগলটা ঘরে এনে রেখেছে কিনা, পাতানো বাপ নিশীথ বড় বুড়ো মানুষ, ছাগলটা বাচ্চা হবার সময় চিৎকার করবে—মালতী একটা ছোট্ট ছাতুর দলা কুসুমকে দেবার সময় বাপের মুখ মনে করতে পারল। রঞ্জিতের মুখ মনে পড়ছে।

মদন ছুটে ছুটে আসছিল। সাতটা বাজে এখন। সে এসে বলল, এই, তোমরা মা-মাসীরা সকলে চলে এস। চক্রবর্তীবাবু সাতটার গাড়িতে চলে আসছেন। বড়বাবু তাড়াতাড়ি করতে বলছে তোমাদের।

স্টেশনের বড়বাবু রেলিঙের ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল দলটা নিয়ে মদন রেললাইনের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে। কুসুম সকলের পিছনে যাচ্ছিল। ওরা কাপড় দিয়ে কাঁখের থলেগুলো ঢেকে রেখেছে। ওরা সকলে ভয়ঙ্কর লম্বা কাপড় এবং সেমিজ পরে সকল চাল প্রায় পোশাকের ভিতর আড়াল দেবার

চেষ্টা করছিল। কুসুম ছুটতে পারছিল না। সকলে প্ল্যাটফরমে উঠে গেছে। কুসুমের জন্য মালতীও পিছনে পড়ে থাকল। এবং মালতীর শক্ত শরীর, সে ইচ্ছা করলে কুসুমকে বুকে নিয়ে স্টেশনে উঠে যেতে পারে। মালতী নিজের বাঁ হাতের ছোট্ট থলেটা কুসুমকে দিয়ে, ওর বড় থলেটা ডান কাঁধে নিয়ে ছুটতে থাকল।—তুই আয় বৌ। আস্তে আস্তে আয়। আমি উইঠা যাই।

কুসুম একটু হাল্কা হওয়ায় প্রায় মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে পারছিল। হাতে-পায়ে শক্তি কমে যাচ্ছে। ওর ছুটতে গিয়ে হাত-পা কাঁপছিল। তবু কোনরকমে সে টেনে টেনে পা দুটোকে প্ল্যাটফরমের ওপরে নিয়ে তুলল। ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এই ছোটাছুটির জন্য হাঁফ ধরছিল বুকে এবং পেটের ভিতর খিল ধরত মাঝে মাঝে। কুসুম আর প্রায় নড়তে পারছিল না। সে মালতীর আশায়, মালতী তাকে তুলে নেবে এই আশায় এবং ট্রেন এলে পুলিশেরা মহব্বতের গান গেয়ে হুইসল বাজালে মালতী কুসুমকে তুলে নেবে—মালতী যথার্থই কুসুমের বোঁচকাবুঁচকি সব তুলে দিল ভিতরে।

আর ভিতরে মানুষ-জনে ঠাসাঠাসি। ওরা একা নয়, এ প্রায় হাজারের মতো হবে। পিলপিল করে হাটের ভেতর থেকে সব উঠে আসছে। কোন এক জাদুমন্ত্রের মতো যেন—সকলে বুঝে গেছে এই ট্রেন ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে—কেবল এক চক্রবর্তী, রাজা মানুষ, তাদের নিয়ে যাবে—হাজার লোকের কাছে তিনি দেবতার মতো। বড়বাবু ছোটাছুটি করছিলেন। ট্রেনের যাত্রীরা দেখল পিলপিল করে ছোট-বড় মানুষ বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে বাঙ্কের নিচে ঢুকে যাচ্ছে। কামরার ভেতরটা অন্ধকার। আলো জ্বালা হচ্ছে না। ভেতরটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার লাগছিল মালতীর। সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে আন্দাজে কুসুমকে ঠেলে দিল বাঙ্কের নিচে। ওর বোঁচকাবুঁচকি কুসুমের মাথার কাছে ঠেলে দিল, তারপর নিজে মেঝের ওপর পা মুড়ে শুয়ে পড়ল। বুকের কাছে সব বোঁচকাবুঁচকি—সন্তানের মতো লেপ্টে থাকল। যাত্রীরা হৈচৈ করছিল। ওদের পায়ের তলায় জলজ্যান্ত এক যুবতী মেয়ে এবং আরো সব কত বুভুক্ষু মানুষের দল ঠাসাঠাসি করে শুয়ে-বসে আছে। দরজা পর্যন্ত দলটা এমনভাবে শুয়ে-বসে ছিল অন্ধকারের ভিতর, মানুষের এত ঠাসাঠাসি যে, যাত্রীরা দরজা পর্যন্ত এসে ভয়ে ভিতরে ঢুকতে সাহস করল না। ভিড়ের ভিতর দেখল অন্ধকারে শুধু মানুষের পিঁজরাপোল। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে ভিতরে এবং হা-অন্নের জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য খাচ্ছে—সুতরাং ভেতরটা

মানুষের নরক যেন এবং ওরা সব অন্নের মতো পরম বস্তু অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—মালতী দুর্গন্ধের ভিতর পড়ে থেকে নিজের চাল এবং কুসুমের চাল আগলাচ্ছিল। এ-পাশ ও-পাশ, হওয়া যাচ্ছে না, হাত পা মেলা যাচ্ছে না—সর্বত্র এই অপহরণের দৃশ্য, পা, পিঠ অথবা পাছা লাগছে। মালতী তবু ঠেলেঠুলে কুসুমের পা মেলার জন্য একটু জায়গা করে দেবার সময় মনে হল বাঙ্কের ওপর কিছু যাত্রী শুয়ে-বসে আছে। নিচে মালতীর সিংহের মতো চোখ শুধু খেলা দেখানো বাকি—মালতীর চোখ জ্বলজ্বল্ করছিল—সে তার পাছা সাপের মতো ঘুরিয়ে দিল সহসা। মনে হল বাবুটি, সেই বাবুটি ওর পাছার কাছে বসে এই অপহরণের দৃশ্য দেখে রসিকতা করতে চাইছে। সেই বাবুটি যে আসার পথে হারামজাদী বলে গাল দিয়েছিল। বাবুটি ফেরার পথে এখানে কেন, বাবুটিকে আসার পথে কোন এক স্টেশনে নেমে যেতে দেখেছিল যেন। ফের সেই বাবু মানুষটি ঠিক বাঙ্কের ওপর পদ্মাসন করে নিমীলিত চোখে বসে আছেন। মালতী বুঝল কপালে আজ বড় দুঃখ আছে। ওর উপায় থাকল না একটু সরে বসতে, শুয়ে পড়তে, অথবা সরে অন্য কোথাও স্থান করে নিতে। একবার এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলে রক্ষা নেই—তাকে একা পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং সে কুসুমের পিঠে হাত রাখল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের চাকায় এখন কারা যেন দুঃখের গান গাইছে। এই গান শুনতে শুনতে বোধ হয় কুসুম ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এক পুকুর জল, বড় বড় সরপুঁটি জলের ভিতর খেলা করছে, শাপলা-শালুকের জমি—বর্ষার দিনে ইলিশ মাছ, ভাজা গন্ধ এবং তালের মালপোয়া অথবা বর্ষার জন্য মানুষের এক পরিণত ভালবাসা; মালতী ওর দেশের ছবি ট্রেনের চাকায় দেখতে পাচ্ছিল বোধ হয়। সেই ভালবাসার ছবি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মালতী অনেক চেষ্টা করেও কুসুমকে জাগাতে পারল না। কুসুম ভোঁসভোঁস করে ঘুমুচ্ছে।

ট্রেন চলছিল, পাশাপাশি কেউ কোন শব্দ করছে না। মাঝে মাঝে স্টেশনে ট্রেন থামছিল। কিছু হকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ক্রমশ ট্রেন এবং স্টেশন কেমন নিঝুম হয়ে আসতে থাকল। শুধু মাঝে মাঝে দলের মোল্লাদের হাঁক শোনা যাচ্ছিল—মা-মাসীরা বড় সাবধানে—কোন হল্লা করবেন না, যাত্রীদের কোন অসুবিধা ঘটাবেন না। যাত্রীদের পায়ের নিচে পড়ে থাকবেন। ওদের সুখসুবিধা দেখবেন। এবং এই বাবুর জন্য মালতীর ভয়,

সুখ-সুবিধা বাবুর অন্য রকমের। এত অন্ধকার যখন, এবং মানুষে মানুষে এই ঠেসাঠেসি যখন, কোথায় কার হাত পড়েছে, পা পড়ছে অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না যখন—তখন বাবুর পোয়াবারো। এইসব ভেবে মালতী ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল। এবং ছাগলটার কথা মনে পড়ছে, ছাগলটার হয়তো চারটে বাচ্চা হবে। বাপ নিশীথ ছাগলটা বেচে দেবার মতলবে ছিল। বাপের লালসা বড় বেশি। কেননা সারাদিন বড় খাব খাব করে। এই বয়েস—বয়েস আর বাড়ছে না যেন নিশীথের—মালতীর ফেরার জন্য সে নিশ্চয়ই এখন দাওয়ায় বসে তামাক টানছে।

রাত বাড়ছে, মালতী ফিরছে না—নিশীথ হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এসে দেখল স্টেশনে পুলিশ; আর্মড্ পুলিশ সব। এ লাইনে কিছুদিন থেকে চাল চোরাচালান বড় বেশি হচ্ছে। কেউ পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না। ওরা ট্রেনে চাল এনে শহরে-গঞ্জে বেশি দরে বিক্রি করছে। দুপুরে স্টেশন পার হলে পুলিশের সামনেই চেন টেনে বুভুক্ষু নরনারী চাল মাথায় করে ছোটে। ভাগে বনিবনা না হলে এমন হয়। জনতা-পুলিশে সংগ্রাম। এখানে পুলিশের মাথা ভেঙে দিয়েছিল মানুষেরা। পুলিশের তরফে এবার কিন্তু খুব কড়াকড়ি। নিশীথ শুনল আজ খবর আছে—পরের ট্রেনটিতে প্রচুর চাল আসছে, চোরাই চাল। পুলিশেরা রেডি, ট্রেন আটকে এইসব চাল উদ্ধার করবে ওরা। নিশীথ প্রমাদ গুণল।

কামরার ভিতর মালতীও প্রমাদ গুণল। বাবু বড় বেশী ছটফট করছেন। বড় বেশি হাই তুলছেন। এবং হাত পা এদিক ওদিক ছোঁড়ার বড্ড বেশি বদঅভ্যাস। সবই অন্যমনস্কতার জন্যে হচ্ছে এমন ভাব। ট্রেন চলছিল। ভিতরে প্রচণ্ড গরম। জানালা খোলা বলে সামান্য হাওয়া ভিতরে ঢুকতে পারছে। আর এই সামান্য হাওয়ায় বাবু মানুষটা কিংবা সামান্য যাত্রী যারা বাঙ্কে শুয়ে বসে হাত পা ছড়িয়ে নিশীথে নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে অথবা যারা নিজের রসদ আগলা-বার জন্য ঘুমোতে পারছে না—এই সামান্য হাওয়া তারাই শুষে নিচ্ছিল। ঘামে মালতীর সেমিজ এবং কাপড় ভিজে যাচ্ছে। হাত পা একটু খুলে ও-পাশ হতে পারলে শরীর সামান্য আসান পেত—কিন্তু মালতীর কোন উপায় নেই—শুধু অন্ধকার সামনে, পিছনে মাঠ দ্রুত ফেলে ট্রেন ছুটছে। রাত এখন গভীর হয়ে

আসছে এবং মাঝে মাঝে সেই দ্রুত মাঠের ভিতর ট্রেনটা ভয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল যেন। আর ঠিক তখনই মনে হল ঘাড়ে কে যেন মৃদু সুড়সুড়ি দিচ্ছে মালতীর।

প্রথমে মনে হল একটা নেংটি ইঁদুর ঘাড়ের নিচ দিয়ে সেমিজের ভেতরে ঢুকে গেল। মালতী চুপ করে অন্ধকারে ঘাড়ে হাত রেখে বুঝল, নেংটি ইঁদুরটা ভীষণ চালাক। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা রাখে। সে ঘাড় গলাতে নেংটি ইঁদুরটাকে খুঁজে পেল না। শুধু বলল, মরণ!

মালতীর ঠিক ওপরে বাবু মানুষটা বাঙ্কে বসে আছে। একজন লম্বা মতন ক্ষীণকায় মানুষ, মনে হচ্ছে পিলের রুগী, বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পাশের বাঙ্কে বৃদ্ধ মতন মানুষ। এবং প্রায় বোবার সামিল। ছোট কামরা বলে আর উঠছে না। শুধু নিচে অন্ধকারে ঠাসাঠাসি করে বুভুক্ষু মানুষের নিশ্বাস পড়ছে। ওরা সকলে নিতাইর বাপ মদনের মতো এক মানুষের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুতরাং অন্ধকারের ভিতর ইজ্জতের ব্যাপার বলে কোন বস্তু ছিল না। মালতী গত রাতের মতো চিৎকার করতে পারত, ফোঁস করতে পারত অথবা চোখে সিংহের খেলা দেখানো বাকি—সে সিংহের মতো গর্জন করে উঠতে পারত। সে কিছুই না করে দম বন্ধ করে শুয়ে থাকল। ট্রেন মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। স্টেশনে এলে একটু আলো জ্বলবে—ওর ইচ্ছা তখন খুঁজে-পেতে সেই নেংটি ইঁদুরকে বের করা অথবা মানুষ বা বাবুমানুষ,—মানুষটা রহস্যজনকভাবে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। গত রাতে এই বাবু মানুষটাই ওকে হারামজাদি বলে গাল দিয়েছিল—আর যাত্রী সেজে খুব সাফ-সুতরো যুবকের মতো চলাফেরা করেছে। মালতী এবার সাহসের সঙ্গে অন্ধকারেই পরিহাস করল।

—কি! কি বললে! বাবুমানুষটির গলার স্বরে অভিনয় ফুটে উঠল।

—বাবু, আমি মালতী। আমি নিচে শুয়ে আছি বাবু।

—তুমি কোন মালতী বাছা? কাল রাতে যেতে দেখেছি ট্রেনে করে?

—হ্যাঁ বাবু কাল রাতে যেতে দেখেছেন। আজ রাতে ফিরছি।

—সঙ্গে আর কে আছে।

—হারুর বৌ আছে, নিতাইর বাপ আছে।

—মাঠ পার হতে পারবা?

—ভয় কি বাবু।

হারুর বৌ জেগে গিয়েছিল ওদের কথায়।—আমরা কোনখানে মালতী

—সামনে ধুবুলিয়া স্টেশন। তুই ঘুমো।

—হ্যাঁ ল তুই কার লগে কথা কস ?

—বাবুর লগে।

—বাবুর চোখে ঘুম আসে না।

—বলছে, আপনার চোখে ঘুম আসে না ? আপনি রাতে ঘুমোবেন না।

বাবু মানুষ বলেন, অদৃষ্ট। ঘুম আসে না রাতে। অদৃষ্ট।

মালতী বলল, ট্রেনে ট্রেনে কি করেন বাবু।

বাবুটি এবার হাই তুলে বলল, তোমার দলে কতজন ? আঠারজন বুঝি।

—বাবু সব গুনে-গেঁথে রেখেছেন দেখছি।

বাবুটি এবার বিজ্ঞের মতো অন্ধকারেই হাসল।

কুসুম কুঁকড়ে ছিল নিচে। ধুলোবালি কাপড়ে সেমিজে কাদার মতো লেগে আছে—ঘামে নিচটা জবজব করছিল। বাবুর বিজ্ঞের মতো হাসি ওপরে এবং বাঙ্কের নিচে কুসুম—ওর পিরীতের কথা মনে পড়ছিল। কুঁকড়ে থাকার জন্য এবং মালতী লেপটে থাকার জন্য কুসুম নড়তে পারছিল না। সে কোনরকমে হাতটা ডানদিকে এনে মালতীকে একটা চিমটি কাটল।

—বৌ, ভাল হইব না।

—হ্যা ল, বাবুর লগে পিরীতের কথা ক্যান।

মালতী পায়ের নিচ পর্যন্ত বাঁ হাতে কাপড় টেনে ফিসফিস করে বলল, মানুষটারে ভাল মনে হইতেছে না। পুলিশের লোক। চুপ কইরা থাক।

কুসুম যথার্থই ভয় পেল। স্টেশনে পুলিশ অথবা হোমগার্ডের লোক আছে। সেখানে নিতাইর বাপ আছে, বড়বাবু আছেন স্টেশনের, চক্রবর্তীবাবু আছেন। কিন্তু যে মানুষটা গা ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে—তাকে বড় ভয় কুসুমের। সে এবার বলল, বাবুরে কইয়া ছাখ না, বিড়ি খায় কিনা।

মালতী বলল, তুই বলে ছাখ।

কুসুম বাঙ্কের নিচে থেকে বলল, নিতাইর বাপেরে ডাকুম নাকি ?

মালতী বলল, ডাকলে অনর্থ বাড়বে বৌ। ওরা এত ফিসফিস করে কথা বলছিল যে বাবুমানুষটি কান খাড়া করেও বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পরেছেন না। তিনি তবু বিচক্ষণ পুরুষের মতো বসে থাকলেন। তিনি কাশলেন, হাত-পা নাড়লেন এবং মুখ জানালায় বের করে স্টেশনে পৌছতে কত দেরি দেখলেন। তাঁকে দেখে

এ সময় মনে হচ্ছিল তিনি কোথাও কোন খবর পৌছে দিতে চান।

বাবু স্টেশনে নেমে একটা কার্ড দেখাল স্টেশনের বড়বাবুকে, আপনাদের ফোনটা দেবেন ? বলে সে তার কার্ড বের করে ধরল।

—হ্যালো। কে ? স্যর আছেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। হিসাব করে দেখলাম প্রায় চারশতের মত লোক যাচ্ছে চাল নিয়ে।

—তা'হলে বড় দল একটা আনতে হয় ! আমার সঙ্গে মাত্র দশজন আছে।

—ওতে হবে না স্যর। মাঠের ভেতর দিয়ে সব তবে নেমে যাবে পিঁপড়ের মত।

—তা'হলে বড় একটা এনকাউন্টার হবে বলতে চাও।

—মনে তো হচ্ছে। বলে মানুষটা ফের গা ঢাকা দিয়ে এসে বাঙ্কে বসে পড়ল। আসার আগে বড়বাবুকে বলে এল—খুব গোপন রাখতে হবে স্যর। তা না হলে আপনার আমার দু'জনের মুশকিল।

আর মদন এবং সব মোল্লারা হেঁকে হেঁকে যাচ্ছিল তখন—মা-মাসীরা বড় দুর্যোগ। মা-মাসীরা আমরা স্টেশন পর্যন্ত যাব না। তার আগে ভাঙা পোলের কাছে—সেই বড় পুরনো বাড়িটার কাছে চেন টেনে নেমে পড়ব। আপনারা মা-মাসীরা ভয় পাবেন না। আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য চাল নিয়ে যাচ্ছি। মা-মাসীরা কোন চুরি করছি না। জানালায় জানালায় মুখ বাড়িয়ে দলের মোল্লা হেঁকে গেল—আমরা যা করছি সন্তান-সন্ততিগণের প্রতিপালনের জন্য করছি। আমরা চুরি করছি না, চুরি এটাকে বলে না।

কুসুম বলল, নিতাইর বাপ কি কইল মালতী ?

—কইল, আমরা আগে নাইমা যামু। চেন টাইনা গাড়ি থামাইয়া দিব।

কুসুমকে চিন্তিত দেখাল। অন্যান্যদিন ওরা স্টেশনে নেমে কাঁচা পথ ধরে ছোটার অভিনয় করে। অভিনয় রসের। স্টেশনের মাস্টারবাবুরা তখন হাসেন। না ছুটলে বড় গালমন্দ করেন। একেবারে চোখের ওপর চুরি। চুরিতে আরাম হারাম। তোরা ছুটলে অন্তত আমরা থেমে থাকতে পারি। অথচ আজ গাড়ি তার আগেই থেমে যাবে। চক্রবর্তীবাবুর হাতে আর কোন কৌশল

নেই কুসুম ভাবল, আর কোন কৌশল নেই যার সাহায্যে তিনি ট্রেনটাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারেন। সেই ভাঙা পোলের পাশে থাকলে···অনেকদূর তাকে এই বোঁচকাবুঁচকি টেনে নিয়ে যেতে হবে। না গেলে অনাহার। শিশুসন্তানেরা বাড়িময় হাঁসের বাচ্চার মতো কেবল প্যাঁক পাঁক করছে। জননী ফিরলে হাঁসের বাচ্চাগুলো শান্ত হবে। কুসুমের এতটা পথ হাঁটার কথা ভেবে চোখে জল আসতে চাইল। কারণ পেটের ভিতর নতুন বাচ্চাটাও প্যাঁক প্যাঁক করে কুসুমকে মাঝে মাঝে জ্বালাতন করছে। সুতরাং সে পেটের ওপর হাত রেখে বার বার বাচ্চাটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। অনাহার কুসুমের দিনমান—সুতরাং ভিতরের বাচ্চা কেবল খাই খাই করছে। কুসুম রাগে দুঃখে স্বামীকে মনে মনে গাল পাড়তে থাকল—মানুষটা মরে না ক্যান। মরলে হাড় জুড়ায়।

মালতী বলল, কার কথা কস।

—আর কার কথা! বলে কুসুম বুঝতে পারে না মনের ভেতর কথা রাখার অভ্যাস তার কবে শেষ হয়ে গেছে।

মালতী দেখল বাবু সামনের স্টেশনেও নেমে গেল।

—হ্যালো, স্যর আছেন। সে ফোন তুলে অনুসন্ধানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি।

—ওরা চেন টানবে বলছে।

—চেন টানবে!

—হ্যাঁ, চেন টানবে। ওরা ভাঙা পুলের কাছে চেন টানবে বলছে।

—ওখানে শালগাছের বড় বন আছে না?

সঙ্গে সঙ্গে জানালায় মোল্লাদের সকলের মুখ দেখা গেল। আপনারা চেন টানার সঙ্গে সঙ্গে মা-মাসীরা বের হয়ে পড়বেন। আপনারা আর শুয়ে থাকবেন না। আমাদের সামনেই নামতে হবে। বোঁচকাবুঁচকি সব কাঁধে হাতে নিয়ে রেডি থাকেন।

বাবুটি মালতীর ঘাড়ে শেষবারের মতো নেংটি ইঁদুরগুলো অন্ধকারে ছেড়ে দিতে চাইল। মালতী অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বার বার সেই ইঁদুরটাকে মালতী ঘাড় গলা থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষবার সে কিছুতেই পারছে না। বাবুর হাতটা ক্রমশ শক্ত হয়ে মালতীর শরীরের ওপর থাবা পেতে বসছে।

মালতীর চোখে সিংহের খেলা দেখানো বাকি—সে শক্ত হাতে এবার ছুঁড়ে ফেলে দিতেই বাবুটি বলল, কোথায় নামবে বাছারা! ভাঙা পোলের কাছে নামবে?

কুসুম জানতো না অন্ধকারে বাবুমানুষটি মালতীর মতো যুবতীর সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করছে। মালতী, অসহিষ্ণু মালতী মোল্লাদের ভয়ে এই যাত্রী মানুষটাকে কিছু বলতে পারছে না, সে রাগে দুঃখে এবং অসম্মানের ভয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের এখন নেমে যাবার তাড়া। তারা উঠে অন্ধকারেই নিজের নিজের বোঁচকা ঠিক করে নিচ্ছে। এবং অন্ধকারে ট্রেনটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেলে বাবুমানুষটি বললেন, কোথায় নামবে বাছারা। পুলিশের বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? বন্দুকের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে আসছে না।

কুসুম হাউমাউ করে কেঁদে দিল, আমাদের কি হবে বাবু।

বাবুটি বিজ্ঞের মতো হাসলেন—যেখানে আছ সেখানে থাকো। এক পা নড়বে না।

মালতী বলল, ওদের যেতে দেন বাবু। আপনি পুলিশের লোক, আমাদের মা-বাপ।

বাবুটি বললেন, কেউ নামবে না বাছারা। বাবুটি এবার সাধারণ পোশাক খুলে ব্যাগের ভিতর থেকে হুইসিল বাজাল।

তখন নিতাইর বাপ চিৎকার করে জানালায় জানালায় ছুটে যাচ্ছিল।

—তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না। মাঠের ভিতর নেমে যাও। অন্ধকারে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাও। পুলিশে ট্রেনটাকে ঘিরে ফেলেছে।

মালতী বলল, বৌ, তুই নেমে যা! আপনারা যারা আছেন নেমে যান। বাবুটি বলল, না, কেউ নামবে না!

—তোমরা নেমে যাও মা-মাসীরা—বলে সে বাবুটির কাঁধে মাথা রাখল অন্ধকারে।

পুলিশের দলটা জানালা দিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছে। অন্য দরজা দিয়ে কুসুম নেমে গেল। অন্ধকারের ভিতর মালতী টের করতে পারছে। মালতী এবার নিজের বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর নেমে যেতে চাইলে পেছন থেকে বাবুটি ধরে ফেলল।

মালতী চাল ফেলে অন্ধকারে ছুটতে চাইলে বাবুটি দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু অন্য দরজায় পুলিশ—বাবুটি ভাল মানুষের মতো দরজা খুলে বলল, দেখ এখানে কিছু চাল আছে। তুলে রাখ।

মালতী বোঁচকাবুঁচকি ফেলে ছুটছে। যেদিকে কুসুম চলে গেছে সেদিকে ছুটছে। বাবুটি মালতীকে অনুসরণ করছেন।

সামনে মস্ত শালের জঙ্গল। চাঁদের আলোতে এই বন এবং সামনের প্রান্তর বড় রহস্যময় লাগছিল। মানুষের সোরগোল। কান্নাকাটি এবং চিৎকার শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ট্রেনটা একটা বড় জন্তুর মতো একা পড়ে চিৎকার করছিল যেন। মালতী ছুটে ছুটে কুসুমের কাছে চলে গেছে। সে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়ছিল—দেখল এদিকটা ফাঁকা। সামনের মাঠে কিছু মানুষের সোরগোল পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে পুলিশের দলটা কিছু লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাবার জন্য সেখানেও একধরনের হায় হায় রব। পুরানো ভাঙা বাড়ি দেখা যাচ্ছে দূরে। সে যাবার পথে এক বৃদ্ধকে এই পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে পড়তে দেখেছিল। বোধ হয় সেই মানুষ এখনও সেখানে আছেন। দেয়ালের ফাঁকে তার ভাঙা হারিকেন জ্বলছিল—সেই আলো দেখে সে কুসুমকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম চলতে চলতে বলল, পেটে কামড় দিছে!

মালতী ওর সব চাল বোঁচকা কাঁধে হাতে নিয়ে বলল, ইবারে হাঁট বৌ।

তখন পিছন থেকে বাবুটি বললেন, কোথায় যাবে বাছা!

কুসুম হাউমাউ করে বাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

এদিকটা ফাঁকা এবং নিঃসঙ্গ। সামান্য দূরে শালের জঙ্গল। এবং প্রান্তরের ভিতর শুধু ইঞ্জিনের আলোটাকে দেখা যাচ্ছে। এই পোড়ো বাড়ির দিকে কেউ ছুটে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু সেই বাবুটি দাঁড়িয়ে আছে। খুব বলিষ্ঠ মনে হচ্ছিল, দেখতে সেই উঁচু লম্বা মানুষ দারোগাবাবুর পায়ে কুসুম পড়ে পড়ে কাঁদছিল।

বাবুটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, চাল নিয়ে কোথাও যেতে দেব না বাছা। আমরা পুলিশের লোক। আমরা আইন অমান্য করলে সরকারের চলবে কি করে?

মালতী বলল, যেতে দিন বাবু! আমিও আপনার পায়ে পড়ছি!

বাবুটি হাসলেন, আইন অমান্য করলে কারো রেহাই নেই। তুমি ত মালতী। যাবার পথে তুমি আমাকে কি বলে গালমন্দ করেছিলে ভুলে গেছ।

হায়, সিংহের খেলা দেখানোর চোখ মালতী ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। বলল, বাবু আমরা অবলা জীব, আমাদের কথা ধরতে নেই।

—অবলা জীবের মতন তো দেখতে মনে হচ্ছে না।

মালতী কুসুমকে এবার ঠেলা দিল, এই তুই করছিস কি বৌ, হাঁটতে পারছিস না! নে—বলে চালের বোঁচকা কুসুমের কাঁধে দিয়ে বাবুটিকে বলল—কত বড় মাঠ দ্যাখছেন বাবু!

—দেখছি।

—আমার সঙ্গে আসেন। দেখবেন কত লোক সেখানে চাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বোচকার জন্য একশটা বোঁচকা চলে যাচ্ছে।

বাবুটি বললেন, কি করে জানলে?

—আপনাদের হুজুর পুলিশের লোক তো সব রাস্তা চেনে না।

—তা ঠিক বলেছ।

মালতী কুসুমকে বলল, এই বৌ, তুই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারস না!

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি হাঁট বাছা।

—কি করে হাঁটবে বলুন। আট মাসের পোয়াতি। মালতী হাঁটতে থাকল।

—তা বটে। তুমি কোথায় চললে মালতী?

—মাঠে চলেছি বাবু। মালতী পথ দেখিয়ে চলল।

—আর কতদূর নিয়ে যাবে?

মালতী বুঝল কুসুম ভাঙা পুল পার হতে পারে নি। আরও কিছু সময় বাবুটিকে ধরে রাখতে হবে। নতুবা কুসুমের চাল যাবে—কুসুম ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। ওর বাচ্চাগুলো প্যাক প্যাক করবে।

বাবুটি যেন ওর চাতুরী ধরে ফেলল, এবং বলল, চালাকি করার জায়গা পাস না। তুম করে পাছার ওপর লাথি মেরে দিল।

মালতী রাগ করল না। সে ভাবল, আহা, ছাগলটা আমার চারটা বাচ্চা দেবে। সে বাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবং বলল, হুজুর একবার দ্যাখেন আমাকে।

বাবুটি এবার পিছন ফিরে মালতীকে দেখল। এত বড় প্রান্তর, ঠাণ্ডা বাতাস নেই প্রান্তরে। দূরে শালবনের ভেতর থেকে পোড়ো বাড়ির আলোটা শুধু এক চোখ বাঁদরের মতো মনে হচ্ছে। কোথাও এতটুকু প্রাণের উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড় বড় ফাটল—দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয় নি—ধরণী ফেটে চিরে একাকার। জ্যোৎস্নারাতের জন্য ভয়। এই মাঠে বাবুটি মালতীর নগ্ন দেহ দেখে এতটুকু নড়তে পারল না। মালতী এই শস্যবিহীন মাঠে পাথরের মতো শুয়ে থেকে বলছে, হুজুরের ইসছা হয়?

—হয়।

সেই হবার মুখে মালতী জীবনে সব অত্যাচারের গ্লানি দূর করার জন্য শক্ত দাঁত দিয়ে বাবুটির কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল। এবং এ সময় দেখা গেল দূরে, এক চোখ বাঁদরের মতো আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। আলোটি নিভে গেল। শালের বন এবং শস্যবিহীন এই প্রান্তরে সিংহের খেলা দেখানো বাকি এমন এক চোখের বেদনা টপটপ করে এই প্রথম অসতী হবার জন্য চোখের জল ফেলছিল। আর মনে হল দূরে সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তর থেকে কারা যেন খালি ট্রেনটিকে ঠেলে ঠেলে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রেন ঠেলে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য মালতীও দলের মধ্যে ভিড়ে গেল। ওর দাঁতে মুখে রক্তের স্বাদ লেগে ছিল। ট্রেনে ঠেলে নেবার সময় সেই নোনা রক্তের স্বাদ চেটে চেটে চুষে নিচ্ছিল মালতী।

এভাবে বাংলাদেশে কিছু সময় কেটে গেল। এভাবে বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুআরি চলে এল একদিন।

সারারাত জেগেছিল বলে সফিকুর এখন হাই তুলছে। বড় খাটুনি গেছে। সারারাত সে এবং তার কলেজের বন্ধুরা মিলে শহরময় পোস্টার মেরেছে। ঘরে ঘরে মেয়েরা পোস্টার লিখে দিচ্ছে আর ওরা দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিয়ে এসেছে। কলেজের মেয়েদের ওপর ছিল পোস্টার লেখার ভার। ওদের কাজ সেগুলো সকাল না হতে মেরে দিয়ে আসা। সকাল হলেই শহরের মানুষেরা দেখবে কারা যেন রাতারাতি এই শহরকে ২১শে ফেব্রুআরির জন্য নানা রঙের ফেস্টুনে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। উৎসবের মতো এই শহর—প্রায় ঈদ মুবারক।

সফিকুর এইমাত্র ঘরে ফিরেছে। ফিরেই হাতমুখ ধুয়েছে। অন্য দিনের মতো সে সাইকেলটা বারান্দায় তুলে রাখে নি। কারণ সে আবার সাইকেলে দেখতে বের হবে—রাতে রাতে ওরা কতদূর পর্যন্ত পোস্টার মেরে আসতে পেরেছে। সুতরাং সাইকেলটা বাইরে রেখে নিত্যদিনের মতো একটু টেবিলে গিয়ে বসা।

সকালে সে দুটো একটা কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসে। অথবা আজ যেন সারাটা দিন শুধু কবিতা আবৃত্তি আর গান। মাঠের ভাষা, বাংলা ভাষা। মানুষের ভাষা বাংলা ভাষা। এমন দিনে সে কবিতা পড়বে না তো কবে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল থেকে সে কবিতা পড়তে ভালবাসে। ফতিমা এলে সে জীবনানন্দ আওড়ায়। ফতিমা কাছে থাকলে তার অন্য কবিতা আর ভাল লাগে না—সে তখন ফতিমার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর ধীরে ধীরে কেমন এক অসীমে ডুবে যাবার মতো সে ফতিমার কাছে ঘন হয়, যেন চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে তার মুগ্ধ স্বভাবের ভিতর ডুবে যাবে এবার, বলবে, কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় ফসলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ জানি নাকো ;—তবু যেন মরি এই মাঠঘাটের ভিতর…। এই যে দেশ, বাংলাদেশ, এমন দেশটি খুঁজে কোথাও পাবে নাকো তুমি—ফতিমার ছোট ছোট কালো বেথুন ফলের মতো চোখ দেখতে দেখতে সফিকুরের এমন মনে হলে বলে, আমি যাব তোমার

দেশে। সোনালী বালির চরে সূর্য ওঠা দেখব। তরমুজের জমিতে ঈশমনানার ছুই দেখব। আর দেখব সেই অর্জুন গাছ। গাছে গাছে এখন কত না ডালপালা। তুমি আমি তার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের বাংলাদেশ দেখব। ফতিমা এসব শুনলে কেমন চুপ হয়ে যায়। চোখমুখ বড় ভারি, গম্ভীর এবং কথা বলতে চায় না। তখন সফিকুর অকারণ হাসে। ফতিমাকে রাগিয়ে দিতে না পারলে সে মজা পায় না। ফতিমা কথা না বললে সে জানে একটু খোঁচা দিলেই সে কথা বলবে। রাগাবার জন্য তখন সে বলবে, ওডা আবার একটা ছ্যাশ নাহি! সফিকুর ফতিমার মতো বাঙাল টান রাখবে গলায়। তখন ফতিমা আরও ক্ষেপে যায়। রাগে অভিমানে মুখ ভার করে থাকে। চায়ের কাপ হাতে থাকলে সেটা ফেলে ভিতরে চলে যায়। মাঝে মাঝে সফিক ওর কথা নিয়ে বড় বেশি ব্যঙ্গ করে। সে আর রাগ চাপতে পারে না। আর রাগের মাথায় কথা বললে ওর মুখে তখন আরও বেশি বাঙাল কথা বের হয়ে আসে। সফিকুরের সঙ্গে ফতিমা কিছুতেই বাঙাল কথা বলতে চায় না। যতটা সে পারে ধীরে ধীরে বইয়ের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। কঠিন কাঠ কাঠ গলা না করে খুব সুন্দর এক জলতরঙ্গ আওয়াজের মতো গলা করার চেষ্টা করে। এবং তখনই যত দুষ্টবুদ্ধি সফিকুরের। ওর ইচ্ছা কেবল ফতিমা ওর সঙ্গে বাঙাল কথা বলুক। এমন সুন্দর করে সে যে কি করে কথা বলে; প্রাণের ভিতর কেমন মায়া জাগানো ওর গলার স্বর। ফতিমাকে বাঙাল কথার ভিতর যতটা চেনা যায়, ওর মতো কথা বললে তেমন চেনা যায় না।

আঞ্জুর সঙ্গে সাধারণত সফিকুর ফতিমাদের বাড়ি যায়। ফতিমাকে যে সফিক ভাই অকারণ রাগিয়ে দিতে ভালবাসে বার বার বলেও সে তা ফতিমাকে বোঝাতে পারে না। তখন তার সোজাসুজি বাংলা কথা—আর কইয়েন না। ঠিক নিয়া যামু একবার আমাগ নদীর চরে। ছ্যাখবেন ছ্যাশ কারে কয় একখানা। আপনেগ ছ্যাশ আবার ছ্যাশ নাহি? দুধ-মাছ পাওয়া যায় না। মানুষগুলাইন গঙ্গার পানি খাইয়া থাকে। ইলিশ মাছ মিলে না গণ্ডায় গণ্ডায়। আছে কিডা তবে?

—কেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছে। বিদ্যাসাগর নজরুল আছে।

—ছাড়ান ছ্যান। আমাগ নাই কিছু বুঝি মনে করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, হকসাহেব, জীবনানন্দ অগ বাড়ি কলিকাতায় আছিল, না!

—আমি বলেছি ওদের বাড়ি কলকাতায় ছিল?

—তবে মুর্শিদাবাদে।

সফিকুর মুর্শিদাবাদের ছেলে। কথায় কথায় ফতিমা রেগে গেলে বলবে, মীরজাফরের দেশের মানুষ ভাল হবে কি করে? বিশ্বাসঘাতক। এ দেশের নুন খাবে, এ দেশটাকে বলবে—এডা আবার ছ্যাশ নাহি। কোনটা দেশ। এমন পলাশফুল শীতে কোথাও ফোটে? এমন শিমুলের বন আপনি নদীর পাড়ে পাড়ে আর কোথাও দেখেছেন? কি বলুন। চুপ করে কেন। তারপর চুপচাপ যেন বলার ইচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষ আমার সোনাবাবুকে পৃথিবীর আর কোথায় পাবেন? কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সোনার কথা মনে হলেই গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।

কত অকারণ এই ঝগড়া। অথচ এমন না হলে ভাল লাগে না সফিকুরের। সে এমন না হলে ফতিমাকে ঠিক চিনতে পারে না। অভিমানে তখন ফতিমা আর তার বাড়ি আসে না। সেও যায় না। কিন্তু কতদিন! ফতিমা নিজেই পারে না। আঞ্জুর সঙ্গে চলে আসে। যেন সে সফিকুরের কাছে আসে নি। সফিকুরের সঙ্গে কোন দরকার নেই। যত দরকার তার মায়ের সঙ্গে। যত গল্প তার মায়ের সঙ্গে। যাবার সময় দেখাও করে যেত না বোধ হয়। কেবল আঞ্জু টেনে নিয়ে আসে বলে দেখা না করে পারে না। সফিকুর তখন এই অকপট মেয়ের কাছে ধরা দিতে ভালবাসে। সে আর তাকে অবহেলা করে না।

রাস্তা পার হলেই ফতিমাদের সুন্দর কাঠের রেলিং দেওয়া বাড়ি। নানারকম ফুলের গাছ মাঠে। একটা দেবদারু গাছ আছে। তার নিচে ছোট্ট কাঠের চেয়ার। ঘাস মসৃণ। সামসুদ্দিনসাহেব শীতের দিনে সেখানে বসে রোদ পোহান। ফতিমা যখন বাবাকে চা দিয়ে আসে সফিকুর তার দোতলা ঘর থেকে দেখতে পায়। সুন্দর একটা নীল রঙের শাড়ি পরতে ফতিমা ভালবাসে। যখন সদর পার হয়ে টুক করে ওদের বাড়িতে ঢুকে যায়, কি অকারণ তখন ফতিমার ভয়। সবাই দেখে ফেলল এই ভয়। সে বার বার আঁচলে মুখ মুছতে থাকে। কেন যে মুখে এমন ঘাম, সফিকের কাছে যেতে গেলেই ঘাম, আঁচলে বার বার মুছেও মুখের প্রসাধন সে ঠিক রাখতে পারে না। ফতিমা সফিকের কাছে এলে সেজন্য প্রসাধন করে আসে না। কারণ সে জানে সফিকের কাছে এসে সে তার প্রসাধন ঠিক রাখতে পারবে না। ফতিমা ঘামলে কপাল না মুছে পারে না। ভিতরে ভিতরে এভাবে সফিকের জন্য কি একটা মায়া গড়ে

উঠেছে। সফিকও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায় না। সামসুদ্দিনসাহেব ওর জন্য খুব করেছেন। এই শহরে সে রিফুজি। সামসুদ্দিনসাহেবের আপ্রাণ চেষ্টা না থাকলে সে তার সংসার চালিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারতো না। আর এই এক মেয়ে যে তাকে আরও সব নতুন উদ্যমের কথা শোনাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে একা একা শীতের রাতে টের পায় কোথাও এই মেয়ের প্রাণে বড় একটা ক্ষত আছে। ফতিমা কেন যে মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে যায়। তখনই দেয়ালের বিচিত্র পোস্টার, সেই পোস্টারে বুঝি নতুন সংগ্রামের কথা লেখা হচ্ছে। সফিক ফতিমার সঙ্গে সেই সংগ্রামের শরিক হতে চায়। ওরা রাত জেগে তখন পোস্টার লেখে।

সফিকুর বই সামনে রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকল। ওর মা কখন চা রেখে গেছে সে টের পায় নি। সে জানালায় শীতের সূর্য উঠতে দেখছে। সূর্যের আলোতে শত শত পোস্টার দেয়ালে সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে। বার বার সেইসব পোস্টারের লেখাগুলো ওর চোখের ওপর ভেসে যাচ্ছে। পোস্টারে ফতিমা, আঞ্জু আরও সব মেয়েরা সারারাত লিখে গেছে, বড় বড় অক্ষরে লিখে গেছে—মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা। কোন পোস্টারে ফতিমা ওর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে—একুশে ফেব্রুআরি পালন করুন। আঞ্জু লিখেছে—নাজিম-নরুল চুক্তি রোখো, নইলে সুখের গদি ছাড়।

দেয়ালে দেয়ালে এমন সব বিচিত্র পোস্টার। সে জানালা খুলে, সারারাত যেসব পোস্টার মেরে এসেছে, যা সে দাঁড়িয়ে দেখার সময় পায় নি, এখন এই সকালে তার কিছু কিছু দেখে তার বুক কেমন ভরে উঠেছে। তার হেঁটে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। যেন হেঁটে গেলে অজস্র পোস্টারের ভিতর কোনটা ফতিমার হাতের লেখা সে চিনতে পারবে। এমন নিবিষ্ট হয়ে কে আর রাতের পর রাত পোস্টার লিখে গেছে! সে তার পোস্টারে বার বার বাংলাদেশ কথাটা নিচে লিখে দিতে চেয়েছে। কখনও বোঝা যায় রাগে অথবা বড় অভিমানে সে একটা গাধার লম্বা মুখ এঁকে দিয়ে নাজিম নুরুলের ছবি আঁকতে চেয়েছে। এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। কে যে তাকে এমনভাবে প্রেরণা দিচ্ছে সফিক বুঝতে পারছে না। একটানা ফতিমা উপুড় হয়ে কাজ করে গেছে। আজ ভোর রাতে শুধু সে একবার গিয়ে দেখেছে যারা লিখছে তাদের ভিতর ফতিমা নেই। ফতিমাদের নিচের বারান্দায় কাঠের রেলিঙের ধারে মোমের আলোতে সবাই লিখে চলেছে। শেষ রাতের দিকে শহরের আলো নিভে গিয়েছিল—ওরা অন্ধকারে চুপচাপ বসে

থাকে নি, মোমের বাতি জ্বালিয়ে নিয়েছে। তুলির এক-এক টানে ওরা এক-একটা পোস্টার শেষ করেছে।

সফিকুর ফতিমাকে না দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছিল। সে নেই, এটা সে ভাবতে পারে না। সে গিয়ে শুয়ে আছে, আর সবাই লিখছে এটা ভাল দেখাচ্ছে না। সে ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হয়ে উঠেছে। পোস্টারগুলো একসঙ্গে করে বড় প্যাকেট করল একটা। কেরিয়ারে বেঁধে নেবার সময় ভাবল আঞ্জু অথবা রমাকে বলবে, ফতিমা কোথায়? কিন্তু যে মেয়ে ওকে না বলে ভিতরে শুতে চলে যায় তার সম্পর্কে খোঁজখবর করতে আর ইচ্ছা হয় না। কী ভীষণ ঠাণ্ডা। হাত-পা শীতে সাদা হয়ে গেছে। ফতিমার এ সময় এটা ঠিক হয় নি। মনে মনে সে ফতিমার হয়ে কার কাছে যেন ক্ষমা চাইছে। আর তখনই সে দেখল দোতলার রেলিঙে চুপচাপ একা ফতিমা। অস্পষ্ট আলোতেও সফিকুর চিনতে পারে সব। মাথার ওপর শীতের আকাশ। বুড়িগঙ্গা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। কিছু পালের নাও হয়তো এখন উজানে বৈঠা মারছে। সে এমন একা দাঁড়িয়ে আছে কেন, শীতের রাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে কেন—এই সব জিজ্ঞাসা করতে সাইকেল ফেলে ওপরে উঠে গেল। ডাকল, এই ফতিমা।

ফতিমা পেছন ফিরে তাকাল না। বুঝি সে শীতের আকাশ দেখছে। রাত ফর্সা হতে দেরি নেই। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবার প্রভাতফেরিতে বের হবে। ফতিমা বুঝি ওদের মুখে বাংলাদেশের গান শুনতে পাচ্ছে। সকাল হলেই একুশে ফেব্রুআরির ডাকে মা-বোনেরা জেগে উঠবে।

সফিক ফের বলল, ফতিমা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! শরীর খারাপ লাগছে? তারপর সফিক কি বলবে ভেবে পেল না। তা'ছাড়া এখানে এ সময়ে বেশি সময় দু'জন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। কেউ দেখে ফেললে সামসুদ্দিন সাহেবের কানে উঠতে পারে। যতবারই সে ফতিমার সঙ্গে থাকে প্রায় দল বেঁধে থাকে। একবার সে আর ফতিমা মধুর ক্যান্টিনে একা বসে থাকলে, ফতিমা ভীষণ অস্বস্তিতে বিরক্ত বোধ করেছিল। বলেছিল, সফিক ভাই, আমি বাড়ি যাব।

সফিকুর বুঝতে পেরেছিল সেদিন, ফতিমা চায় না ওরা দু'জনে এভাবে একা পালিয়ে পালিয়ে দেখা করে। নিজের মানুষ চুরি করে দেখতে যাওয়া বড় অপমানের। সে সেই থেকে কখনও ফতিমাকে আর কোথাও একা দাঁড়িয়ে

থাকতে বলে নি। এখানেও সে আসত না। তবু কেন যে এমন শীতের রাতে ওকে এভাবে একা দেখে সফিকুর বিচলিত হয়ে পড়ল। সে চুপি চুপি উঠে এসেছে। ফতিমা ওর কথার কোন জবাব দিচ্ছে না। ফতিমা হয়তো এভাবে আসা তার পছন্দ করছে না। সফিকুরের ভিতরটা দুঃখে কেমন ভার হয়ে গেল। বলল, আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি শেষবারের মতো এগুলো সেঁটে বাড়ি চলে যাব। তোমরা সাবধানে থেকো।

ফতিমার কেমন চমক ভাঙল। সে ঘাড় ফেরাল, দেখল সে আর সফিক বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ওর গায়ে সেই বাদামী রঙের পাঞ্জাবি, খোপকাটা লুঙ্গি আর পায়ে এক জোড়া স্লিপার। চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছে হাত-পা শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সফিক কাশছে। এ সময় ওকে একটু চা করে দিলে বড় ভাল হত। ওকে কাশতে দেখেই যেন বলল, প্যাকেটগুলো রেখে দিন। অন্য কাউকে দিয়ে ওগুলো দেয়ালে সেঁটে দেব। আপনি বরং বসুন। চা করে আনছি। দেরি হবে না।

—আরে না না। এখন আর ঝামেলা বাড়িও না। রাত ফর্সা হতে না হতে হাতের কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। আমি যাচ্ছি। বলেই সে দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে? এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ!

ফতিমা হাসল। —না না। কে কি বলবে!

—কি জানি, কত রকমের কথা উঠতে পারে। এ ক'দিন যেভাবে বেহুঁশ হয়ে আমরা পোস্টার লেখা, সাঁটা এবং দল বেঁধে কাছাকাছি থেকেছি, কথা উঠতে কতক্ষণ।

—এদিনে এমন বলতে নেই। তুমি সাবধানে থেকো। এই প্রথম সে সফিককে তুমি বলে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার জন্য তুমি ভেবো না!

সফিকের মনে হল সারা উপত্যকায় ফুল ফুটে আছে। সে ফতিমাকে নিয়ে উপত্যকাময় কেবল ছুটছে। শীতের রাতে যে সামান্য উষ্ণতা তার দরকার ছিল ফতিমার এমন কথায় সে তা ভুলে গেল। বলল, যদি খোঁজ করতে চাও মেডিক্যাল হোস্টেলে যেও। আমাকে সেখানে পাবে। আমরা সেখান থেকেই ১৪৪ ধারা ভাঙব ভাবছি।

ফতিমা বলল, তোমার সঙ্গে সারাদিন আমার ঘুরতে ইচ্ছা হচ্ছে সফিক। এমন দিন তো আর আমাদের আসবে না।

সফিকের মনে হল শীতে যেন কাঁপছে ফতিমা। সে বললে, এখানে দাঁড়িয়ে আর ঠাণ্ডা লাগাবে না। ভিতরে যাও।

ফতিমা অনুগত ছাত্রীর মতো নেমে যেতে থাকলে ফের ডাকল, আচ্ছা, তুমি এখানে এই ঠাণ্ডায় চুপচাপ কেন দাঁড়িয়েছিলে? এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেন জানি ভয় হয়।

বলল, এমনি। মনের ভিতর কি যে কখন হয় কেউ তা বলতে পারে না। সারারাত ফতিমা আর একজন মানুষের চোখমুখ ভেবেছে এবং গভীরে ডুবে গেলে শরীরে তার চন্দনের গন্ধ টের পায়। সে যেন তার পাশেই দাঁড়িয়ে বলছে, ফতিমা, তুই কি ভাল ভাল কথা লিখে যাচ্ছিস রে। আমি কি লিখব? আমাকে তোর পাশে বসে লিখতে দিবি?

—কেন দেব না?

—কি জানি, যদি না দিস। যদি বলে দিস, তুমি স্বার্থপর। তুমি বাংলা-দেশের মানে জান না। তোমার কোন অধিকার নেই লেখার।

—যা, এমন বলব কেন! আমি তো বাপু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই লিখে যাচ্ছি। আমি যে এত করছি কার জন্য? তোমার জন্য!

—আচ্ছা, তোর ঐ সফিক কে হয় রে?

—সফিক বড় ভাল ছেলে। আমি তাকে ভালবাসি। আমার বাবাও সেটা টের পেয়েছে। আমি ওকে না পেলে এখন বুঝতে পারছি বাঁচব না।

—তা হলে আমি তোর কে?

—তুমি যে আমার কে, বুঝতে পারি না। তুমি আমার কি যে নও মাঝে মাঝে আবার তাই ভাবি। যখন আমি মরে যাব, কবরের নিচে চলে যাব বুঝি তখন দেখব তুমি আমার কবরের পাশে বসে আছ। তুমি আছ আমার পাশে পাশে। তুমি বাদে আমি এ-বাংলাদেশে সব থাকলেও একা।

—যা! তুই সব বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলছিস!

—তুমি চলে যাবার পর আমার এটাই মনে হয়েছে। তুমি এমন বলবে জানতাম। তবে তুমি যেখানে যেভাবেই থাক, তুমি আমার। আমার মাটির, আমার কাছের মানুষ।

তখনই ওর পাশে এসে সফিকুর দাঁড়িয়েছিল। ফতিমা টের পায় নি সফিকুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরে টের পেলে সে যেন ধরা পড়ে গেছে

এমনভাবে তাকিয়েছিল। সে সফিককে ভেবেছিল বলবে, আমি আমার মনের মানুষকে ভাবছি সফিক। সে আমাকে ফেলে দূরে চলে গেছে। আর এদেশে আসবে কিনা জানি না। আর দেখা হবে কিনা জানি না। এমন দিনে তাকে না ভেবে থাকতে পারি নি। তুমি বিশ্বাস কর সফিক, আমার মনে হয়েছে শুধু আমি আর তুমি সারারাত জেগে পোস্টার লিখি নি, সেও আমাদের সঙ্গে লিখে গেছে। তাকে ভাল করে দেখার জন্য কতদিন পর এখানে একাকী এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি এ-সব না-ই জানলে।

ফতিমা সফিকুরকে উত্তরে এসব কিছু না বলে অন্যকথায় চলে গিয়েছিল, তুমি আর ঠাণ্ডা না লাগিয়ে সকাল সকাল একটু ঘুমিয়ে নাও। কিন্তু সফিকুরকে তখন ভারি বিমর্ষ দেখাল, ফতিমা আবার না বলে পারল না ; ভয়ের কি আছে সফিক ? সে তো আমাদেরই মানুষ।

সফিক বলল, কে সে ?

ধরা পড়ে গেল বুঝি। তবু সে কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়েছিল সফিকের দিকে। তারপর বলেছিল, সোনাবাবুর কথা বলছি।

—অ, তোমার সেই সোনাবাবু, যে আমার মতো নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ফতিমা, সোনাবাবু সম্পর্কে আর কোন কথা বলল না। সে বলল, আর দেরি করো না। রাত ভোর হয়ে আসছে।

সফিক বলল, সাবধানে থেকো।

সফিক কেন যে বার বার একই কথা বলছে ! ফতিমা বলল, ভয়ের কি আছে সফিক ! আজকের দিনে আমরা তো আর একা নই। সারা বাংলাদেশ যখন আছে, সোনাবাবু যখন আছে তখন আর ভয় কি। সে তো আমাদের সব সময় আরও সাহসী হতে বলছে। তোমাদের সঙ্গে আমরাও মার্চ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যাব। আজকের দিনে অন্তত তুমি আমাকে ঘরে থাকতে বলো না।

সফিক বলল, আমি বারণ করব না। এমন দিনে বারণ করতে নেই জানি। যা কিছু কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। এই শীতের রাতে এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারি না।

টেবিলের সামনে বসে তার ভোর রাতের সব কথা মনে হচ্ছিল। জানালা বন্ধ ছিল বলে ঘরে অন্ধকার। সে জানালা খুলে দিলে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। শীতের রোদ লম্বা হয়ে নামছে মাটিতে। সে বইয়ের পাতা পর পর উল্টে গেল। যেখানে চোখ আটকে গেল—কি সুন্দর সেই সব পঙ্‌ক্তি। যেন

ওর সামনে ফতিমা দু হা'ত তুলে ভালবাসা মেগে নিচ্ছে। সে চোখ বুজে ওর সেই কথাগুলো যেন বলে গেল—স্থির জেনেছিলাম, পেয়েছি তোমাকে, মনেও হয় নি—তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা। তুমিও মূল্য কর নি দাবি।

রোদটা তখন আরও লম্বা হয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। শীতের রাস্তায় কারা তখন মার্চ করে চলে যাচ্ছে। ওদের বেয়নেটে নরম রোদ তীক্ষ্ণ ফলার মতো কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। সফিকুর যেন সেইসব শূন্য দেয়ালে বার বার আঘাত হানার জন্য পড়ছিল, জোরে জোরে সে পড়ছে—তোমার কালো চুলের বন্যায়—আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে—তোমাকে যা দিই, তোমার রাজকর তার চেয়ে বেশি—আরো দেওয়া হল না—আরো যে আমার নেই !

শহরে বড় রাস্তায় মার্চ-পাস্টের দৃশ্য। রাইফেলের বাঁটে রোদ পিছলে যাচ্ছে। কলের পুতুলের মতো দম দেওয়া মনে হচ্ছে ওদের। দম ফুরিয়ে গেলেই যেন সব জারিজুরি ওদের শেষ হয়ে যাবে। সফিকুর এবার জানালাটা বন্ধ করে দিল। কুচকাওয়াজের দাপটে, এমন যে প্রেরণার কথা সে শোনাতে চেয়েছিল, তারা তা শুনতে পেল না। এবার সে রাস্তায় তাদের হাঁক দিয়ে বলে যাবে, বলে গেলেই শীতের মাঠে আবার পাখিরা এসে বসতে পারবে। কলের পুতুলের ভয়ে ওরা আজ মাঠ ছেড়ে কোথাও যাবে না। সফিকুর তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটো গুঁজে রাস্তায় বের হয়ে গেল।

সেই শীতের সকালে সোনাকেও দেখা গেল কলকাতার বড় রাস্তা ধরে হাঁটছে। চোখেমুখে ভীতির ছাপ। এই বড় শহর দেখে গাড়িঘোড়া দেখে সে কেমন আড়ষ্ট হয়ে হাঁটছে। যারা বাবুমানুষ, তাদের সে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে ভয় পাচ্ছে, কোথায় সেই নির্দিষ্ট বাসটি পাওয়া যাবে। ওরা ওর ওপর রাগ করতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে ঠেলাওলা অথবা যাদের দেখলে তার ভয় লাগে না, যারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তেমন মানুষকে খুঁজছিল। সে দু'জন ভদ্রলোককে কিছু বলতে গিয়ে দেখেছে—ওরা এত ব্যস্ত যে তার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। হাত তুলে কোনরকমে ওর সঙ্গে দয়া করে দায়সারাভাবে কথা বলে ছুটে যেন পালাচ্ছে। ওর মনে হল ওরা পালাচ্ছে, ওরা ওর কথা কেউ শুনতে চাইছে না। তবু কেন জানি একজন বুড়োমতো মানুষ তাকে খুব যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল, ঐ যে মনুমেণ্ট দেখছ, তার নিচে তুমি বাস পাবে।

কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। তবু ওর ভিতরে শীত-শীত ভাবটা বড় বেশি জাঁকিয়ে বসেছে। হাল্কামতো কুয়াশা চারপাশে। সামনের রাস্তাটা যে চৌরঙ্গি, ডান দিকে যে বাড়ি, সিংহের ছবি সদর দরজায় এবং ওটা যে লাটভবন, সোনা তাও জানে না। বড় মাঠ দেখলেই গড়ের মাঠ মনে হয়, সে কেবল বুঝতে পেরেছিল, সামনের মাঠটাই গড়ের মাঠ। এবং মাটি, গাছপালা আর মনোরম শীতের সকালে কোথাও রেমপার্ট থাকতে পারে, কোথাও এই মাঠে, রেমপার্ট আছে ভাবতেই সে একটু সাহস পেল।

সকালের রোদ তেমন জোরালো নয়। শীতের হাওয়া কার্জন পার্কের গাছপালায়। সে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। সে শুনে এসেছিল—কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। সুতরাং ওর শীতের জামা না থাকলেও কলকাতায় সে শীতে কষ্ট পাবে না ভেবেছিল। একটা পাতলা পাজামা, কিড্‌স ব্যাগ কাঁধে, পায়ে কতদিনের পুরানো কেড্‌স জুতো। কলকাতায় শীত নেই সে শুনে এসেছিল, কিন্তু এসে তক দেখছে সারাক্ষণই শীত। সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাস ধরার জন্য হাঁটছে।

বাসের ভিতর উঠেও সে খুব নড়ছিল না। চুপচাপ বসে আছে। বেশি নড়াচড়া করলে ওকে কনডাকটার নামিয়ে দিতে পারে। কোথাকার গ্রাম থেকে ভূত এসে কলকাতা নগরীতে হাজির। কি করে যে সোনা এমন ভীতু মানুষ হয়ে গেল! চার বছরে সে আর আগের সোনা নেই, অন্য সোনা হয়ে গেছে। সেই যে সে ভেবেছিল, এই দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, কত সমারোহ থাকবে জীবনে, দেশভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে—সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয় পতাকা উড়বে। ওরা রজার মতো হেঁটে হেঁটে শহর নগর পার হয়ে যাবে। সহসা সোনা এবার নিজেকে বাসের ভিতর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছো রাজা? ভাল আছো? শীত করছে খুব? খুব খিদে পেয়েছে? কাল রাত থেকে কিছু খাও নি? আর বেশি দেরি নেই। যেখানে যাচ্ছি, দেখবে কত কিছু খেতে পাবে তুমি! কোন কষ্ট থাকবে না তোমার।

হালিশহরের ক্যাম্পজীবন, রাইট লেফট আর মার্চপাস্ট করে কল্যাণী ক্যাম্পে যাওয়া এসবের ভিতর গতকালের একটা জীবন নির্ভয়ে কেটে গেছে। সে নিজেও জানত না আজ তাকে এখানে আসতে হবে। সে জানত না, এই শহর ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে তাকে কোথাও চলে যেতে হবে। চিঠিতে কি

লিখেছে মজুমদারসাহেব তার জানার কথা নয়। তবু এই চিঠিই তার সব। মজুমদারসাহেব তার হয়ে এই চিঠি দিয়েছেন। ভদ্রা জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারকে লেখা। সে চিঠিটা দেখালেই তাকে নিয়ে নেবে। তার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর্সের ট্রেনিং নেওয়া আছে। ট্রেনিং থাকলে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ওর হয়ে মজুমদারসাহেব আর কি লিখেছেন সে জানে না।

বাসের ভিতর শীতের সকাল আর পাশে গঙ্গানদী। সে বসে বসেই নদী এবং নদীতে জাহাজ দেখতে পেল। এবং বাসটা মোড় ঘুরতেই সব আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ দেখতে পেল। এখানে এক র‍্যামপার্টের পাশে বড় জ্যাঠামশাই এসে বসতেন। এই নদীর পারে এবং কোন গাছের ছায়ায় তার পাগল জ্যাঠামশায়ের মুখ ভেসে উঠলে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মেজ জ্যাঠামশাইরও বড় প্রিয় এই গঙ্গা নদী। নদীর পারে তিনি তাঁর দেহ রাখবেন এখন কেবল এই আশা তাঁর। আর কিছু তিনি চান না। শীতের সকালে হেঁটে হেঁটে এক ক্রোশের মতো পথ চলে যান গঙ্গাস্নান করতে। নদীর নামেই তাঁর যত পুণ্য। সংসারের প্রতি এখন মনে হয় মায়া-মমতা তাঁর কম। এখানে এসে যে এই বয়সে কি করবেন ভেবে না পেয়ে কেবল বাড়িটার চারপাশে নানারকমের গাছ এনে লাগাচ্ছেন। বাবা দু'মাস পর পর ফেরেন। এখানে আসার পর সে আর বাবাকে হাসতে দেখে নি। মা রাতে কাঁথার ভিতর শুয়ে কষ্ট পান। শিয়রে একটা কুপি জলতে থাকলে সোনা টের পায় মার চোখমুখ কতটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখানে এসে তার পর পর আরও দুটো ভাই হয়েছে। জমি-জায়গা বলতে চারপাশের বনজঙ্গল সাফ করে বসতি করা। জঙ্গল সাফ করতে করতে বড়দার হাঁটু শক্ত হয়ে গেছে। ছোট কাকা আর এখানে থাকেন না। নিজের মতো করে তিনি আলাদা শহরে বাস তুলে নিয়ে গেছেন। কাকিমা এসেই এ ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বড় জেঠিমা যেদিন সবাই উপবাস থাকে, অর্থাৎ যেদিন সংসারে কিছু জোটে না, পেঁপে সিদ্ধ অথবা শুধু মিষ্টি কুমড়ো সিদ্ধ খেয়ে থাকতে হয় সেদিন রাতে ভাঙা বাক্‌স থেকে যত চিঠি আছে বের করে পড়েন। রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জেঠিমা সারারাত বুঝি চিঠি পড়েন। জ্যাঠামশাইর চিঠি। বিয়ের পর পরই যেবার তিনি কলকাতায় শেষবারের মতো কাজ করতে গিয়ে মাস ছ'মাস ছিলেন, তখনকার কিছু চিঠি। জেঠিমা সকালেই স্নান করে একটা ভাঙা আয়নার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন।

কপালে সিঁদুর পরেন বড় বড় ফোঁটায়। এবং তখন জেঠিমাকে দেখলে মনে হয় না সংসারে গতকাল সবার হা-অন্ন গেছে। জেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না। মা না খেয়ে শীতের কাঁথায় শুয়ে থাকলে তার পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না। ওরা সবাই আশায় আশায় বসে থাকে বাবা ফিরে আসবেন। যা কিছু অর্থ ছিল বছর তিনের ভিতর শেষ। এখন আছে তিনটে কুঁড়েঘর আর কিছু অন্নহীন প্রাণ। কেউ আর টাকা নিয়ে আসে না। প্রতাপ চন্দের ছেলে লিখেছে, তারা দেশ ছেড়ে চলে আসছে। তার কাছে কিছু প্রাপ্য টাকা ছিল। সব খোয়া গেলে সোনা বুঝতে পারে না বাবা এবারে কি করবে। বাবার চোখমুখের দিকে তাকানো যায় না। ক্রমে বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছেন। তবু বাবাই একমাত্র মানুষ যে বাড়ি ফিরে এলে ওরা ক'দিন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়। আবার চলে গেলে সারা সংসারে অন্ধকার। অন্নহীন এই সংসারে সোনার নিজেকে বাড়তি লোক বলে মনে হয়। তখন মনে হয় সকাল হলেই সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, পাগল জ্যাঠামশাই এসে গেছেন এদেশে। তিনি আর পাগল নন। তিনি বড় মানুষ, তাঁর অর্থবল অনেক। কোথাও তিনি এক রাজবাড়ি কিনে রেখেছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি এখন সেখানে যাবেন। সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলছেন।

বাসটা যাচ্ছে। সোনা এত অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল যে সে কতদূর চলে এসেছে জানে না। সে বার বার কণ্ডাক্টারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—কে, জি, ডক। তিন নম্বর গেট। সে সেখানে নামবে। তাকে বেশিদূর নিয়ে গেলে সে চিনে ফিরে আসতে পারবে না। পকেটে তার এই বাসভাড়াই সম্বল। তার আর কিছু নেই। এবং এজন্য সোনার বার বারই মনে হচ্ছে সে বড় অকিঞ্চিৎকর মানুষ। তার কথা কণ্ডাক্টার মনে নাও রাখতে পারে। মনে না রাখলে সে খুব বিপদে পড়ে যাবে।

সহসা মনে হল, সোনার বাসের লোকগুলো ওর প্রতি খুব দয়ালু হয়ে উঠেছে। বুড়োমতো একজন লোক বলল, এখনো অনেক দূর। তুমি বসো। ঠিক তোমাকে নামিয়ে দেবে। তখন ওর মনে হল তবে বুঝি বেশ দূরই হবে। সে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারে। সে বেশ চুপচাপ বসে এবার জানালার পাশের সব দালানকোঠা, লাইটপোস্ট এবং রেলব্রীজ দেখতে দেখতে ভাবল এই শহরের কোথাও অমলা কমলা থাকে। সে একবার দেখা করবে ওদের সঙ্গে। সে একটা চিঠি লিখবে, কোনদিন সে কাউকে চিঠি দেয় নি। সে জাহাজে

যখন চড়ে বসবে তখন সবাইকে চিঠি লিখবে। লিখবে, অমলা আমি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অথবা যদি সে অমলার সঙ্গে দেখা করতে যায়, ওকে চিনতে নাও পারে। সে কত বড় হয়ে গেছে। বরং সে চিঠিই লিখবে। সে কি কাজ নিয়ে যাচ্ছে জাহাজে তা লিখতে পারবে না। কথাটা লিখতে ওর ভারি লজ্জা লাগবে।

এমন সময় কণ্ডাক্টারের গলা শুনতে পেল সোনা। এই যে কে নামবে কে, জি, ডকে। তিন নম্বর গেটে তুমি নামবে বলেছিলে। বলে কণ্ডাক্টর সোনার দিকে তাকাল। আশ্চর্য সোনা। সে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে বুঝতে পারে নি। বেশ সে শহরের মানুষজন, রেলব্রীজ দেখছিল। ওর শীত করছিল না তেমন। সে ট্রেনিংশিপের সেকেণ্ড অফিসারের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। এবং চিঠিটা দেখলেই ওকে ডেকে পাঠাবেন তিনি। কড়া মেজাজের মানুষ, ধমক দিয়ে কথা বলার অভ্যাস। এবং এমন-সব নিষ্ঠুর ঘটনার সংবাদ সে রাখে যা মনে হলে শরীরের শীতটা বাড়ে। সে বাস থেকে নেমেই আবার কাঁপতে থাকল। গেটের মুখে দু'জন সিনিয়র রেটিঙস্। সামনে মাঠ এবং দূরে দূরে ক্রেন, জেটি, জাহাজের আগিল তিমিমাছের পেটের মতো। সে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে নিল সব। গেটে লেখা ট্রেনিংশিপ ভদ্রা। নুড়ি-বিছানো পথ। দু'পাশে ফুলের বাগান, তারপর জাহাজের জেটিতে ছোট মাঠ এবং নরম দূর্বা ঘাস। খুব মসৃণ, তার পাশে সোজা রাস্তা লকগেটের দিকে চলে গেছে। ফল-ইনে সে কিছু নতুন রেটিঙস দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। পনের দিন পর পর একটা দল আসে। এই দিনে সেও এসেছে। ওর যতই এখন শীত করুক হাতের চিঠিটা সেকেণ্ড অফিসারের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। আর যতক্ষণ তিনি ডেকে তার সঙ্গে কথা না বলছেন ততক্ষণ শরীর থেকে শীত যাবে না। সে রেটিঙসদের কাছে চিঠিটা দিল। অনুমতি না পেলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

চিঠি নিয়ে ওদের একজন ডাবল মার্চ করে জাহাজের দিকে চলে গেল। সে ঠিকমতো পৌঁছে গেছে। সে যত কঠিন ভেবেছিল এখানে আসা, ঠিক ততটা কঠিন নয়। তার বড় ইচ্ছা করছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রেটিঙসদের সঙ্গে গল্প করতে। চিঠিটা পৌঁছে গেলেই তাকে ডেকে পাঠাবে। তার নাম লিস্ট করে নেবে। যারা তখন ফল-ইনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের সঙ্গে দাঁড়াতে বলবে। দাঁড়াবার আগে যা যা শুনে এসেছে কতটা তা ঠিক বড় জানার ইচ্ছা

তার। জাহাজের মাস্তলে নিশান উড়ছে! এবং সে এখানে দাঁড়িয়েই দেখল মাস্তলের মাথায় একটা কাক বসে আছে।

সে ভিতরে ঢুকে গেলে কাকটা ওর মাথার ওপর এসে কা-কা করে ডাকল। ওর ভিতরের শীতটা এবার আরও বেড়ে গেল। ওর দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা বাতাস এত বেশি জোরে বইছে যে, সে বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। রোদে যেন কোন তাপউত্তাপ নেই। মরা রোদের ভিতর ওর চোখদুটো আরও মরা দেখাচ্ছে। যারা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে অথবা টুইন ডেকে ডিউটি করছে তাদের শরীরে শুধু গেঞ্জি। ওরা শীতে কাঁপছে না। ওদের দেখে সোনা এতক্ষণে বুঝতে পারছে সে শীতে কাঁপছে না, ভয়ে কাঁপছে। তাকে কারা যেন ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই দালানকোঠার ভিতর বলির মোষটার মতো। সে দেখতে পেল চোখের সামনে ঢাকঢোল বাজছে, ধূপধুনোর গন্ধ উঠছে, চোখ জ্বালা করছে। কচি মোষটাকে টেনে টেনে নিয়ে আসছে। সকাল থেকে বড় শীতে কাঁপছিল মোষটা।

বিউগিল বাজলে সোনা টের পেল সেও ফল-ইনে দাঁড়িয়ে গেছে। ডেকের ওপর কাপ্তান। সামনে চিফ, সেকেণ্ড এবং থার্ড অফিসার। সেকেণ্ড অফিসার দু' কদম সামনে এসে কমাণ্ড দিচ্ছেন।

সোনা শুনতে পেল, ঠিক সেই পুরোহিতের মতো গলা, জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণের মতো হেঁকে ওঠা—ট্রেনিজ্ বলে তিনি যেন দম নিলেন, তারপর গলার দু'পাশের রগ ফুলে উঠতে উঠতে যখন মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে আসছে —তখন তিনি হেঁকে উঠলেন, দি থার্টি ফোর ব্যাচ, এটেনসান।

সবার সঙ্গে সোনা এটেনসান হয়ে গেল। ঠিক সেই কল লাগানো পুতুলের মতো। ওর যা কিছু নিজস্ব, এই যেমন ওর ইচ্ছা, ভালবাসা এবং বড় হওয়ার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা সব সে ঝেড়ে ফেলে এখন ওরা যা যা বলবে তাই করবে। যদি ওকে ওরা ক্লাউন সাজিয়ে ছেড়ে দেয় সে সারাজীবন একটা ক্লাউন হয়েই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ডেকের ওপর হেঁকে উঠলেন, ট্রেনিজ, দি থার্টিফোর ব্যাচ—স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ। সোনা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পেরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বোট-ডেকের ওপাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে। জাহাজের ওপাশে বড় বড় সব গাদা বোট। এবং দূরে ওপারের জেটিতে ক্ল্যানলাইনের জাহাজ। জাহাজের মাস্তল পার হলে জেটি এবং শেড আর বড় বড় সব ক্রেনগুলো দৈত্যের মতো

দাঁড়িয়ে লম্বা ছায়া ফেলেছে জেটির জলে। অথচ এরই ভিতর সে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। কোথাও এখানে তবে ঝোপজঙ্গল আছে যেখানে এই শীতের সময়েও ঘুঘু পাখি বাস করতে পারে। ঘুঘুপাখির ডাক শুনলেই বাংলাদেশের কথা মনে হয়। ফতিমার কথা মনে হয়। প্রিয় অর্জুন গাছটার নিচে কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। গাছটা একাকী নিঃসম্বল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নেই, জ্যাঠামশাই নেই। ফতিমা শহরে থাকে। ফতিমা, জ্যাঠামশাই না থাকলে গাছটারও থাকার কোন মানে নেই। কিন্তু সেই গাছটার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলে দেখল ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুরেফিরে আবার তার তরমুজের জমিতে নেমে যাচ্ছে। সে এই গাছ এবং তরমুজের জমি ফেলে কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছে না। আর এমন সময়ই সে শুনতে পেল, ট্রেনিজ দি থার্টিফোর ব্যাচ, স্ট্যাণ্ড ইজি।

ওরা ফল-ইনে দাঁড়িয়ে হাত-পা হেলাতে পারছে। এমন কি ওরা এখন পরস্পর গা চুলকে নিতে পারে। সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারায় সোনা কেমন সাহস পেল। শীতের সূর্য জাহাজের ওপাশ থেকে মাথার ওপর এপাশে উঠে আসছে। শীতের সূর্য ওকে উত্তাপ দিচ্ছে। সে বাঁচতে পারবে এই উত্তাপে। সে এখানে হাতখরচ পাবে সাত টাকা। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। এটা যে ওর কাছে কি মহার্ঘ ব্যাপার, ক্ষুধায় সে কাতর এবং দুপুর হলেই বোট-ডেকে বড় বড় কলাইকরা থালাতে ভেড়ার মাংস আর ভাত। সূর্যটা যত তাড়াতাড়ি মাথার ওপর উঠে আসবে তত তাড়াতাড়ি সে খেতে পাবে। সে ফাঁকে ফাঁকে তাই সূর্য দেখছিল। সূর্য দেখলে কি হবে, সে তো জানে তাদের এখন নিয়ে যাওয়া হবে বোট-ডেকে। তাদের ডেকের কাঠে ক্রমাগত দু'ঘণ্টা হলিস্টোন মারতে হবে। এই দু ঘণ্টায় কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে বিদায় করে দেওয়া হবে, তাকে ভেড়ার মাংস-ভাত খেতে দেওয়া হবে না। এমন ভাবতে সোনার বুক গলা শুকিয়ে গেল। সে আজ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাবারের জন্য সে আর যাই হোক অজ্ঞান কিছুতেই হবে না।

বোট-ডেকে সে সবার সঙ্গে উঠে গেল। সারাটা ডেক কারা জল মেরে গেছে। লাইফ-বোটের পাশে দু'জন সিনিয়র ট্রেনিজ ওদের উঠে আসতে দেখে ভারি মজা পাচ্ছিল। ওদের হাতে হোস পাইপ। ওদের আরও চার-পাঁচজন জটলা করছে মেসরুমের পাশে। ওদের হাতে বালি। ওরা ডেকের কাঠে

বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন এসেছে, সারি সারি তারা হলিস্টোন মারতে বসে গেল। সাদা রঙের চৌকো পাথর। কিভাবে বসবে, কিভাবে দু'হাতে হলিস্টোন ধরবে, সব একজন সিনিয়র ট্রেনি সামনে বসে দেখিয়ে দিচ্ছে। বসার এদিক-ওদিক হলে পিছন থেকে পাছায় লাথি খেতে হবে। সোনা সব ভাল করে লক্ষ্য করছে। সে দু'পায়ের ওপর ভর করে আলগা হয়ে বসল। দু'হাতে চেপে হলিস্টোন ধরে রাখল। এমন ঘষামাজা ডেক, ফের ঘষতে হবে। কাঠ পাতলা হয়ে গেছে ঘষতে ঘষতে। কোথাও ছোবড়া বের হয়ে পড়ছে। তবু ঘষতে হবে। উপুড় হয়ে বাটনা বাটার মতো ক্রমান্বয়ে ঘষা, ডেক ঘষে যাওয়া। জল মারছে হোস পাইপে। জলে ওদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘষে ঘষে হাত-পা গরম। তারপর দু'হাতে পায়ে যেন খিল ধরে আসছে। সেকেণ্ড অফিসার পোর্টহোলে চোখ রেখে সব দেখছেন। হলিস্টোন মারতে মারতে কে হেলে যাচ্ছে, কার হাত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কার হাতে ফোসকা পড়ে ছাল-চামড়া উঠে যাচ্ছে, দেখে আরও চালিয়ে যাবার জন্য অর্থাৎ যতক্ষণ ওরা বাপরে মারে ডাক না ছোটাবে, যতক্ষণ দু-কষে ফেনা উঠে না যাবে, এবং একজন দু'জন শরীর খিল মেরে অজ্ঞান হয়ে না যাবে, ততক্ষণ চালিয়ে যাবেন। সিনিয়র ট্রেনিদের এটা একটা বড়দিনের উৎসবের মতো। প্রথম দিনে ওরাও এমন একটা দৃশ্যের ভিতর পড়ে গেছিল। এখন ওরা সোনাদের দেখে মজা পাচ্ছে। চারপাশে ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ। সোনা কানে এখন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। পাশের ছেলেটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কেউ আসছে না। সে উঠে ওকে ধরবে ভাবল, কিন্তু সে জানে এখন সহসা উঠে দাঁড়ালেই পড়ে যাবে। ঠিক উপনয়নের দিনের মতো—নানারকমের মন্ত্র উচ্চারণের ভিতর চারপাশে নানারকমের মজা। মানুষের শরীরে নতুন এক পরিমণ্ডল তৈরি করা। সোনা তুমি এক মানুষ, তোমার এইদিনে মানুষের জন্য আর মায়া থাকছে না, তোমার হাতে ফোসকা পড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। হাত খুলে আর দেখো না। দেখলে তুমিও অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু হলে কি হবে, সোনা তো এসব পারে না। সে ছেলেটাকে ধরে তুলতে গেল। আর আশ্চর্য, সে দেখলে দু'জন রেটিঙস ওর মুখের ওপর হোস পাইপে জল মারছে। তাকে প্রায় লাথি মেরে পাশে ঠেলে ওরা আরও মজা দেখার জন্য ছেলেটার মুখে হোস পাইপ ছেড়ে দিল। এমন নিষ্ঠুর ঘটনায় সোনার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল। কিন্তু পারল না।

আর কিছুক্ষণ সময় পার করে দিতে পারলেই বোট-ডেকে বসে ভেড়ার মাংস-ভাত। কলাইকরা থালায় সে ভেড়ার মাংস-ভাত খাবে। সে কিছুতেই প্রতিবাদ করতে পারল না। চোখের ওপর দেখল, চ্যাঙদোলা করে ওরা ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে। টেনে হিঁচড়ে বোট-ডেকের ওপর দিয়ে নিয়ে গেলে সোনা চোখ ফিরিয়ে নিল। ছেলেটার হাতে পায়ের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে, তার দেখতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে হুইসল বেজে গেলে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হলিস্টোন শেষ। কেউ আর ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। ওরা টলছে। সোনা দু'পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কিছুতেই পড়ে যাবে না। পড়ে গেলেই ওরা ওকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে—সে মানুষ, পড়ে গেলেই মানুষ না। তাকে নিয়ে যা খুশি করা। সেকেণ্ড অফিসার আসছেন। বুটের শব্দে সোনা চোখ তুলে তাকাল। পরনে সাদা হাফপ্যান্ট সাদা হাফশার্ট এবং মাথায় জাহাজী টুপি। চোখমুখ কি ভীষণ কঠিন! তিনি যে বাঙালী তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন কখনও কখনও, এখন মুখ দেখে তা কিছুতেই বোঝা গেল না। সব কমাণ্ড তার হিন্দিতে, সব কথা হিন্দিতে। সোনার মনে হল তিনি রাতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন হিন্দিতে। তিনি যে পোর্টহোলে মুখ রেখে প্রতিটি রেটিঙসের ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন, এবং যাদের ওপর কোন সংশয় আছে তাঁর, তাদের কাছে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন, তারা তা বুঝতে পারছে না। সূর্য যখন মাথার ওপর উঠে গেছে—আর তখন তিনি বেশি দেরি করবেন না। ছেড়ে দেবেন এবার। হাতে ফোসকা গলে রক্ত পড়ছে, ক্ষুধার জ্বালায় সোনা তা পর্যন্ত টের পাচ্ছে না। যারা হাতে এখন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে সে তাদের কিছু বলবে ভাবল। কিন্তু বলতে পারল না। সেকেণ্ড অফিসার এবার ওর দিকে আসছেন।

সেকেণ্ড অফিসারের কঠিন মুখ দেখে সোনা বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভয়ে সে কিছুতেই তাকাতে পারছিল না। তিনি এসে ওর সামনে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। সে এবার বুঝি সত্যি পড়ে যাবে। সে বলল, ঈশ্বর আপনি আমাকে আর একটু শক্তি দিন। এই দুপুর পর্যন্ত। পড়ে গেলে আমার ভেড়ার মাংস ভাত আর খাওয়া হবে না। শীতের রোদ, ক্রমান্বয় দু'ঘণ্টা হলিস্টোন, সোনার মুখে যে আশ্চর্য এক সুষমা আছে তা নষ্ট করতে পারে নি। ক্লান্ত অবসন্ন মুখে তার কোথায় যে এক আশ্চর্য দীপ্তি! কেন যে সে সেকেণ্ড

অফিসারকে টেনে নিয়ে এল, কিভাবে যে সোনা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ভাবতেই তিনি সোনার শরীর টিপে টিপে দেখলেন। প্রায় হাট থেকে গাই গরু কেনার মতো খোঁচা দিয়ে দেখা। যেন হাত-পা টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঝড়, সারেঙের অত্যাচার এবং সফরের কঠিন নিঃসঙ্গতা সে সহ্য করতে পারবে কি না। না পারলে এক্ষুণি বিদায় করতে হবে। ভাল চোখমুখ দেখলেই সেকেণ্ড অফিসারের এমন ভয় হয়। তারপর সহসা ভয় পাইয়ে দেবার মতো চিৎকার করে বললেন, এটেনসান। সোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিকসে খাড়া রহো। হিলতা কিও ?

সোনা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তোমার নাম কেয়া হ্যায় ?

কাকে বলছে সোনা বুঝতে পারছে না। সে তো সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, সে কি করে বুঝবে সেকেণ্ড অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

এবার তিনি ওর চুল টেনে বললেন, তোমার নাম কেয়া হ্যায় ?

সে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—মজুমদারসাহাব কাঁহা সে এক জংলি আদমি ভেজারে ! বলেই তিনি সোনার গালে ঠাস ঠাস দু'চড় বসিয়ে বললেন, ঠিকসে বাত বলনে হোগা।

সোনার মনে হল দাঁত ক'টা উড়ে গেছে। দাঁতের কষ চিরে যে রক্ত পড়ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। রক্তের নোনতা স্বাদ লালায় সঙ্গে জিভ দিয়ে সে চেটে নিল। পেটে তবু যা হোক কিছু যাচ্ছে। সে কাঁদতে পারত আজ। অথচ অদ্ভুত, ওর কান্না পাচ্ছে না। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে এটেনসান হয়ে আছে। গালে সে নিজের হাত তুলে দেখতে পারছে না, ক'টা দাঁত আছে ক'টা গেছে। কারণ গোটা মুখ কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না শুধু নোনতা স্বাদে সে বুঝতে পারছে রক্ত বের হচ্ছে। ক্ষুধার সময় নিজের রক্ত চুষে খেতে মন্দ লাগছে না। সে নিজের রক্ত চেটে খেতে খেতে ভয়ঙ্কর সেই কঠিন মুখ দেখে ফের শীতল হয়ে গেল। কেন যে তিনি তাকে এমন কষ্ট দিচ্ছেন, সে তো তার নাম ঠিকই বলেছে। সে এতদিন ধরে তার এই নামই জেনে এসেছে। এখানে এলে নতুন নামকরণ হয় কি না সে এখন তা জানে না। জানলে সে এমন বলত না। যখন সে কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না অথচ সেকেণ্ড অফিসার ওর কান টেনে সামনে পিছনে মাথা দোলাচ্ছেন তখন ওর বলতে ইচ্ছা হল, স্যার, আমাকে যে নামই ডাকুন, যে ভাবেই মারুন,

আমি জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি আর একটু বাদে ভেড়ার মাংসভাত খাবই।

তিনি কান ছেড়ে দেবার সময় বললেন, বাত কা পিছু মে স্যার বলনে হোগা, মেরা নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার, বলনে হোগা।

সোনা সোজা দাঁড়িয়ে বলল, মেরা নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার।

—ঠিক হ্যায়। তারপর তিনি সোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। —জাহাজ মে বহুত তকলিফ হ্যায়। জাহাজকা নোকরি বহুত খতরনাক হ্যায়। সারেঙ লোক দুশমনি করেগা! বহুত লেড়কা লোগ আতা হ্যায় ট্রেনিং লেতা হ্যায়, এক দো সফর বাদ ভাগতা হ্যায়। তুমকো ভি ভাগনে পড়ে গা ?

—না স্যার, আমি ভাগব না।

—সাকগে তুম !

—পারব স্যার। সোনা আর কিছু না বলে সোজা তাকিয়ে থাকল। তিনি চলে যাচ্ছেন। সোনার এত কষ্টের ভিতরও মনে হল যাক্, তবে এতদিনে একটা তার হিল্লে হয়ে গেল। কিন্তু একি ! তিনি যে আবার ফিরে আসছেন ! প্রায় কুইক মার্চের মতো মনে হচ্ছে। এসেই মুখের ওপর শক্ত হয়ে বললেন, তুম বিফ খানে সাকতা !

বিফ ! আমি বিফ খাব কেন ? আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুস্থানে চলে এসেছি। আমি আবার বিফ খাব কেন ? যারা পাকিস্তানে আছে তারা বিফ খাবে। বিফের ভয়ে আমার জ্যাঠামশাই গঙ্গার পাড়ে ঝোপেজঙ্গলে বাড়ি করেছেন। আমার বাবা মাঝে মাঝে আসেন। বড় জেঠিমা খেতে না পেলে চিঠি নিয়ে বসে থাকেন, ছোটকাকা চলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে, এত হবার পর হিন্দুর ছেলে হয়ে বিফ খাব সে কি করে হয় ! ভাবতে ভাবতে সোনা ঢোক গিলে ফেলল। সোনার এত খিদে যে বিফ মটন সব এক হয়ে যাচ্ছে। তবু এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণাবোধ সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। সে এবার মরে যাবে যেন। চারপাশে ঋষি পুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন। কি সব মন্ত্রগাথা তাঁরা উচ্চারণ করে চলেছেন। যেন হোমের কাঠ থেকে এক পবিত্র গন্ধ উঠে সারা শরীরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, বলতে ইচ্ছা হল, না না আমি সব পারব। এটা পারব না। আমাকে আমার জন্ম থেকে আমার বাবা মা, আমার পূর্বপুরুষ,

মাটি ফুল ফল এক আশ্চর্য পরিমণ্ডলে মানুষ করেছেন, আমি সব পারি স্যার, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল ভেঙে দিতে পারি না। ভেঙে দিলে আমার আর কিছু থাকে না।

এত দেরি দেখে তিনি ক্ষেপে গেলেন। —জাহাজ মে নোকরি করনে ছে বিফ তোমকো খানেই হোগা। বোল, সাঁকোগে কি নেই ?

আশ্চর্যভাবে সোনার সামনে মায়ের মুখ ভেসে উঠল। শীতের রাতে মা কুপি জালিয়ে বাবার প্রত্যাশায় বসে আছেন। উঠোনে সেই আবহমানকালের সাদা জ্যোৎস্না। উনুনে শুধু জল সেদ্ধ হচ্ছে। বাবা এলেই দু'মুঠো অন্ন সবার পাতে। কি উদ্‌গ্রীব চোখমুখ ছোট ছোট ভাইবোনদের। সে তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে। মা তার অন্নহীন। ভাইবোনের শুকনো চোখমুখ ভেসে উঠলে, সে বলল, আমি পারব স্যার। সে বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেলল। সেকেণ্ড অফিসার টের পাচ্ছেন ছেলেটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, এই প্রথম এত যন্ত্রণার পর কাঁদছে। ওর এ সময় সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা থাকে না। তিনি যেমন বার বার কুইক মার্চ করে যান আসেন, আজও তিনি তেমনি কুইক মার্চ করে চলে গেলেন। তিনি যেন এখন বলতে বলতে যাচ্ছেন, আমার পিতার নাম অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, তস্য পিতামহের নাম যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। তুমি চোখের জল ফেলে আমাকে কি ভয় দেখাচ্ছ হে ছোকরা !

আহা ! তারপর শীতের রোদে ভেড়ার মাংস গরম ভাত। ডেকের ওপর বসে পেট ভরে খাওয়া। মাথার ওপর খোলা আকাশ। সামনে নদী। ওপাড়ের কলকারখানা, কলের চিমনি এবং নীল আকাশ। কত সব পাখি মোহনার দিকে উড়ে যাচ্ছে। সোনা খেতে খেতে এইসব পাখি দেখল, ওরা উড়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং শেষ হলে সেও চলে যাবে, জাহাজে সে বাংলাদেশ ছেড়ে সমুদ্রে চলে যাবে। কবে ফিরবে সে জানে না। আর এই বাংলাদেশে সে ফিরতে পারবে কিনা তাও জানে না। ওর মনটা খেতে খেতে ভারি হয়ে গেল। মার জন্য, ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্য ওর কষ্ট হতে থাকল। সে কলাইকরা থালা মগ ধুয়ে বাংকে রেখে এল। তারপর মাস্তুলের নিচে শীতের দুপুরে শুয়ে পড়ল। ওর এখন বিশ্রাম। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পেট পুরে খেলেই শীতের দুপুরে ওর বড় ঘুম পায়।

সোনা যখন মাস্তুলের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, যখন বাংলাদেশের আকাশ নীল, মানুষেরা শীতের রোদে উত্তাপ নিচ্ছে তখন সামসুদ্দিন দেখল ডায়াসে বিশ্ব-বিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামসুদ্দিন দেখছে সকাল থেকে অগণিত ছাত্র সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ছুটে আসছে। ওরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে যাচ্ছে। পুলিশের ব্যারিকেড তুচ্ছ করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভিতরে। সে দেখছিল। ওর গর্বের অন্ত ছিল না। অজস্র পলাশ গাছ যদি কোথাও থাকে তার লাল পাপড়ি, ওর মনে হল ওরা পলাশের পাপড়িই হবে—নতুবা আকাশ এমন রাঙা হত না, যেন লক্ষ লক্ষ পলাশের পাপড়ি বাংলাদেশের আকাশ নিমেষে ঢেকে দিচ্ছে—আকাশটা রাঙা হয়ে গেলে, মতিনসাহেব বলে উঠলেন, ভাইসাব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমাদের দাবি বানচাল করে দেবার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

সামসুদ্দিনের সাদা রঙের শালের ওপর নানারকম প্রজাপতি আঁকা। সে শালটা দিয়ে মুখ মুছল। এই শীতের দুপুরে সে ঘেমে যাচ্ছে। সে শালটা ঝেড়ে কাঁধে ফেলে রাখলে মনে হল প্রজাপতিগুলো উড়ে গেছে। প্রজাপতি উড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আজ এই দিনে মাঠে মাঠে যত ফুল আছে, সব ফুল থেকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। এমন কি জালালির কবরে সে যে প্রজাপতি উড়িয়ে দেবে বলেছিল, পুলিশের অত্যাচার দেখে মনে হচ্ছে তাও সে আর বুঝি পারবে না। ফলে কবর থেকে জালালির মুখ ভেসে ভেসে চলে আসছে। জালালি যেন তাকিয়ে আছে অথবা সেই মহারাত্রির ঘটনা এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হুবহু মনে পড়ে গেল। জালালি ক্ষুধায় হাঁসটার মাংস চিবুচ্ছে। কড়মড় করে হাঁসের হাড় গিলে ফেলছে ! কি নিষ্ঠুর ছিল সেই ক্ষুধার্ত মুখের ছবি। এবং পেট ভরে গেলে জালালির মনোরম মুখ—সে এই বাংলাদেশে এমন সুন্দর মনোরম মুখের ছবি আঁকতে চেয়েছে। পেট ভরে গেলেই মানুষের আর দুঃখ থাকে না। ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ভাল লাগে। সে যে একটা শপথপত্র রেখে দিয়েছিল জালালির কবরে, সেই শপথপত্রটাও যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এসে একটা ফেস্টুন হয়ে গেছে। বাতাসে পতপত করে উড়ছে। সে যা চেয়েছিল তা করতে পারে নি। কারা এসে সব উল্টেপাল্টে দিল। সে আর মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, এমন বলতে সাহস পায় না। কত সব নীচ হীন স্বার্থপর মানুষ এসে ওর যে শপথপত্র ছিল জালালির কবরে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। সেও মতিনসাহেবের গলার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে

বলে উঠল, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমার আপনার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।

সামসুদ্দিন এই বলে আরম্ভ করল। হাজার হাজার তরুণ, যুবা উন্মুখ হয়ে শুনছে। মহারণে যাবার আগে এক কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা ওরা শুনে যাচ্ছে। ওরা তাই কেউ কোন কথা বলছে না। বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা, বাংলার জল, বাংলার মাটি আমাদেরই নিকনো ঘরের ছবি, তাকে ফেলে যাব কোথা! তারে ছাইড়া দিলে থাকেডা কি!

বুঝি ঈশমের হাতে সে এক মুশকিলাসানের লম্ফ দেখতে পেল! কেন যে এতদিন পর ঈশমচাচার কথা ওর মনে এল সে জানে না। যেন সেই ফকিরসাব হাতে মুসকিলাশানের লম্ফ—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর পিছনে কে যেন বার বার তাকে অনুসরণ করতে বলছে। ঈশমচাচার সে এতদিন কোন খোঁজই রাখে নি। ঠাকুরবাড়ির সবাই চলে গেছে—তারপর চাচার কি হল, সে কোথায়, সে জানে না। সে জানে না ঈশম অন্নহীন ভূমিহীন। ঈশম হয়তো গভীর রাতে তরমুজের জমিতে ফিরে আসতে চায়। ঈশম দেখতে পায় তখন তার নীলকণ্ঠ পাখিরা সব উড়ে গেছে কোথাও। হাতের তালিতে আর ওরা ফিরে আসছে না। ঠাকুরবাড়ির মানুষদের ও-পারে বুঝি এতদিনে সেই পাখিটার খোঁজ মিলে গেছে। না মিলে গেলে ওরা আবার নদী বন মাঠ পার হয়ে ছুটবে। সামসুদ্দিনের মনে হয়েছিল, তার পাখি আকাশে ওড়ে না, নদীর পাড়ে বসে থাকে। দেশভাগের পর পরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি এবারে সব মিলে গেল—কিন্তু হায়, যত দিন যায়—সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে—আবার খুঁজে বেড়ায়। পেলে মনে হয় পাখি মিলে গেছে, দু'দিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীলরঙের নয়, কেমন অন্য রঙ হয়ে গেছে। সে বলল, এটা আমাদের জীবন-মরণের শামিল। থামলে চলবে না। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।

সামসুদ্দিন একটু দম নিল।

বড় রাস্তায় সব পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ। সারা শহর থমথম করছে। পুলিশেরা মাঝে মাঝে কোথাও টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে। অথচ বার বার কেন যে একজন মানুষ, আজ সবচেয়ে বেশি তাকে ইশারায় ডাকছে বুঝতে পারছে না। সে এবার বলতে চাইল, আমি আবার যাব আপনার কাছে। তার আজ সবার কথা মনে হচ্ছে। সেই ছোট্ট ছেলে

সোনার কথা মনে হচ্ছে। সে যখন সোনার মতো ছিল তখন ঈশমচাচা গভীর রাতে এসে ডাকতেন, সামু ঘুমাইলি?

—না ঘুমাই নাই।

—তর লাইগা আনছি!

—কী আনছেন চাচা! সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসত। দশমীর বাজনা আর বাজছে না। বিসর্জন হয়ে গেছে ঠাকুরের। দশমীর মেলা থেকে সে ফিরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরই পায়নি। উঠে দেখত চাচা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ঝকঝকে টিনের তলোয়ার।

সামু ঝকঝকে তলোয়ার দেখে চাচাকে জড়িয়ে ধরত। সে দুগগাঠাকুরের তলোয়ারটা বালিশের নিচে রেখে দিত। সকাল হলে সে রাজা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসত। মাথায় তার আমপাতার মুকুট।

সামুর মনে হল ওর সেই আম-জামপাতার মুকুট এখনও কে যেন মাথায় তার পরিয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দুবিদ্বেষের কথা বলুক মাথার আম-জামপাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারে নি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে। মালতীর কথা মনে আসতেই আবেগে সে বলে উঠল, আজ আমাদেব আন্দোলনের দিন, মায়ের ঋণ শোধ করার দিন। আমাদের মা, বাংলা মার চেয়ে বড় কিছু নেই। যতদিন ঋণ শোধ না হবে ততদিন আমাদের রেহাই নেই।

ধীরে ধীরে ছাত্ররা এবার বের হয়ে গেল। ওরা বন্দুকের নলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। আমাদের মা, বাংলা মার চেয়ে বড় কিছু নেই। দশজন করে এক একটা দল এগিয়ে যাচ্ছে। কি শান্ত নীল আকাশ। মাথায় সবার আম-জামপাতার মুকুট, রাজার মুকুট। মা তাদের যেন পরিয়ে দিয়েছেন। তারা যেতে যেতে গান গাইছে, ওগো মা জননী, আমাগো মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, আমরা কি করি!

সফিকুর দশজনের একটা দল নিয়ে হাঁটছে। হাতে পোস্টার। তাতে লেখা—চলো যাই চলো, যাই চলো যাই—চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে, চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে। কারো পোস্টারে অথবা কণ্ঠে লেখা—ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে, ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাঙালীর বুকে, ওরা এদেশের নয়, দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়, ওরা মানুষের অন্নবস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি, একুশে ফেব্রুআরি, একুশে

ফেব্রুআরি। সব শেষে দোহারের মতো সফিকুর সবার সঙ্গে গায়, আমরা কি যে করি।

ফতিমা যাচ্ছে দশজনের একটা দল নিয়ে। ওদের শাড়িতে জমিনের রঙ সাদা, পাড়ের রঙ নীল। ওরা বুকে ব্যাজ এঁটে নিয়েছে—একুশে ফেব্রুআরি। শীতের রোদে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। তারাও গাইছে সমস্বরে—আমরা কি যে করি!

এ-ভাবে যাচ্ছে। একের পর এক দশজনের একটা দল বের হয়ে যাচ্ছে। হাতে নানা রঙের ফেস্টুন। মুখে গরিমা! তারা বন্দুকের নলের সামনে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাংলার জল, বাংলার বায়ু বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। শহরবাসীরা জানালা দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। ভয়, কখন দাবানলের মতো বিদ্রোহী ছাত্ররা আগুন জালিয়ে দেবে ব্যারাকে ব্যারাকে। ওরা শার্শির ফাঁকে দেখল, কি নির্ভীক ছাত্ররা! ছাত্ররা পুলিশ কর্ডনের দিকে এগিয়ে যচ্ছে, আর অনবরত গাইছে, আমরা কি যে করি!

আর এই কি করি, কি করি করতেই রাইফেল গর্জে উঠল। মেডিক্যাল কলেজের শেডের নিচে ছাত্ররা এসে জমায়েত হচ্ছিল—তখন এমন এক কাণ্ড। কাণ্ড আর কাকে বলে। মানুষেরা চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখতে পর্যন্ত পারছে না। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। শার্শির ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখে নি। কি জানি ফাঁকে-ফোঁকরে যদি গুলি ঢুকে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে কে তখন বলে উঠল, বেইমান। এমন হিংস্র ছবির ভিতরও ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা ওদের বুকের বল হারাচ্ছে না, ওরা গাইছে, আমরা কি যে করি। ওরা হাত তুলে যেন পারলে আকাশ থেকে সূর্য উপড়ে আনে—ওরা সমস্বরে বলছিল—আমাদের ভাষা, বাংলা ভাষা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

তাজা রক্তে তখন বাংলার ঘাস মাটি ফুল ভেসে যাচ্ছে। যা কিছু রঙ নীল অথবা সবুজ সবই কেমন লালে লাল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সারা আকাশটাই একটা শিমুলের গাছ, ডালে ডালে অজস্র লাল ফুল, ফুলের পাপড়ি এবার এই রাজপথে, মিনারে, গম্বুজে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামে, মাঠে, শহরে, গঞ্জে বাংলার মানুষ আকাশে এতসব শিমুল ফুলের পাপড়ি উড়তে দেখে যেন হা-হুতাশ করছে —এ-ঋণ শোধিবে কে! এই যে হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো—এ-ঋণ শোধিবে কে! কে মানুষ এমন আছে বলতে পারে, খামু দামু ঘরে যামু তাজা রক্ত মায়রে দিমু। আর কি দিমু তোমারে, দিমু আমার জান প্রাণ। সফিকুর হাইকোর্টের সামনে তার জানপ্রাণ দিয়ে মায়ের সম্মান রক্ষা করেছে। ওর

দু'হাতে শক্ত করে ধরা পোস্টার। সে পড়ে গেলে পোস্টারটা ওর নিচে না পড়ে যায়, মায়ের জন্য তার মাথার কাছে পাতা আছে আসন, সে মাথার কাছে বিছিয়ে রেখেছে পোস্টার—আমার মুখের ভাষা অরা কাইড়া নিতে চায়! সফিকুরের রক্তে পোস্টার ডুবে আছে। পোস্টারের নীল অথবা সবুজ রঙ আর চেনা যায় না। রক্তের এক রঙ। লাল রঙ। নীল রঙের পোস্টারে অজস্র নক্ষত্রের মতো রক্তবিন্দু লেগে এই মহাকাশকে ব্যঙ্গ করছে। সফিকুরের চোখ বোজা, যেন সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। শিশুর মতো মুখখানি নরম সাদা নীল চোখের মণিকোঠায় একটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে।

ফতিমা পাশে স্থির। সবাই মুহূর্তের জন্য কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সফিকুরের মুখ দেখছিল। মাছিটা কি নির্ভয়ে ওর চোখের ওপর বসে রয়েছে। সে পাশে বসল। চোখ থেকে মাছিটাকে তাড়াল। তারপর কপালে হাত দিয়ে দেখছে—সেই আম-জামপাতার মুকুট ওর মাথায় আছে কিনা। হাত দিতেই সে অনুভব করল, বড় সুন্দর সেই মুকুট, শিশুবয়সের সেই পাতার মুকুট। সবাই পাতার মুকুট পরে যেন রাজা-রানী খেলতে যাচ্ছে! সেও সফিকুরের সঙ্গে নদীর চরে কোন তরমুজ খেতে বুঝি রাজা-রানী খেলতে নেমে যাচ্ছে। সে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকল। ফিনকি দিয়ে যে রক্তটা উপছে এসে মুখের চারপাশে পড়েছে—আঁচল দিয়ে সেটা বড় ভালবাসায় মুছিয়ে দিল। বলতে ইচ্ছা হল, তুমি খেলবে না আমাদের রাজা-রানীর খেলা? সফিকুর বুঝি হাসছে। কেন, আমাকে রাজার মতো লাগছে না? তুমি মাথায় হাত দিলে টের পাবে আমি পাতার মুকুট পরে আছি।

এবার সে সফিকুরের বুকে হাত রাখল। সামনে ভীরু কাপুরুষের মতো পুলিশের দলটাকে আজ ভীষণভাবে উপেক্ষা করতে ভাল লাগছে। বুকে উত্তাপ আছে এখনও। ভালবাসার উত্তাপ। সে জানে, বেশি সময় বসে থাকতে পারবে না। ওরা ছুটে এসে এক্ষুনি সফিকুরকে ঘিরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি সে লাল রঙের পোস্টার মাথার ওপর তুলে নিল। ওদের আসবার আগেই এই পোস্টার নিয়ে কোথাও পৌঁছে যেতে হবে। সে সফিকুরকে পিছনে ফেলে এবার হেঁটে যাচ্ছে। ভয় লাগলে সাহস ফিরে পাবার জন্য সে কবিতা বলছে মহাকবির—কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় ফসলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিকের প্রাণ জানি নাকো—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর……।

এই মাঠ ঘাটের ভিতর তখন আর একজন মানুষ হাঁটছিল। সে ফিরে যাবে তার তরমুজের জমিতে। সে কতদিন হল বের হয়েছে দেশ থেকে। তার যেন সহসা মনে পড়েছে, সে এই যে ঘুরে ঘুরে না খেয়ে না দেয়ে কেমন এক ভবঘুরে মানুষের মতো গাছের নিচে বসে থাকছে, কেউ ডেকে খেতে দিলে খাচ্ছে, নয়তো খাচ্ছে না, কেউ বলে না দিলে সে হাঁটছে না—তাকে তরমুজের জমিতে ফিরে যেতে হবে। সে বুঝি বুঝতে পারছে তার এবার মাটির নিচে সামান্য আশ্রয় চাই। সারা দেশ চষে চষে নিজের জন্য সে একখণ্ড জমি পছন্দ করতে পারল না। নদীর চর, তরমুজের খেত মনে হলেই সে বুঝতে পারে ভিতরে তার একটা ভীষণ কষ্ট। অভিমান করে যে সে দেশ ছেড়ে বের হয়েছিল, এ-পোড়া দেশে আর সে থাকবে না, শেষ সময়ে মনে হয়েছে সে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে মরে শান্তি পাবে না। সুতরাং অন্নহীন ভূমিহীন ঈশম ফের তার তরমুজের জমিতে গিয়ে বসবে বলে হাঁটছে। গ্রাম মাঠ পার হয়ে সে চলে যাচ্ছে। কারো সঙ্গে একটা কথা বলছে না। সে সোজা হেঁটে যাচ্ছে। না পারলে কোন গাছতলায় শুয়ে থাকছে। আবার শরীরে সামান্য বল ফিরে এলেই সে হাঁটছে। তার বিরাম নেই বিশ্রাম নেই হাঁটার। তাকে শেষ সময়ে সেখানে যেতেই হবে।

তারপর একদিন সে তরমুজের জমিটার পাশে যখন দাঁড়াল—কে বলবে তখন এই সেই ঈশম। ছেঁড়া তফন। গায়ে জামা নেই। নাকে সর্দি। চোখে পিচুটি। শীর্ণকায়। ক্ষুধায় থরথর করে কাঁপছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে। জমির পাশে এসেই মনে হল, এ-জমি তার নয়। জমিটা যে হাজিসাহেবের বেটাদের দিয়ে গেছেন ছোটঠাকুর, এতদিন পর কথাটা ফের মনে হতেই ওর ভারি হাসি পেল। ওর মাথায় কি কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। কি করে যে ভুলে গেল, জমিটা তার নয়, অন্যের। অথচ সে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে জমিটা নিজের ভেবে। রাতের আঁধারে ফিরে এসেছে বলে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সবাই কি হাসাহাসি করত! আরে মিঞা তুমি! কই আছিলা এদ্দিন। শরীরের দশা এমন ক্যান? য্যান কেউ নাই তোমার? রাইত বিরাতে একা ঘুরলে তোমারে কেউ মনুষ্য কইব না। ঝোপে-জঙ্গলে পালাইয়া থাক। কে কখন কামড়াইব টের পাইবা না।

কি এক ভালবাসা এই জমির জন্য তার সে নিজেও জানে না, বোঝে না কেন এই ভালবাসা। সে কেন যে আবার তার জমিতে ফিরে এল। সে ক্ষুধায় কাতর। অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। না কি সে বছরের পর বছর ঠিকমতো আহার না পেয়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর বড় ইচ্ছা দেখার এই জমিতে হাজিসাহেবের বেটারা কত বড় তরমুজ ফলিয়েছে। এই জমিতে শুয়ে থাকার ইচ্ছা। সে ভাবল এখানেই আজ রাত কাটিয়ে দেবে। ওর এই মাটি, কত যত্ন করে সে মাটিতে চাষাবাদ করত, কত কষ্ট করে অনাবাদী জমি সে আবাদী করে তুলেছিল। আর সেই দিনের কথা মনে হলে ওর এখনও চোখে জল আসে। সবার কি ঠাট্টা-তামাশা, ঠাকুরের বড় ছেলের মতো ঈশমটাও পাগল। উরাট জমিতে চাষ। কিছু ফলে না জমিতে, কেবল বেনা ঘাস আর বালি। ঈশম বড় যত্নে এবং ভালবাসায় আবাদ করে কি যে সে করেছিল জমির জন্য মনে করতে পারে না, কেবল মনে হয় সে আলে দাঁড়িয়ে সব তৃষ্ণার্ত মানুষদের তরমুজ কেটে খাইয়েছিল। সে আবার ফিরে এসেছে। তরমুজের পাতার নিচে সে শুয়ে থাকবে। শুয়ে থাকলেই শান্তি। সে শান্তির জন্য পাতা ফাঁক করে উবু হয়ে অন্ধকারে বসল। মাটিতে হাত দিল। থাবড়ে-থাবড়ে সে মাটিটার সঙ্গে কথা বলছে। আবার ফিরা আইলাম মা জননী। তর কাছে ফিরা আইলাম। সে মুঠো-মুঠো মাটি তুলে গায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কোন তরমুজ ফলে আছে কিনা হাত দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছে। যেন পেলেই সে একবার পাঁজাকোলে তুলে নেবে। কত ওজন, কত বড়, মা-জননীর সেবা-যত্ন ঠিক না হলে ফসল ফলে না, সে তরমুজ ওজন করে যেন বলতে পারবে হাজিসাহেবের বেটারা কেমন যত্ন-আত্তি নিচ্ছে। কম ওজনের হলে মনে হবে শালারা বেইমান।

সে খুঁজে-খুঁজে একটাও তরমুজ পাচ্ছে না। বেশি দূর সে খুঁজতে পারছে না। এখানে এসেই শরীরটা তার ক্রমে কেন জানি স্থবির হয়ে আসছে। হাত-পা অসাড়। কেবল কুকুরটা ওর পাশে সেই থেকে আছে। কুকুরটাও আর কুকুর নেই, বড়মানুষদের কুকুর কামড়ে সারা শরীরে তার ঘা করে দিয়েছে। সুতরাং কুকুরটার জন্য তার ভারী মায়া। সে কুকুরটাকে ফেলে কোথাও যায় নি, কুকুরটাও তাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছে না। এখন একটা তরমুজ পেলে সে কামড়ে একটু রস খেলে আবার কিছুদিন বুঝি বাঁচতে পারত। আবার সে তরমুজের জমিতে বসে নামাজ পড়তে পারত। আর তখনই হাতের কাছে ছোট

একটা তরমুজ পেয়ে গেল। তরমুজটাকে টেনে সে কাছে আনতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে সে তরমুজটার কাছে যাচ্ছে। দু'হাতে ভর করে সে যেতে চেষ্টা করছে। তরমুজটাকে সে কাছে আনতে পারছে না। হাত থেকে হড়কে যাচ্ছে। ওর ক্ষুধার্ত মুখ জলছিল। কোন রকমে সে তরমুজটাকে মুখের কাছে এনে কামড় দেবে, কোনরকমে একটু তৃষ্ণার জল পান করবে, করলেই গলা ভিজে যাবে, ওর যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সেটা আর থাকবে না। সে কামড়ে দেখল তরমুজটাতে রস নেই। ওর গলা ভিজছে না। সে ক্রমে চোখে ঘোলা ঘোলা দেখছে। মাটির ওপর সে দু'হাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কুকুরটা বুঝতে পারছে না, কেন তার মানুষ এমনভাবে পাতার নিচে লুকিয়ে পড়ছে। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উবু হয়ে আছে। নড়ছে না। মানুষটা যে মরে যাচ্ছে কুকুরটা তা বুঝতে পারছে না। রাতে গাছের নিচে ঈশম ঘুমালে সে যেমন পাহারায় থাকে—আজও মানুষটা ঘুম যাচ্ছে বলে শিয়রে জেগে বসে থাকল। সে আর ঈশম, মাথার ওপর আকাশ, অজস্র নক্ষত্র এবং অন্ধকার, সোনালী বালির নদী, নদীর জল এবং অর্জুন গাছ মাঠের পাশে। কুকুরটা দূরে শেয়ালেরা উঠে আসছে টের পেল। সে সেই অন্ধকার তরমুজের জমিতে বসে সব লক্ষ্য রাখছে। সে দু'বার মাটি শুঁকে ঈশমের চারপাশটা একবার ঘুরে এসে শিয়রে বসল। ভয় পেলেই কুকুরটা এমন করছে। ভয় পেলেই কুকুরটা শিয়রে বসে ঘেউঘেউ করে ডাকছে। সারারাত সে সতর্ক থাকছে। শেয়াল-কুকুরে ঈশমকে খাবে ভেবেই সে সতর্ক থাকছে। ঈশম তার মাটির কাছে তরমুজের পাতার নিচে মহানিদ্রায় মগ্ন। আশ্বিনের কুকুর এটা টের পেয়ে আর বসে পর্যন্ত থাকতে পারল না। শত্রুপক্ষ সবদিকে। সে শিয়রে আর বসে থাকছে না সারাক্ষণ ঘুরছে ঈশমের চারপাশে। কোন দিক থেকে শেয়াল-কুকুরেরা উঠে এসে দাঁত বসাবে কে জানে।

হাজিসাহেবের বেটারা সকালে তরমুজ তুলতে এসে টের পাবে একজন ভিখারি মানুষ তরমুজ পাতার নিচে মরে পড়ে আছে! প্রথমে ঈশমকে ওরা চিনতেই পারবে না। এই ঈশম। ওর কাঠা দুই ভুঁই ছিল বাড়ির পাশে। সেটাও তারা কাঁচা বাঁশের বেড়ায় নিজের করে নিয়েছে। চিনে ফেললেই ভয়। যদি ওটা আবার সে ফিরে চায়। তবু ঈশম এ-পোড়া বাংলাদেশে আবার ফিরে আসতে চায়। আবার জন্ম নিতে চায়। যেন একটা লাঠি দিলে সে এক্ষুণি উঠে দাঁড়াবে। মাথায় পাগড়ি, হাতে লণ্ঠন নিয়ে রাতের আঁধারে সে

খবর দিতে ছুটবে, ধনমামা, আপনের পোলা হইছে। আমারে কিন্তু একটা তফন দিতে হইব।

অথচ সকালে অঞ্চলের মানুষেরা দেখল নদীর পাড়ে বড় রাস্তায় ঝকঝকে একটা মোটরগাড়ি। এ-গাড়ি দেখলে সবাই টের পায় সামসুদ্দিনসাহেব শহর থেকে এসেছে। সে নদীর পাড়ে গাড়ি রেখে সোজা নিজের গ্রামের দিকে উঠে গেল না। হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে। খুব কম আসে সামসুদ্দিন। যাদের বয়স বেড়েছে তারা জানে সামু আজকাল সময়ই পায় না। বাড়িতে ওর এখন কেউ নেই। জমিজায়গা দেখার জন্য শুধু একজন লোক আছে। তবু সে বছরে একবার অন্তত আসে। একদিন-দু'দিন থাকে, তারপর আবার শহরে চলে যায়। সে কতবারই এসেছে। ভুলেও হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যায় নি। কি যে ভিতরে ছিল কে জানে। সে ও-দিকে একেবারেই মাড়াত না। কার কাছে যেন ধরা পড়ে যাবে, কার কাছে বুঝি তার কি ফেরত দিতে হবে! সে ভয়ে গোপাটে পর্যন্ত নেমে আসত না। কিন্তু আজ এত সকালে সে এদিকে না এসে ওদিকে যাচ্ছে। ওদিকে কিছু নেই। খালি। পাড়াকে-পাড়া খালি। খাঁ-খাঁ করছে সব। সে একা যাচ্ছে না। সঙ্গে দুই যুবতী মেয়ে। ওরা দেখে চিনতেই পারল না, যে মেয়েটা ভোর হলে বটগাছের নিচে ছাগল দিয়ে আসত, যে মেয়ের নাম ফতিমা, নাকে নোলক ছিল, পায়ে মল ছিল, এখন সে মেয়ে কত ডাগর, কি সুন্দর চোখ-মুখ—গাছের পাতার মতো হাওয়ায় কাঁপছে। ফতিমার সুন্দর লতাপাতা আঁকা শাড়িতে প্রায় যেন এই অঞ্চলের দৃশ্য আঁকা রয়েছে। সামু তার মেয়েকে নিয়ে নীরবে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে সেদিকে! যারা ছোটাছুটি করে ওর কাছে গেছে তাদের সঙ্গে কিন্তু সামু কোন কথা বলছে না। নীরব। বুঝি ওর শৈশবের কথা মনে পড়ে গেছে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মালতী বুঝি তাকে ডাকছে, সামু যাবি না চুকৈর আনতে। যাবি না নদী সাঁতরে ও-পার। তুই ডুব দিয়া নদীর অতল থাইকা আমার লাইগা মাটি তুলবি না। নদীর অতলে মাটি এঁটেল এবং পুতুল তৈরি করতে এমন মাটি আর নেই। সামুর বুঝি মালতীর পুতুলের জন্য মাটি তোলার কথা মনে হচ্ছে।

এখন আর একজন এমন ভাবছে। ফতিমা আনজুর পিছনে। সে বাবার সঙ্গে কতদিন পর দেশে ফিরে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমেই সে কেবল শুনতে পাচ্ছে—কেউ তাকে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সফিকুরের মৃত্যুর পর সে বড় হাহাকারে ভুগছিল। তার কিছু ভাল লাগত না। সে চুপচাপ

জানালায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসত। সফিকুর তাকে কি কি বলেছে সব মনে করার চেষ্টা করত। কবে প্রথম দেখা, কিভাবে ফতিমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার সহসা নামিয়ে নিয়েছিল সে-সব মনে করার চেষ্টা করত। এসবের ভিতর ফতিমা জানত না সে ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে জানত না, ওর চোখ বসে যাচ্ছে। সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। এবং সে কথা কম বলছে। আম্মা, বা'জান, যখন যে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলেছে, সে-কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বার বার প্রশ্ন করেও কথার জবাব পাওয়া যায় নি। সামু মেয়ের মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেছে। সফিকুরের মৃত্যুর পরই মেয়েটা কেমন শোকে পাষাণ হয়ে গেল। সে কিছু করতে পারছে না। মেয়েটা কখনও কাঁদে কিনা চুপি চুপি দেখার চেষ্টা করেছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে জেগে থেকেছে রাতের পর রাত। ফতিমা রাতে সংগোপনে যদি কাঁদে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ওরা এমন লক্ষ্য করতে করতে দেখল, মেয়েটা সারারাত না ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু কাঁদে না। ভিতরে যে অসহ্য কষ্ট চোখ-মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। হাত-পা ছড়িয়ে যদি ফতিমা এক রাতে মহাশোকে কাঁদতে পারত। সে তবে নিরাময় হত। সামুর ডাক্তার বন্ধু শেষপর্যন্ত এমন বলেছে। তুমি ওকে কোথাও নিয়ে যাও। পার তো দেশে নিয়ে যাও। সেখানে গেলে ওর শৈশবের কথা মনে হবে। মনে হলে বুঝতে পারবে, কিছুই থেমে থাকে না। এভাবেই মাটি মানুষ এবং নদীর জল বয়ে যায়! শৈশবের ভিতর ফিরে গেলে মানুষের শোক-দুঃখ অনেকাংশে লাঘব হয়।

কথাগুলো সামুর ভাল লেগেছে। সে তার বন্ধুর পরামর্শ মতো এসেছে এই দেশে, বাংলাদেশে। নদীর চরে, তরমুজ খেতে, অর্জুন গাছের ছায়ায়, হাসান পীরের দরগায় সে যাবে। মেয়েকে বলবে, মা, এই আমার দেশ, তোর দেশ, সবার দেশ। এখানে তুই জন্মেছিস, আমি, মালতী, সোনা, ঈশমচাচা, ফেলু সবাই জন্মেছি। মা, এই দেশ বাংলাদেশ, আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। তুই একজনের জন্যে পাষাণ হয়ে থাকবি সে ঠিক না। আয়। বলে সে মেয়ের হাত ধরে, শৈশব বলতে সে যা জেনে এসেছে সেই সোনাবাবু, অর্জুন গাছ এবং লটকন ফল, কচুর পাতায় প্রজাপতি এসবের ভিতর মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, যেতে যেতে সে সবকিছু ভুলে গেছে। মেয়ের হাত ছেড়ে সেই শ্যাওড়া গাছটার নিচে সে কেন একা একা চলে যাচ্ছে! এখানেই প্রথম মালতী কোটা দিয়ে ওর ইস্তাহারটা নামিয়ে এনেছিল, এখানেই মালতী

প্রথম শোকে ভেঙে পড়েছিল। সেই থেকে কেন যে অভিমান করে মালতীর ওপর বার বার সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। সে দেখল—সেই ইস্তাহার এখন সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছে। ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। কাগজের সেই হাজার হাজার টুকরো এখন বাতাসে উড়ছে। কে ক'টা সংগ্রহ করতে পারে—এমন বাজি রেখে মালতী এবং সে ছুটছে। ওরা প্রজাপতির মতো একটা একটা ধরে কোঁচড়ে রাখছে—এমন একটা খেলা চোখের ওপর জমে উঠলে ওর মনে হল দূরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কেউ হাউহাউ করে কাঁদছে। কে এমনভাবে কাঁদতে পারে!

এতক্ষণে ওর খেয়াল হল যে, সে মেয়ের হাত ধরে আসছিল, অথচ মেয়েটা তার পাশে নেই। সামু এখানে এসেই এমন প্রসন্ন সকাল দেখতে পাবে আশা করে নি। জুন মাসের আকাশ। মেঘ-বৃষ্টি থাকার কথা। অথচ এক বিন্দু মেঘ নেই আকাশে, মাঠে ছোট ছোট পাটের চারা। ঠাকুরবাড়ির বড় বড় টিনের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে না, আর কেউ কোনদিন দেখতেও পাবে না। ওর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ঠাকুরবাড়ির কোথায় কবে লাঠি খেলা হত, কবে বাপ আসত সামুর হাত ধরে এবং লাঠি খেলা হলে ঈশমচাচা বাবাকে কিভাবে জড়িয়ে ধরত, মেয়েকে এমন বলতে বলতে আসছিল। যেন এভাবে দেশের কথা, শৈশবের কথা ক্রমান্বয়ে বলে যেতে থাকলে মেয়েটা তার আরোগ্য-লাভ করবে। ফতিমা তার মহাশোক ভুলে যাবে এবং তখনই সামুর মনে হল, মেয়েটা এইসব শুনতে শুনতে হঠাৎ হাত ছেড়ে বালিকার মতো ছুটছিল। সে মেয়েটাকে ছুটে যেতে দেখেছে। ছুটে গিয়ে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ফতিমা তার শৈশবের জগতে ফিরে গেছে, সেও তার শৈশবের জগতে ফিরে যাবার জন্য মেয়েকে ফেলে এই গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সে কি সব ভাবছিল, ওর পাশে যে গ্রামের কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তা পর্যন্ত খেয়াল নেই। তখন কেউ কাঁদছে শুনেই স্থির থাকতে পারল না। ওর বুক চিরে যাচ্ছে। ফতিমা কাঁদছে এটা সে বুঝতে পারে নি। কারণ সেই যে, শিশু বয়সে একবার কি কারণে সেই মেয়েকে মারতে গিয়ে পিঠে দাগ বসিয়ে দিয়েছিল, তারপর আর সে মারে নি। কসম খেয়েছে, সে আর কোনদিন মেয়েকে আঘাত করবে না। মেয়েটা তারপর কোনদিন কাঁদে নি। কেবল হেসেছে। ফতিমা হাসলে সে টের পেত ফতিমা হাসছে। কিন্তু কাঁদলে সে টের পায় না—কারণ ফতিমা এখন বড় হয়ে গেছে। বড় হলে কান্নার নিয়মকানুন বদলে যায়। সে তবু এর ভিতর টের পেল কেউ কাঁদছে, বাংলাদেশের জন্য কাঁদছে।

সুতরাং সে অস্থির হয়ে উঠল। যেদিক থেকে কান্না ভেসে আসছে সেদিকে সে ছুটল। শৈশবের মতো সে মাঠঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে কেউ বাংলাদেশের জন্য কাঁদতে পারে সেখানে সে চলে যাবেই। সে পৌঁছেই

দেখতে গেল—ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আনজু দু'হাতে আগলে রেখেছে ফতিমাকে। বোবার মতো আনজু দেখছে সব বড় বড় অক্ষর গাছে লেখা। সে অক্ষরগুলো পড়ছে। গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলো আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলো যতদিন যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় হরফে পড়বে, জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি—ইতি, সোনা।

বড় বড় অক্ষর কি গভীর ক্ষত নিয়ে এই মহাবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্যে সামু নিজে বড্ড বেশি অভিভূত হয়ে গেল। মনে হল তার, এই দেশ বাংলাদেশ। এই দেশের অন্য কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, সে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা পেল না। মেয়ের মাথায় হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন মাঠ থেকে কিছু লোক ছুটে আসছে। ওরা এসে খবর দিল ঈশম তরমুজের জমিতে মরে পড়ে আছে। কখন সে মরেছে কেউ বলতে পারে না। জমিতে তরমুজ এবার ভাল হয় নি। শুধু পাতাই সার। দু'দিনের ওপর হবে জমিতে কেউ তরমুজ তুলতে যায় নি। কেউ জানে না কখন থেকে ঈশম পাতার নিচে মরে পড়ে আছে।

এই জমির এক অংশে ঈশমের জন্য একটু মাটি চেয়ে নিল সামু! এই জমির নিচে ঈশম চুপচাপ শুয়ে থাকবে আবহমান কাল। নানারকম ঘাস জন্মাবে কবরে। ফুল ফুটবে ঘাসে। ঈশমের এই কবর থেকেই বাংলাদেশের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ঈশমের কবরে সামু এবার নতুন একটা ইস্তাহার লিখে রেখে দিল। ইস্তাহারটার নাম বাংলাদেশ। তারপর ওকে শুইয়ে দিল। নতুন পাজামা পাঞ্জাবি। সাদা দাড়ি ঈশমের! সে লম্বা হয়ে কবরে শুয়ে আছে। ভূমিহীন অন্নহীন ঈশমের কানে কানে মাটি দেবার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারি নি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝি নি! আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর সে ঈশমের কবরে মাটি দিতে দিতে বলল, যার মাটি পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হতেন চাচা, সে নেই। সে থাকলে তাকে বলতাম, তুমি এসে একটু মাটি দিয়ে যাও বাবু। ওঁর আত্মা বড় শান্তি পাবে। সে, বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্তানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলাদেশে আর কেউ নেই।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত ক্রমে আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অর্জুন গাছটা আরও বড় হচ্ছে। ডালপালা মেলে সজীব হচ্ছে।

॥ সমাপ্ত ॥

এইমত গ্রামে এইমত মানুষের আছে
সুখদুঃখ। এই মত থেকে যায়
[illegible], [illegible] [illegible]
থেকে থেকে যায়।

[illegible]